শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী

প্রথম ভাগ

তৃতীয় সংস্করণ

শ্রীগুরুপ্রিয়া দেবী

শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী

প্রথম ভাগ

শ্রীশ্রীমার

আশ্রিতা

শ্রীগুরুপ্রিয়া দেবী

Shree Sita
Kanai Lal Chakraborty
C/o. Shree Shree Ma Anandamayee
Ashram
Vadaini -
Varanasi

শা'বাগে শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী

উৎসর্গ

যিনি স্বরূপতঃ মানবীয় বুদ্ধির অগম্য ও পূর্ণানন্দরূপে স্বধামে নিত্য বিরাজমান থাকিয়াও সংসার-পথে ক্লান্ত কাতর পথিককে জ্যোতির্ম্ময় চিরশান্তি-ধামের সন্ধান দিবার জন্য করুণাবশতঃ ধরাতলে মানবদেহে আবির্ভূত হইয়াছেন, যিনি কর্ম্ম-ভক্তি-জ্ঞানময় খণ্ড ভাবধারার মধ্য দিয়া কি প্রকারে মহাভাবে প্রবেশ করিতে হয় ও কি প্রকারে চরমে অবিরাম নৃত্যশীল ভাব-তরঙ্গের পশ্চাতে ভাবাতীত চিরশান্তিময় চিন্ময়-স্বরূপে বিশ্রাম লাভ করা যায়, তাহা আপনি আচরণ করিয়া জগৎকে শিক্ষা দিয়াছেন, সেই শরণাগত-বৎসল পরমারাধ্যা শ্রীশ্রী১০৮ যুক্তেশ্বরী মাতা আনন্দময়ীর ভুবনমঙ্গল শ্রীচরণকমলে তাঁহারই পবিত্র লীলাকাহিনীরূপ এই ক্ষুদ্র পুষ্পদাম ভক্তি ও প্রীতির অঞ্জলিরূপে গঙ্গাজলের দ্বারা গঙ্গাপূজার ন্যায় সাদরে অর্পিত হইল।

দীন গ্রন্থকর্ত্রী।

নিবেদন

আজ প্রায় বার তের বৎসর পূর্ব্বে যখন মাকে প্রথম দেখি, দেখিয়া দেখিয়া মুগ্ধ হই, তখন একবার ইচ্ছা জাগিয়াছিল এই সব ঘটনা একটু লিখিয়া রাখিলে নিজে নিজে পড়িলেও আনন্দ পাইব। সেই ইচ্ছার বশবর্ত্তী হইয়া কিছু কিছু লিখিলাম। যদিও মার সঙ্গে বেশী সময় কাটিয়া যাইত, লিখিবার সময় বেশী ছিল না, আর লিখিতে বসিলেই দেখিতাম ভাষায় মায়ের লীলা প্রকাশ করা সম্ভব নয়, তবুও কিছু কিছু লিখিলাম। কারণ মনে হইত এই সব ঘটনা, লীলার কাহিনী, কয়েক বৎসর পর হয়ত কিছু মনে থাকিবে না। কিছুদিন লিখিবার পর ঘটনাচক্রে আমার লেখা বন্ধ হইয়া গেল। আমরা যখন মায়ের আদেশে ঘর ছাড়িয়া স্থায়ীভাবে বাহির হইলাম, তখন সে সব খাতাগুলি বাড়ীতেই রহিয়া গেল। পরে মা যখন সিদ্ধেশ্বরীতে আমাদের রাখিয়া বাহির হইয়া গেলেন, তখন মার জন্য প্রাণটা বড়ই কাঁদিত। একদিন ভাবিলাম মার পুরাতন লীলা-কাহিনী পড়িলে বোধ হয় একটু আনন্দ পাইব, কিন্তু তখন বাড়ীতে খোঁজ করাইয়া আর সে খাতাগুলি পাওয়া গেল না। মনে বড়ই দুঃখ হইল। কয়েক বৎসর পর শ্রদ্ধেয় ৺জ্যোতিষচন্দ্র রায় মহাশয় সকলকে মার লীলা-কাহিনী (যিনি যে ভাবে দেখিয়াছেন বা অনুভব

করিয়াছেন তাঁহাকে সেইভাবে) লিখিবার জন্য অনুরোধ করিলেন, কিন্তু আমার আর লিখিতে ইচ্ছা হইল না। আমি কিছু লিখিব না স্থির করিলাম। কিন্তু কি জানি কেন, আবার কাহার প্রেরণায় লিখিবার ইচ্ছা একটু একটু জাগিল। জ্যোতিষদাদাও বলিলেন, "তোমার লেখা উচিত, কারণ তুমি বহুদিন মার সঙ্গে সঙ্গে কাটাইয়াছ, ছোট বড় অনেক ঘটনা তোমার জানা আছে।" তাঁহার উৎসাহে ভিতরকার লিখিবার ইচ্ছা আরও একটু প্রবল হইল। ইহার মধ্যে লিখিবার সুযোগও মা করিয়া দিলেন, আমাকে কিছুদিন প্রায় একা বিন্ধ্যাচল আশ্রমে রাখিলেন। সেই নির্জ্জনে অবসর সময়ে আমি আবার লিখিতে লাগিলাম। মার কৃপায় পূর্ব্বের ঘটনাগুলি আমার প্রাণে বেশ জাগিয়া উঠিল। যেমন জপের একটা সময় ছিল, সেই প্রকার মার লীলা-কাহিনী লিখিবারও একটা সময় স্থির করিয়া নিলাম,—ইহা আমার সাধনার একটা অঙ্গ বলিয়াই মনে হইত। অবশ্য মার লীলাখেলা লিপিবদ্ধ করা আমার মত লোকের পক্ষে বামন হইয়া চাঁদ ধরিবার সাধের মত। তবুও লিখিতাম, লিখিতে ভাল লাগিত। জানিতাম বিজ্ঞ সমাজে ইহার কোনই মূল্য হইবে না, কারণ বই লিখিবার মত বিদ্যা-বুদ্ধি কিছুই আমার নাই। কিন্তু আমার মনে হইত—যাঁহারা মার সংস্পর্শে আসিয়াছেন, তাঁহারা এই সব ঘটনা পড়িয়া আনন্দিত হইবেন, লেখিকার ভাব বা ভাষার ত্রুটী তাঁহাদের আনন্দে বাধা দিতে পারিবে না। কারণ, দেখিয়াছি যখনই আমরা কয়েকজন একত্র মিলিয়াছি ও মার কথা

উঠিয়াছে, তখন এক কথা, পুরাতন কথা, নিয়াই পুনঃ পুনঃ আলোচনা করিতে করিতে আমরা কত রাত্রি কাটাইয়া দিয়াছি, কাহারও তাহাতে বিরক্তি বা ক্লান্তির লেশ বোধ হয় নাই। মার সব কথাই যেন নিত্য নূতন বলিয়া আমাদের মনে হইত। অবশ্য ইহাও খুবই সত্য যে, মার ভাব বুঝা আমাদের একেবারেই সাধ্যাতীত, আমি যে ভাবে বুঝিয়াছি বা দেখিয়াছি বা শুনিয়াছি তাহাই মাত্র লিখিলাম। এক বর্ণও অতিরঞ্জিত না হয় সেই-দিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখিয়াছি। তবুও আমার সহৃদয় ভাই-ভগিনীগণ, বিশেষতঃ যাঁহারা মার সংস্পর্শে আসিয়াছেন, তাঁহারা আমার অযোগ্যতার যথেষ্ট প্রমাণ পাইবেন। আমি সেজন্য ক্ষমাপ্রার্থী। যাঁহারা মাকে দেখেন নাই, এই বই পড়িয়াই মার পরিচয় পাইবেন, তাঁহাদের নিকট আমার এই প্রার্থনা—এই একান্ত অনুপযুক্ত কন্যার লেখায় যদি কোথাও মার স্বভাব ও চরিত্র বুঝিতে ভুল করেন, সে ত্রুটী আমারই, মার চরিত্রে কোথাও অসম্পূর্ণতা বা ত্রুটী নাই। যাঁহারা মার সংস্পর্শে আসিয়াছেন, তাঁহারা আমার এই কথার সত্যতা উপলব্ধি করিবেন। দুঃখের বিষয় মার লীলার অনেক ঘটনাই গোপন রহিয়া গিয়াছে, কারণ ব্যক্তিগতভাবে মা কাহাকেও যে সকল বিশেষ কথা বলিয়াছেন বা মার যে সব বিশেষ ঘটনা কেহ কেহ উপলব্ধি করিয়াছেন, সে সব কথা বা ঘটনা গোপনই রহিয়াছে, এবং হয়ত চিরদিন গোপনই থাকিয়া যাইবে ; কারণ, কেহ সে সব প্রকাশ করিতে রাজি নন।

আমার শেষ কথা—আমি এই সব এলোমেলো ভাবে লিখিয়া পরম শ্রদ্ধাভাজন মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত গোপীনাথ কবিরাজ এম, এ, (ভূতপূর্ব্ব অধ্যক্ষ, গভর্ণমেণ্ট সংস্কৃত কলেজ, বেনারস) মহাশয়ের হাতে দেই, তিনি যথেষ্ট পরিশ্রম স্বীকার করিয়া ইহাকে পুস্তকাকারে দাঁড় করাইয়াছেন এবং তিনি এই পুস্তকের একটি ভূমিকা লিখিয়া দিয়াছেন। ইহার জন্য আমি তাঁহার নিকট চিরকৃতজ্ঞ রহিলাম। মার পুরাতন ভক্ত চিরকুমার শ্রীযুক্ত নেপালচন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয় এই কাজে কবিরাজ মহাশয়কে যথাসাধ্য সাহায্য করিয়াছেন। তিনি দিনরাত এর জন্য পরিশ্রম করিয়াছেন, মার কাজ করিয়াই তাঁহার আনন্দ। শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রনাথ ঘোষ, এম, এ, (অধ্যক্ষ, শরৎকুমারী বিদ্যাশ্রম, কাশী) মহাশয়ও এই গ্রন্থের প্রুফ্ দর্শনাদি কার্য্যে যথেষ্ট শ্রম স্বীকার করিয়াছেন। উভয়ের নিকটই আমি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি।

জ্যোতিষদাদা আজ এ সংসারে নাই, তাঁহার উৎসাহেই আমি এই কাজে অগ্রসর হইয়াছিলাম, আজ তিনি থাকিলে মার এই লীলা-কাহিনী প্রকাশিত দেখিয়া কত আনন্দিত হইতেন।

আমার পরমপূজ্য পিতৃদেব আজ সন্ন্যাসী, তবুও তাঁহার অর্থে ও সাহায্যেই আমার এই বাসনা কার্য্যে পরিণত হইল। মার কয়েকজন ভক্তও এই পুস্তক মুদ্রণের জন্য অর্থ সাহায্য করিয়াছেন, তাঁহারা নাম প্রকাশ করিতে অনিচ্ছুক হওয়ায় তাঁহাদের নাম প্রকাশ করিলাম না; তাঁহাদের নিকট আমি এই জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি।

নানাপ্রকার অনিবার্য্য কারণবশতঃ গ্রন্থে কিছু কিছু মুদ্রাকর প্রমাদ ও বিভিন্ন প্রকার ত্রুটী রহিয়া গিয়াছে, তাহা যথাসম্ভব সংশোধন করিয়া শুদ্ধি ও ক্রোড়পত্রে সন্নিবেশ করিয়া দেওয়া হইল। সহৃদয় পাঠকবর্গের নিকট সেইজন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি। মার এই লীলা-কাহিনী পড়িয়া যদি কাহারও প্রাণে একটুও আনন্দ হয়, তাহা হইলে আমার এই পরিশ্রম সার্থক মনে করিব। ইতি—

৺কাশীধাম
বৈশাখ, ১৩৪৫।

নিবেদিকা
শ্রীগুরুপ্রিয়া দেবী

সূচীপত্র

প্রথম অধ্যায়

দ্বিতীয় অধ্যায়

তৃতীয় অধ্যায়

চতুর্থ অধ্যায়

পঞ্চম অধ্যায়

ষষ্ঠ অধ্যায়

ভূমিকা।

(১)

বর্ত্তমান গ্রন্থের রচয়িত্রী এবং আমার কয়েকজন শ্রদ্ধাস্পদ মাতৃভক্ত বন্ধু আমাকে এই গ্রন্থের একটী ভূমিকা লিখিয়া দিতে অনুরোধ করিয়াছেন। তাঁহাদের ইচ্ছা, এই ভূমিকাতে আমি মায়ের সম্বন্ধে আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ও ধারণা সংক্ষেপে লোকসমক্ষে প্রকাশিত করি। বোধ হয়, তাঁহাদের বিশ্বাস এই উপলক্ষে মার স্বরূপ-বিষয়ক আলোচনা-প্রসঙ্গে জগতের সম্মুখে তাঁহার প্রকৃত পরিচয় অল্পাধিক পরিমাণে ব্যক্ত করিবার অবসর ঘটিবে।

কিন্তু সত্যের অনুরোধে বলা উচিত, আমার বক্তব্য সংক্ষিপ্ত ভূমিকাকারে নিবদ্ধ করিয়া যদিও আমি তাঁহাদের অনুরোধ রক্ষা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি, তথাপি ইহা দ্বারা তাঁহাদের ইচ্ছা পূর্ণ হইবে না। আমার ন্যায় প্রকৃতিবিশিষ্ট অসমর্থ লোকের দ্বারা তাহা হওয়া সর্ব্বথা অসম্ভব এবং আমার মনে হয় প্রকৃতি বিভিন্ন এবং সামর্থ্য অধিক থাকিলেও ইহা সুসাধ্য নহে। মার সম্বন্ধে আমার ব্যক্তিগত ধারণা ও বিশ্বাস আমার হৃদয়ের সামগ্রী,—তাহা নির্ব্বিচারে অন্য লোকে গ্রহণ করিতে বাধ্য নহে। যাহা লইয়া অন্যের সঙ্গে তর্ক-বিচার চলে না, চলিলেও যে বিষয়ে বিচার চালাইতে প্রবৃত্তি হয় না, যাহা প্রাণের নিভৃত কন্দরে

গুপ্তভাবে পোষণ করার যোগ্য, তাহাকে হৃদয় হইতে উঠাইয়া লইয়া প্রকাশ্য আলোচনার বিষয়ীভূত করিতে প্রাণ চাহে না। তার পর অন্যের নিকট মার প্রকৃত পরিচয় দিবার চেষ্টা করাও আমার ন্যায় অধিকারীর পক্ষে ক্ষমার অযোগ্য ধৃষ্টতা নহে কি ?

গ্রন্থকর্ত্রী গ্রন্থমধ্যে যথাসম্ভব নিপুণতার সহিত মার বাহ্য চরিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন ও তাঁহার স্বমুখ-নিঃসৃত মধুর উপদেশাবলী লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। "মাতৃদর্শন"-কার ও "শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী-প্রসঙ্গ" নামক গ্রন্থের নির্ম্মাতাও সুন্দরভাবে ঐরূপ চেষ্টা করিয়াছেন। এই সকল গ্রন্থ পাঠ করিয়া স্থূলভাবে মার দেহাশ্রিত লীলার বিবরণ অবশ্যই পাওয়া যায়। যাঁহারা প্রত্যক্ষভাবে মার সঙ্গ ও উপদেশ লাভের সৌভাগ্য লাভ করিয়াছেন, তাঁহারা উহা আরও ঘনিষ্ঠভাবে পাইয়া থাকেন।

কিন্তু মার ঐ বাহ্য পরিচয় নানাপ্রকার। যাহার যেরূপ প্রতিভা ও সংস্কার, সে মাকে সেই ভাবেই দেখে ও দেখিবে। কারণ ইহা বাহ্য পরিচয়। মার প্রকৃত পরিচয় পাওয়া অত্যন্ত কঠিন। তারপর সৌভাগ্য ক্রমে কেহ নিজে তাহার আভাস পাইলেও অপরের সমক্ষে সম্যক্ রূপে প্রকাশ করিতে পারিবে, সে আশা সুদূরপরাহত; বস্তুতঃ সন্তান হইয়া মার পরিচয় গ্রহণের চেষ্টাই বাতুলের প্রয়াস বলিয়া মনে হয়। 'মা কে', 'মার স্বরূপ কি'—এই সকল গভীর বিষয়ের মীমাংসা অল্পজ্ঞান শিশুর পক্ষে হওয়া সম্ভব নয়। শিশুর যখন জন্ম হয় নাই,

তখনও মা ছিলেন, শিশু যখন থাকিবে না তখনও মা থাকিবেন; মা সনাতনী। শিশুর এমন কি বল আছে যাহা দ্বারা সে মার স্বরূপ বুঝিতে সফলকাম হইতে পারে? যাঁহার শক্তিতে শক্তিমান্ হইয়া শিশু জন্মগ্রহণ করে, যাঁহার সত্তাতেই তাহার সত্তা, যাঁহাকে ছাড়িয়া সে ক্ষণার্দ্ধও অবস্থান করিতে সমর্থ হয় না, তাঁহাকে বুঝিবার ক্ষমতা তাহার কোথায়? মনুষ্য সাধন-বলে বলীয়ান্ হইয়া অঘটন ঘটাইতে পারে সত্য, কিন্তু সাধনার মূলেও তাঁহারই কণামাত্র শক্তি। মহাশক্তির অনুগ্রহ-কণা ব্যতিরেকে মনুষ্য জড়পিণ্ডবৎ অকর্ম্মণ্য। মনুষ্য ত' দূরের কথা, স্বয়ং শিবও শক্তি-রহিত হইলে নিঃস্পন্দ হইয়া শববৎ অবস্থিত হন। সকল দেবতার ও সকল জীবের প্রাণস্বরূপ সেই আদ্যা শক্তিকে কে বুঝিতে পারে? জ্ঞান, ভক্তি, কর্ম্ম-প্রভৃতি সকল সাধনের প্রাণশক্তি তাঁহারই অনুগ্রহ, সুতরাং আপন বল কাহার এমন আছে যাহার দ্বারা কেহ তাঁহাকে জানিতে পারে? তিনি নিজকে নিজে প্রকাশিত করিলে তবে তাঁহার কিঞ্চিৎ পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়, কিন্তু তাহাও সকলে পায় না—যাহার নিকট তিনি যতটুকু আত্মপরিচয় প্রকাশ করেন, সে ততটুকুই পায়, অন্যে কিছুই পায় না।

উজ্জ্বল জ্যোতির্ম্ময় চির প্রকাশময় সবিতৃদেব যেমন প্রকাশমান থাকিয়াও অন্ধের নিকট অসৎকল্প, তদ্রূপ আদ্যা শক্তি জগতে প্রকাশিত থাকিয়াও সাধারণের নিকট অপ্রকাশিত-বৎ থাকিয়া যান। তিনি ধরা না দিলে কেহ তাঁহাকে ধরিতে

পারে না। কথিত আছে, একবার দেবর্ষি নারদ ভগবান্ নারায়ণের দর্শন-মানসে শ্বেতদ্বীপে গিয়াছিলেন। শ্বেতদ্বীপ অতি দুর্গম স্থান, সাধারণতঃ দেবতা ও ঋষিদের অগম্য—সেখানে যাইয়া দিব্যমূর্ত্তিধারী নারায়ণের দর্শনও তিনি পাইয়াছিলেন। ঐ দেবদুর্ল্লভ রূপ তপোবলে তিনি দর্শন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার মনে একপ্রকার অলৌকিক হর্ষ ও অহমিকার সঞ্চার হইয়াছিল। সঙ্গে সঙ্গে আকাশবাণী হইল, 'নারদ, তুমি বৃথা অহঙ্কার করিতেছ। আমার এই ভূত-গুণ-যুক্ত রূপ দেখিয়া তুমি ভাবিতেছ তুমি আমার পরমরূপ দর্শন করিয়াছ। কিন্তু তোমার ধারণা ভ্রান্ত। কারণ ইহাও আমার মায়িক রূপ, আমার স্বরূপ-দর্শন এখনও তোমার হয় নাই।' তাঁহার বিশিষ্ট অনুগ্রহ ভিন্ন তাঁহার স্বরূপ-দর্শন কাহারও হইতে পারে না। যোগী যোগবলে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অতীত, অনাগত ও বর্ত্তমান যাবতীয় পদার্থের জ্ঞান যুগপৎ অপরোক্ষভাবে বর্ত্তমানের ন্যায়, করস্থিত আমলকের ন্যায়, প্রাপ্ত হইতে পারেন। কিন্তু তাহাতেও মহাশক্তির জ্ঞানলাভ হয় না। সম্প্রজ্ঞাত সালম্বন সমাধিতে জাগতিক পদার্থ-বিষয়ক প্রজ্ঞার উদয় হয়, কিন্তু জগতের মূল-প্রকৃতি বা পুরুষ তাহার বিষয়ীভূত হন না। পুরুষ-প্রকৃতির অতীত পরম ঐশ্বরিক শক্তি ত' আরও দূরের কথা। জ্ঞানীর জ্ঞানবল ও ভক্তের ভক্তিবল মায়ের চরণ স্পর্শ করিতে সমর্থ হয় না। বস্তুতঃ যোগবল, জ্ঞানবল ও ভক্তিবল—যাবতীয় বল সেই মহাবল-স্বরূপিণীর

কণামাত্রের প্রতিবিম্বাভাস। এই ক্ষুদ্র আভাস-বল সেই মূলের দিকে বিন্যস্ত হইলে সত্তাহীন হইয়া যায় ও কোন কার্য্য সম্পাদনে সমর্থ হয় না। (প্রদীপের পক্ষে সূর্য্যকে প্রকাশিত করিয়া দেখাইবার চেষ্টা যে প্রকার উপহাসাস্পদ, সেই প্রকার মনুষ্যের পক্ষে নিজ আভাস-বলের দ্বারা মহাশক্তি মায়ের স্বরূপ গ্রহণের চেষ্টাও বুঝিতে হইবে।)

সাধারণতঃ মা সন্তানকে নিজ পরিচয় দেন না, সন্তানের পক্ষে সে পরিচয় সাধারণতঃ আবশ্যকও নহে; মা তাহার অভাব পূরণ করেন, সে যাহা চায় তাহাকে তাহা দিয়াই ভুলাইয়া রাখেন। তিনি ভোগার্থীকে ভোগ দেন, মুমুক্ষুকে মুক্তি দেন, আর্ত্তের আর্ত্তি দূর করেন, ক্ষুধার্থীকে অন্ন, তৃষ্ণার্থীকে পানীয় ও জিজ্ঞাসুকে জ্ঞান দান করেন। যে তাঁহাকে যে ভাবে ভজনা করে, তিনি তাহার নিকট সেই ভাবেই উপস্থিত হন। আপন আপন ভাবের ভিতর দিয়া মার এই পরিচয় সাধকমাত্রেই অধিকার অনুসারে পাইয়া থাকেন, কিন্তু ইহা মার স্বরূপের পরিচয় নহে। (মার স্বরূপ ভাবাতীত—মহাভাব-রূপিণী মা অনন্ত প্রকারে অনন্ত ভাবের সমন্বয় ও উৎস হইয়াও বস্তুতঃ সমস্ত ভাবের অতীত।) মার সেই তূর্য্যাতীত রূপকে কে গ্রহণ করিতে সমর্থ? (স্বয়ং খণ্ড ভাবের অধীন থাকিয়া মহাভাবের ধারণা করা অসম্ভব,) ভাবাতীত স্বরূপ ত' সুদূর স্বপ্নমাত্র। আর যে ক্ষুদ্র মনুষ্যের হৃদয়ে খণ্ড ভাবেরও উদয় হয় নাই, সে কি বুঝিতে পারিবে? (মাকে বুঝিতে হইলে মাতে আত্মসমর্পণ

করিয়া তাঁহার সঙ্গে একাত্মতা লাভ করিতে হয়——মা হইতে পৃথক্ থাকিয়া মাকে বুঝা চলে না। 'অহং' ভাবের নিবৃত্তিরূপ সেই আত্মসমর্পণ-যোগ মার পূর্ণ কৃপা-সাপেক্ষ।) সেই অবস্থা লাভ হইলে মার সঙ্গে সন্তানের কোন ভেদ থাকে না, তখন একমাত্র মা-ই চিদানন্দস্বরূপে বিরাজ করেন। তখন তিনি নিজেই নিজকে জানেন। সে আত্ম-পরিচয় ত সদাই তাঁহার রহিয়াছে। কিন্তু তাহাতে জীবের কি? জীবের পক্ষে মাকে বুঝিবার চেষ্টা চিরকাল বিড়ম্বনাই থাকিয়া যায়।

যখন কর্ম্ম, যোগ ও ভক্তির প্রভাবেও মাকে স্বরূপতঃ চিনিতে পারা যায় না, তখন চরিত্র দেখিয়া ও উপদেশ শুনিয়া তাঁহাকে যে ঠিকভাবে বুঝা যাইতে পারে না ইহা বলাই বাহুল্য। চরিত্র অন্তঃস্থিত ভাবের দ্যোতক মাত্র। (যিনি স্বয়ং কোন ভাবের অধীন না হইয়াও সকল ভাব লইয়া খেলা করিতে পারেন এবং লীলাচ্ছলে করিয়াও থাকেন, তাঁহাকে চরিত্র দ্বারা কি বুঝিব? লোকশিক্ষার জন্য তিনি শাস্ত্র ও সমাজ-মর্য্যাদা রক্ষা করিতে পারেন এবং করিয়াও থাকেন; আবার লোক-শিক্ষার জন্যই অথবা অন্য কোন অচিন্ত্য কারণবশতঃ তিনি তাহা লঙ্ঘনও করিতে পারেন, কিন্তু তাহাতে তাঁহার গৌরবই বা কি ও হানিই বা কি? তিনি ত' আর কার্য্যকারণ নিয়মের অধীন নন,—কর্ম্ম অথবা পাপপুণ্য তাঁহাকে আশ্রয় করিতে পারে না। তাঁহার আচরণ যে সবসময়ই সাধারণ লোকের অনুকরণীয় হইবে, তাহার কোন অর্থ নাই।) শিব হলাহল

পান করিয়া মৃত্যুঞ্জয় হইলেও সাধারণ জীবের পক্ষে বিষপান মৃত্যুরই কারণ হইয়া থাকে। (তিনি দেশ, কাল ও পাত্রানুসারে ব্যবহার করিয়া থাকেন, আবার কোন কোন সময়ে তাঁহার আচরণ বুদ্ধির অগম্য হয়) সন্নিহিত ব্যক্তিগত ফলের আকাঙ্ক্ষা, বিচিত্র প্রাক্তন কর্ম্ম-সংস্কারের প্রভাব ও বিচার-বুদ্ধির প্রেরণায় সাধারণ মনুষ্য কর্ম্মপথে অগ্রসর হয়, কারণ তাহার সমগ্র জীবনের ভিত্তি 'অহং'-ভাবের উপর প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু যিনি মানব-দেহ ধারণ করিয়াও দেহাত্মবোধশূন্য, জন্ম হইতেই যাঁহার জ্ঞান-বিভব অলুপ্ত রহিয়াছে, অভিমান ও স্বার্থকলুষ ইচ্ছা যাঁহার হৃদয়কে স্পর্শ করিতে পারে না, তাঁহার আচরণ, ব্যক্তিগত সংস্কার ও আদর্শের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয় না; এক মাত্র স্বভাবের প্রেরণার দ্বারাই তাঁহার যাবতীয় ব্যবহার সম্পন্ন হইয়া থাকে। সুতরাং সামান্য মানুষের বিচারের মানদণ্ড দিয়া তাঁহার চরিত্রের মাহাত্ম্যাদি নিরূপণ করা যায় না। (নীতিশাস্ত্র, ধর্ম্মশাস্ত্র, ও আচারশাস্ত্র কোন শাস্ত্রই তাঁহাকে বুঝাইতে পারে না; তাঁহার চরিত্র বেদবিধির বহির্ভূত)। মনুষ্যের চরিত্র হইতে তাহার ভাবেরই অনুমান করা যায়, কিন্তু যিনি ভাবের সীমা অতিক্রম করিয়া রহিয়াছেন অথচ স্বয়ং নির্লিপ্ত অভিমানশূন্য থাকিয়াও নানা ভাব লইয়া অভিনয় করিয়া থাকেন, তাঁহার স্বরূপগত পরিচয় চরিত্র হইতে কিছুমাত্র পাইবার আশা করা যায় না, ইহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে।

মৌলিক উপদেশ অতি মধুর ও লোকহিতকর হইলেও উপদেষ্টার স্বরূপ-বোধ তাহা হইতে হয় না। একটি ক্ষুদ্রমতি বালক তাহাকে প্রদত্ত উপদেশ হইতে যদি তাহার অধ্যাপকের পাণ্ডিত্যের নির্ণয় করিতে চেষ্টা করে তবে তাহা সফল হয় না। তা' ছাড়া বৈখরীবাণীর উপদেশ স্বভাবতঃই অপূর্ণ, তাহাতে বিশুদ্ধ জ্ঞানের বিকাশ সম্ভবপর নহে; বিশেষতঃ উপদেশ-গ্রহণ শ্রোতার অধিকার ও যোগ্যতার উপর নির্ভর করে। বৈখরীর অতীত সূক্ষ্মবাণীও শ্রোতার মানসিক যোগ্যতার তারতম্যবশতঃ অল্পাধিক বিকৃত ভাবে গৃহীত হয়; অন্যের নিকট প্রকাশনের সময় আরও বেশী বিকারপ্রাপ্ত হয়। ইহা স্বাভাবিক। এই অবস্থায় উপদেশ হইতেও মার যথার্থ পরিচয় পাওয়া যাইবে না।

(এইগ্রন্থ বা এই প্রকার অন্য গ্রন্থ হইতে, এমন কি মার স্বমুখ হইতে প্রাপ্ত উপদেশ হইতেও, মাকে চিনিতে চেষ্টা করা বৃথা।) সুতরাং ঠিকভাবে মার পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া—মাকে চেনা কথার কথা নহে। যোগ, যাগ, তপস্যা, তন্ত্র, মন্ত্র—কত উপায় আছে, কিন্তু কোন উপায়েই তিনি সুলভ নহেন। পূর্ণ পরিচয় ত দূরের কথা, আংশিক পরিচয়ই বা কয়জনে পাইয়া থাকে? তিনি সকাম সাধকের দুর্ল্লভ, নিষ্কামেরও দুর্ল্লভ। যে সকাম সে কাম্যবস্তু চায়, সে ভোগলিপ্সু, সে ত' মাকে চায় না, মার বিভূতিতে মোহিত হইয়া ঐ বিভূতি বা ঐশ্বর্য্যের দিকেই সে আকৃষ্ট হইয়া পড়ে, মাও তাহাকে তাহাই দেন,

সেই ভাবেই নিজেকে তাহার নিকট প্রকাশিত করেন। পক্ষান্তরে যে সাধক নিষ্কাম, যে বৈরাগ্যবান্, সে মুমুক্ষু—ভোগাকাঙ্ক্ষা তাহার না থাকিলেও মোক্ষলিপ্সা তাহার থাকে, কিন্তু ভোগের ন্যায় মোক্ষও মায়ের বিভূতিমাত্র। মা এইরূপ সাধককে সংসার-বন্ধন হইতে মুক্তিদান করেন। ভোগ ও মোক্ষ যাঁহার চরণকমল হইতে নিঃসৃত হইতেছে, সেই মহাশক্তিরূপা চিদানন্দময়ী জননী শিব ও জীব উভয়েরই প্রসূতি, তিনি পূর্ণা, পরাৎপরা, সনাতনী, তিনি রহস্যরূপা, রসময়ী, প্রেমঘন-বিগ্রহা, তাঁহাকে কয়জনই বা চায়? কয়জনই বা তাঁহার সন্ধান জানে? ভোগপথের ঐশ্বর্য্য ও মুক্তিপথের কৈবল্য—দুই-ই মায়ের চরণে লুটাইয়া রহিয়াছে। দুইয়েরই আকাঙ্ক্ষা মাকে পাওয়ার পথে কণ্টক। যে প্রেমের সন্ধান না পাইয়াছে তাহার নিকটেই ভোগৈশ্বর্য্য (ঐহিক, পারত্রিক ও নিত্য) এবং কৈবল্য (পুরুষ-কৈবল্য ও ব্রহ্ম-কৈবল্য) পুরুষার্থরূপে প্রতীয়মান হয়, মহামায়া বিশ্বজননী তাহার নিকট গুপ্ত থাকেন, তাহাকে তাহা দিয়াই তৃপ্ত রাখেন। সেজন্য তাঁহার আপন পরিচয় ভোগার্থী ও মোক্ষার্থীর নিকট প্রচ্ছন্ন থাকিয়া যায়, কারণ যে তাহাকে চায় না, তাহার নিকট তিনি আত্ম-প্রকাশ করিবেন কেন?

(২)

তবে কি মা একেবারেই ধরা দেন না? তাহা অবশ্য বলা যায় না। অতি দুর্গম, অতি দুর্জ্ঞেয় হইলেও তিনি

কখনও কখনও আত্মপ্রকাশ করেন, কারণ তিনি বাৎসল্য-রসে বিভোর। সন্তানের প্রাণস্পর্শী "মা, মা" ডাকে তিনি সাড়া না দিয়া পারেন না। যোগ, জ্ঞান, ভক্তি, কোন উপায়, কোন তপস্যা না থাকিলেও শিশুর ন্যায় সরল হৃদয়ে মাতৃহীন বালকের ন্যায় আকুল প্রাণে "মা, মা" বলিয়া ডাকিতে পারিলে মায়ের স্তন্যে সুধারসের সঞ্চার না হইয়া পারে না। মাতৃস্নেহের ভিখারী শিশুহৃদয়কে তিনি অমৃতরসে অভিষিক্ত করেন,—শিশু মাকে প্রাপ্ত হইয়া, মাকে মা বলিয়া ডাকিয়া ও মায়ের আদর-সোহাগ লাভ করিয়া ধন্য হইয়া যায়। মায়ের স্বরূপ-পরিচয় না পাইলেই বা তাহার ক্ষতি কি? কারণ, সে মায়ের বিশেষ পরিচয় না পাইলেও মাকে নিজের স্নেহশালিনী আনন্দময়ী জননীরূপে চিনিতে পারে। ইহাই তাহার পক্ষে যথেষ্ট, সে ইহার চেয়ে অধিক জানিতে চেষ্টা করে না; কারণ শিশুভাবের সঙ্গে ঐরূপ চেষ্টার কোন সামঞ্জস্য নাই; আর করিলেও সে মাকে হারাইয়া ফেলে এবং নিজে কৃত্রিমতার কূপে নিমগ্ন হইয়া মাতৃদর্শনে বঞ্চিত থাকে। সুতরাং শিশুর পক্ষে মাকে বুঝিবার চেষ্টা নিষ্ফল হইলেও শিশুভাবই মাকে মাতৃরূপে আস্বাদন করিবার একমাত্র সহায়, ইহা সত্য, কারণ নিজে সন্তানভাব আশ্রয় করিতে না পারিলে মাতৃভাবের মাহাত্ম্য অনুভব করা যায় না। মাতৃশক্তির অনন্ত মহিমা এই বালভাবের মধ্য দিয়াই কথঞ্চিৎ আত্মপ্রকাশ করিয়া থাকে। কাজেই যদিও মার পরিচয় পাওয়ার আশা সুদূর-পরাহত,

তথাপি সন্তান-বাৎসল্যের উচ্ছ্বাসে মা স্বয়ং যাহার নিকট যতটুকু আত্মপ্রকাশ করেন তাহার নিকট ততটুকুই সত্য বলিয়া বিবেচিত হয়। তাঁহার চরিত্র ও উপদেশ হইতে তাঁহার প্রকৃত পরিচয় আবিষ্কার করিতে চেষ্টা না করিয়া উহাতে মাতৃস্নেহের লীলা বিলাস দর্শন প্রায়ই সঙ্গত। শুষ্ক যুক্তি-তর্কের গণ্ডীর ভিতরে আকর্ষণ করিয়া রসবস্তুর মাধুর্য্য নষ্ট করা উচিত নহে।

কিন্তু সেরূপ শিশুভাব ত' সর্ব্বত্র সুলভ নহে। শিশুর অজ্ঞান বা বিবেকের অভাব সুলভ হইতে পারে, কিন্তু তাহার সরলতা ও পবিত্রতা অতি দুর্ল্লভ। অথচ মাতৃদর্শনের পক্ষে তাহাই একান্ত আবশ্যক।

(৩)

স্থূল ও বাহ্যপরিচয় লোকের সংস্কার-ভেদে নানা প্রকার হয় তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। কিন্তু সে পরিচয় যে বাস্তবিক পরিচয় নহে, তাহা বুঝাইবার আবশ্যকতা নাই। যাঁহারা মায়ের স্থূলদেহের ইতিহাস অবগত আছেন, তাঁহারা জানেন, বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন লোক তাঁহাকে বিভিন্ন দৃষ্টিতে দেখিয়াছে। কালের পরিবর্ত্তনে অনেকের দৃষ্টিতে পরিবর্ত্তনও যে না হইয়াছে, এমন নহে। সৃষ্টির মধ্যে সর্ব্বত্রই বৈচিত্র্য আছে, এখানেও আছে, তাহা অস্বীকার করা যায় না।

যখন বাজিতপুরে সর্ব্বপ্রথম মার জীবনগত বৈশিষ্ট্য লোকের দৃষ্টিগোচর ও শ্রুতিগোচর হইতে আরম্ভ হয়, তখন বিচারবিরহিত সাধারণ লোকে ঐ অবস্থাকে অজ্ঞতাবশতঃ ভূত,

প্রেত বা ক্ষুদ্র দেবতার আবেশ বলিয়াই মনে করিত। ভূতাপসারণের জন্য অনুরূপ উপায়ও অবলম্বিত হইয়াছিল; কিন্তু এ ভূত-ছাড়ান যে ওঝার ক্ষমতার বহির্ভূত তাহা অল্পদিনেই সকলেই বুঝিতে পারিয়াছিলেন। কেহ কেহ ঐ সময়ে মাকে বায়ুরোগ, হিষ্টীরিয়া বা তজ্জাতীয় রোগের প্রভাবাধীন মনে করিতেন। ভাবের বিকাশে দেহে যে সকল অসাধারণ লক্ষণ প্রকাশিত হইত, সে সব তাঁহারা রোগের চিহ্ন বলিয়াই মনে করিতেন। কিন্তু তাঁহারাও শীঘ্রই নিজেদের ভ্রম বুঝিতে পারিয়াছিলেন। ভাব কাহাকে বলে তাহা সাধারণ মনুষ্য জানে না,—ভাবের স্ফুরণবশতঃ যে সকল দৈহিক পরিবর্ত্তন উৎপন্ন হয় তাহাও তাহারা বুঝে না। সুতরাং আপাততঃ বাহ্যলক্ষণের কিঞ্চিৎ সাদৃশ্য দেখিয়া তাহাদের যে বিচার-মোহ উপস্থিত হয় তাহা অমূলক নহে। শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু ও অন্যান্য মহাপুরুষ সম্বন্ধেও এইরূপ লোকমত স্থানে স্থানে কিছুদিনের জন্য প্রচারিত হইয়াছিল।

যাহা হউক, এই দুইটী মত এখন আর প্রচলিত নাই। তবে অন্য মত এখনও আছে—এবং বোধ হয় চিরদিনই থাকিবে।*

---

* যাঁহারা হিন্দু, বৌদ্ধ ও খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মের ইতিহাস অবগত আছেন তাঁহারা এই মতভেদের বিষয় ভাল করিয়াই জানেন। শ্রীকৃষ্ণকে কেহ ভগবানের অবতার বলিতেন ও কেহ স্বয়ং ভগবান্ বলিয়া বর্ণনা করিতেন। কেহ কেহ তাঁহাকে নারায়ণ ঋষির অবতার বলিতেন। আবার কেহ তাঁহাকে সাধারণ মনুষ্য বলিয়াই মনে করিত। "অবজানন্তি মাং মূঢ়া

ইহার কোন কোন মত খুবই বিচিত্র। তবে বিচিত্র হইলেও ইহার কোনটীই উড়াইয়া দেওয়া যায় না, কারণ যিনি যে মত পোষণ করেন তাহার যুক্তি ও বিশ্বাস তাঁহারই অনুকূল থাকে। অন্যের দৃষ্টিতে তাহা বিচারসহ না হইলেও তাহাকে অমূলক বলিয়া নিরাকরণ করা চলে না।

প্রথম মতে মা একজন শ্রেষ্ঠ সাধিকা। তিনি পূর্ব্বজন্মে উচ্চ সাধনার ফলে ঊর্দ্ধগতি লাভ করিয়াছিলেন। কিন্তু পূর্ণ-জ্ঞানের অভাবে আবার দেহ গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছেন। ইহাদের মতে মা এই দেহে জ্ঞানের পূর্ণবিকাশ লাভ করিয়া জীবন্মুক্তি বা স্থিতপ্রজ্ঞদশা প্রাপ্ত হইয়াছেন। এই জন্মে বাহ্য গুরুর আবশ্যকতা হয় নাই—অন্তঃস্থিত অন্তর্য্যামী গুরুই

মানুষীং তনুমাশ্রিতম্” (গীতা) এই ভগবদ্‌বাক্য হইতে জানা যায় যে, অনেকে তাঁহাকে অবজ্ঞাও করিত। বুদ্ধ সম্বন্ধেও সেইরূপ নানা মত বৌদ্ধ সাম্প্রদায়িক সাহিত্যে দেখিতে পাওয়া যায়। স্থবিরবাদী ও মাহাসঙ্ঘিক সম্প্রদায়ের দৃষ্টিতে যে মূলেই ভেদ ছিল তাহা প্রসিদ্ধ। তা' ছাড়া ধর্ম্মকায় বা স্বভাবকায়, সম্ভোগকায় ও নির্ম্মাণকায়ের আলোচনার ফলে রাজা শুদ্ধোধনের পুত্র গৌতম অনেকের নিকট নির্ম্মাণকায় রূপেই গৃহীত হইতেন। এই ত্রিকায়ের পরস্পর সম্বন্ধ ও গৌতমনামক ঐতিহাসিক পুরুষের তত্ত্ব নিয়া বহু মতভেদ রহিয়াছে। খ্রীষ্ট সম্বন্ধেও তাই। খ্রীষ্টীয় সমাজে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া এই মতভেদের বিকাশ চলিয়াছে। Docetism, Adoptionism, Modalism Monarchianism, Anianism প্রভৃতি মতের ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিলে ইহা স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায়।

তাঁহাকে প্রয়োজনানুসারে চালনা করিতেছেন। ইহাই তাঁহার শেষ জন্ম।

কিন্তু এই মত সকলে স্বীকার করেন না। তাঁহারা মনে করেন যে, মায়ের জীবনে যে সব অলৌকিক বিভূতি ও ব্যাপার লক্ষিত হয় তাহার কিয়দংশ সিদ্ধি ও জীবন্মুক্তিবাদের দ্বারা উপপাদন করা যায় বটে, কিন্তু তাঁহার জীবন-ধারায় এমন সকল ব্যাপার ঘটিতে দেখা যায়, যাহা বুঝা কঠিন। ঐ সব ব্যাপার জন্মান্তরের সাধনজন্য সংস্কারের বিকাশফলে হইতে পারে। এই মতে মা সাধিকা নহেন, জীবন্মুক্তও নহেন। যদি জীবন্মুক্ত বলিতে হয় তবে জন্মাবধিই তিনি জীবন্মুক্ত। আধি-কারিক পুরুষের ন্যায় স্বীয় অধিকার সমাপন করিবার জন্য তিনি জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। এই অধিকারও একজাতীয় প্রারব্ধ।

কেহ কেহ আপত্তি করেন যে, পূর্ব্বোক্ত মতও সমীচীন নহে। কারণ, মার জীবনে কোন অধিকার-সংস্কার দেখিতে পাওয়া যায় না। এমন কি, জীবকে জ্ঞান ও ভক্তি দান করিয়া উদ্ধার করিবার যে সংস্কার তাহাও তাঁহাতে নাই। তিনি এ পর্য্যন্ত নিজেকে গুরুভাবে ধরা দেন নাই। তাঁহার চরিত্র ও উপদেশ জগতের পারমার্থিক কল্যাণের জন্য হইলেও ঐ প্রকার কল্যাণ করিবার সংস্কার তাঁহাতে নাই। এই মতে মা নিত্য-সিদ্ধা ও ভগবানের পরিকর-স্বরূপ। কোন বিশেষ প্রয়োজনে ভগবদিচ্ছায় কিছুদিনের জন্য জগতে আসিয়াছেন। প্রয়োজন সিদ্ধ হইলে আপনিই যথাস্থানে ফিরিয়া যাইবেন।

কিন্তু এই মতও সকলের উপাদেয় নহে। তাঁহাদের ধারণা—মা প্রত্যক্ষ মহাদেবী; ভক্তের আহ্বানে ও জগতের মঙ্গলার্থে দেহ গ্রহণ করিয়াছেন। ইঁহারা বলেন যে, মার ঠাকুরমা কসবা কালীবাড়িতে কালীমাতার নিকট পুত্রের "পুত্র হউক" প্রার্থনা না করিয়া "কন্যা হউক" বলিয়া প্রার্থনা করেন। তাহারই ফলে মার জন্ম হয়। ইঁহারা বিশ্বাস করেন—ভগবতী কালীই স্বাংশে মা হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। *

অন্যে বলেন যে, মাকে কালী বা দুর্গা না মনে করিয়া আদ্যাশক্তি মহামায়া বলিয়াই ধারণা করা উচিত। কেহ (যেমন লাবণ্য) তাঁহাকে দশভুজা দুর্গারূপে দেখিয়াছে, আবার কেহ সরস্বতীরূপে (যেমন নির্ম্মলবাবু), ছিন্নমস্তারূপে (যেমন প্রমথবাবু) বা দশমহাবিদ্যারূপেও (যেমন প্রমথবাবুর চাপরাশী) দেখিয়াছে। আরও কতরূপে কত জনে দেখিয়াছে।

---

* ঢাকা শাহবাগে থাকার সময় যে কালী শূন্যপথে আবির্ভূত হন ও মার দেহে ঝাঁপাইয়া পড়িতে উদ্যত হন, যাহার ফলে ঢাকাতে কালী-প্রতিষ্ঠা হয়, তাহা এই মতে কতকটা বুঝিতে পারা যায়। অনেকেই মার দেহে কালীমূর্ত্তির বিকাশ দেখিতে পাইত। অনেকদিন পর্য্যন্ত লোকে তাঁহাকে "মানুষকালীও" বলিত। কালীমূর্ত্তির সঙ্গে তাঁহার তাদাত্ম্যও কখনও কখনও দেখা গিয়াছে। কক্সবাজারে থাকিতে মা বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, ঢাকায় কালীমূর্ত্তির আভূষণ চুরি হয়। নিজদেহে যাতনা অনুভব করিয়াছিলেন।

মহাভাবময়ী রাধারূপেও কেহ তাঁহাকে ধারণা করে—কেহ বা তাঁহাকে সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণের আবেশ বলিয়াই বিশ্বাস করে।

(৪)

এইরূপ কত জনে কত ভাবে মাকে দেখিয়া থাকেন। ইহার মধ্যে কোন্ দেখাটী সত্য, কোন্‌টী অসত্য? যদিও ভাবভেদে ইহার কোনটীকেই একেবারে অসত্য বলা চলে না—কারণ যে যে ভাবে তাঁহাকে দেখে বা বুঝে তাহার নিকট তিনি সেই ভাবেই প্রতিভাত হন—তথাপি আমার মনে হয়, হয়ত ইহার কোনটীই তাঁহার প্রকৃত পরিচয় নহে। একবার ভারত-ধর্ম্ম মহামণ্ডলের প্রচারক ৺দয়ানন্দ স্বামী মহাশয় মাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "মা, তুমি কি? কেহ বলে তুমি অবতার, কেহ বলে তুমি আবেশ, কেহ বলে তুমি সাধক বা সিদ্ধ জীব। আমি সত্য সত্য জানিতে ইচ্ছা করি তুমি কি?" মা বলিয়াছেন, "তুমি কি মনে কর, বাবাজী? তুমি যাহা মনে কর আমি তাহাই।" মার এই উত্তরের মধ্যেই মার প্রকৃত পরিচয়ের আভাস গুপ্তভাবে নিহিত রহিয়াছে বলিয়া বোধ হয়। গীতাতে ভগবান্ বলিয়াছেন, "যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাং-স্তথৈব ভজাম্যহম্"; মার পূর্ব্বোক্ত বচনও তাহারই অনুরূপ। মার ত ব্যক্তিত্বের বা অভিমানের গণ্ডী নাই যে, তাহা দ্বারা তিনি পরিচ্ছিন্ন হইবেন। তিনি স্বচ্ছ, শুদ্ধ, স্বপ্রকাশ ও বিশাল সত্তারূপে আপন মহিমাতে আপনি বিরাজ করিতেছেন—কিন্তু

সকল লোকে তাঁহাকে সংস্কারবশে সে স্বরূপে দেখিতে পাইতেছেন না। কারণ চিত্ত সংস্কারের পাশ হইতে মুক্ত না হইলে সত্যদর্শন লাভ করিতে পারে না। যাহার চিত্ত যে সংস্কারে রঞ্জিত, সে তাঁহাকে সেই ভাবেই দেখিবে, এবং সংস্কার-মুক্ত না হওয়া পর্য্যন্ত সেই দেখাই তাহার পক্ষে স্বাভাবিক।

সেইজন্য খাঁটি সত্য না হইলেও কোন মতকেই একেবারে উপেক্ষা করা চলে না। যিনি যে মতের ভক্ত, তাঁহার নিকট সেই মত আদরণীয় হয়, কারণ তিনি নিজের বিচার-বুদ্ধিতে তাহারই মহত্ত্ব দেখিতে পান।

কিন্তু এ সকল মত জানিয়া লাভ কি? শ্রদ্ধাবান্ সাধারণ মনুষ্য শিশুজনোচিত সরল হৃদয় লইয়া মার নিকট উপস্থিত হইলেই মায়ের বাৎসল্য, করুণা ও স্নেহের শীতল ছায়া প্রাপ্ত হইতে পারিবে। তখন ক্রমশঃ মাতৃসঙ্গের প্রভাবে মায়ের অন্তঃপ্রকৃতি তাহার নিকট একটু একটু প্রকাশিত হইবে। 'মা বস্তুতঃ কি', এই প্রশ্ন লইয়া সে আর মাথা ঘামাইবার প্রয়োজন বোধ করিবে না।

(৫)

মা যাহাই হউন—তাঁহার মনুষ্য-দেহের লীলার আলোচনায় আমরা এমন কতকগুলি সত্যের অনুভব করিতে পারি, যাহা মনুষ্য-হিসাবে আমাদের অবশ্য জ্ঞাতব্য ও স্মরণ রাখার যোগ্য। কি ভাবে ভগবান্‌কে লাভ করিতে হয়, তাঁহাকে পাইবার জন্য

২

কি প্রকার সংযম, নিষ্ঠা, বৈরাগ্য, অনাসক্তি ও ত্যাগ আবশ্যক হয়, কর্ম্ম, ভক্তি, যোগ ও জ্ঞানরূপ সাধনার স্বরূপ ও পরিণাম কি, তপস্যা কি, পূর্ণ আত্মসমর্পণ বা নির্ভরভাব কাহাকে বলে, ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনের উপর ভগবৎ-সাক্ষাৎকারের প্রভাব কি—এই সব এবং এই প্রকার অন্যান্য বহু প্রশ্নের মীমাংসা মার বাহ্য চরিত্র হইতে উপলব্ধ হইতে পারে। এ সব কম কথা নহে। শাস্ত্রে অনেক বিষয়ের আলোচনা থাকিলেও তাহার প্রত্যক্ষ নিদর্শন না পাওয়া পর্য্যন্ত সকলে সমভাবে তাহাতে দৃঢ় শ্রদ্ধা স্থাপন করিতে পারেন না। কিন্তু যখন ঐ সকল সত্য জীবন্তভাবে কাহারও চরিত্রমধ্যে অভিনীত হইতে দেখা যায়, তখন শাস্ত্রবাক্যে অবিচলিত শ্রদ্ধা উৎপন্ন হয় এবং নিজের জীবনের উপরে তাহার প্রভাব বিস্তৃত হইয়া পড়ে। মার প্রকৃত পরিচয় যাহাই হউক, তাহা সাধারণ মনুষ্য তাঁহার বিশেষ কৃপা ব্যতিরেকে কখনই ঠিক ঠিক লেশমাত্রও জানিতে পারিবে না, এবং কাহারও নিকট হইতে সে সম্বন্ধে কোন ইঙ্গিত শুনিলেও সে তাহা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবে না। কিন্তু মার স্থূল জীবনের ধারা দেখিয়া ও আলোচনা করিয়া সে অনেক বিষয়ে লাভবান্ হইতে পারিবে। মার চরিত্র ও উপদেশ হইতে সে তাঁহার তত্ত্ব বুঝিতে না পারিলেও চরিত্র হইতে আত্মোন্নতির মার্গের সন্ধান প্রাপ্ত হইতে পারিবে এবং উপদেশ হইতে সাধন ও আচরণ বিষয়ে অনেক শিক্ষালাভ করিতে পারিবে।

মার চরিত্র সর্ব্বাংশে অনুকরণীয় নহে, ইহা সত্য। কারণ তিনি আত্মবোধে প্রতিষ্ঠিত, ভাবাভাবের অতীত, দ্বন্দ্ববিনির্ম্মুক্ত ও শাস্ত্রীয় বিধি-নিষেধের বহির্ভূত। তিনি তিনিই—তিনি কাহারও অনুকরণের যোগ্য নহেন। যদিও সেই স্থিতিতে তাঁহার কিছুই কর্ত্তব্য নাই,—কারণ তাঁহার এমন কিছুই অপ্রাপ্ত নাই যাহা প্রাপ্ত হইবার জন্য তাঁহার কর্ম্ম হইতে পারে—তথাপি স্বভাবের প্রেরণায় লোকশিক্ষার জন্য তাঁহার দেহাশ্রয়ে কখনও কখনও এমন কতকগুলি কর্ম্মের অনুষ্ঠান হয় যাহা সংসারী লোকের অনুকরণীয়। যদিও এই সকল কর্ম্ম স্বাভাবিক নিজের পৃথক্ ইচ্ছাপ্রসূত নহে এবং অজ্ঞান জগতের সব কর্ম্মই কর্ত্তার ইচ্ছামূলক, তথাপি জাগতিক জীবের পক্ষে ঐ সকল কর্ম্ম অনুকরণীয়। মা মুগ্ধ জীবকে স্বয়ং আচরণ করিয়া দেখাইয়া দিয়াছেন—কোন্ কর্ম্ম কি ভাবে করিতে হয়; উদ্দেশ্য, ঐ দেহের আচরণ দেখিয়া কৃত্রিমভাবে হইলেও জীব ঐরূপ কর্ম্ম করিতে প্রবৃত্ত হইতে পারিবে। তবে তাঁহার এই আচরণ অভিনয় মাত্র—এবং ইহা বিচিত্র অভিনয়, কারণ তাঁহার দেহ আশ্রয় করিয়া এই অভিনয় আপনা আপনিই হইয়া যায়। অবশ্য ইহাও সত্য যে, মার দেহে অনেক সময় এমন সকল কর্ম্মের উদ্ভব হয়, যাহার রহস্য ভেদ করা কঠিন, যাহা স্পষ্টতঃ কোনও জীবের আদর্শরূপে গ্রহণযোগ্য নহে। কিন্তু এই প্রকার কর্ম্মও জীব ও জগতের কল্যাণের জন্যই হইয়া থাকে।*

---

* মা অনেক সময় বলিয়া থাকেন, "এ শরীরের সবই তোমাদের

সুতরাং মাকে মনুষ্য বলিলেও তাঁহাকে ছোট করা হয় না, আবার অবতার অথবা নিত্যসিদ্ধ বলিয়া স্তুতি করিলেও তাঁহার উৎকর্ষ খ্যাপন হয় না। যাঁহার সত্তা ও বোধ সাম্যভাবে প্রতিষ্ঠিত, তাঁহার পক্ষে ছোট ও বড়, স্তুতি ও নিন্দা, দুই-ই সমান, তাঁহার উৎকর্ষ বা অপকর্ষ সম্ভবপর নহে। সমস্ত জগৎই তাঁহার আপন ঘর, সমস্ত সত্ত্ববর্গেরই তিনি আপন জন। তিনি স্বভাবে থাকিয়া সর্ব্বত্র স্বভাবেরই খেলা নিরীক্ষণ করেন। অভিমান-বশে ক্ষুদ্র মনুষ্য কর্ত্তা সাজিয়া নিজেকে স্বাধীন মনে করিলেও ইহা সত্য যে, যেখানে যাহা কিছু হইতেছে, সবই স্বভাববশতঃই হইতেছে। অবিদ্যার মোহে তাহা বুঝিতে পারা যায় না বলিয়া মহাশক্তির খেলায় ইচ্ছাশক্তির আরোপ হয় ও তাহার অবশ্যম্ভাবী ফল সুখ-দুঃখ-ভোগ অনিবার্য্য হইয়া পড়ে।

যখন মা পূর্ব্বে গৃহস্থাশ্রমে গৃহকার্য্যে নিরত ছিলেন, তখনও তিনি যে বোধে অবস্থিত ছিলেন, গৃহাশ্রম হইতে পৃথগ্‌ভাবে বিচরণ করিয়াও এখনও তিনি সেখানেই প্রতিষ্ঠিত আছেন। তাঁহার স্থিতি অটল। দেহ নানা সময়ে নানা সাজে সাজিয়াছে

প্রয়োজন অনুযায়ী আপনা হইতে হইয়া যাইতেছে।” ইহা হইতে বুঝা যায়, মার দেহে যখন যেরূপ অভিনয়ই হউক না কেন, তাহা তাঁহার ইচ্ছাকৃত নহে,—স্বাভাবিক। উহা কাহারও না কাহারও প্রয়োজনের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। মনুষ্য অদূরদর্শী বলিয়া সব সময় এই প্রয়োজন দেখিতে পায় না বটে, কিন্তু প্রয়োজন আছেই। ব্যাসদেব যোগভাষ্যে ঈশ্বরের দেহ-গ্রহণ সম্বন্ধে এক স্থানে লিখিয়াছেন, “তস্য আত্মানুগ্রহাভাবেঽপি ভূতানুগ্রহ এব প্রয়োজনম্।” ইহাও সেইরূপ।

বটে—যখন যে ভাবে সাজিয়াছে, তখন সেই অভিনয়ই যথাবৎ হইয়া গিয়াছে—কিন্তু তিনি জানেন, তিনি যেখানে আছেন, সেইখানেই আছেন, সেখানে থাকিয়াই সাক্ষিরূপে নির্ব্বিকার-ভাবে দেহ ও দেহাশ্রিত সংসারের অভিনয় দেখিয়া যাইতেছেন।

(এই যে ক্রিয়ার মধ্যে অকর্ত্তা হইয়া শুধু দ্রষ্টারূপে অবস্থান, ইহা সাধারণ মনুষ্যের পক্ষে বুঝিয়া উঠা কঠিন।) বোধস্বরূপে স্থিতি থাকিলেও শক্তির খেলা স্বভাবতঃ যখন যেখানে যেমন হইবার তাহা হইয়া যাইতেছে—তাহাতে সত্যভাবের নির্লিপ্ততা ও নিঃসঙ্গতা লেশমাত্র ক্ষুণ্ণ হইতেছে না। (ইহা সাধারণ বুদ্ধির অতীত রহস্য।)

মনুষ্যের সকল কর্ম্মের মূলে ইষ্টসাধনতা-জ্ঞান বা কর্ত্তব্যবোধ নিহিত থাকে—অর্থাৎ মনুষ্য সেই কর্ম্মই করিতে প্রবৃত্ত হয় যাহা হইতে সুখপ্রাপ্তি অথবা দুঃখপরিহার হইবে বলিয়া তাহার ধারণা জন্মে, অথবা কোন কোন স্থলে ঔচিত্য-বোধেও সে কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে। দ্বিতীয় আদর্শ অবশ্য প্রথমটী হইতে শ্রেষ্ঠ তবে জগতে ইহারও দৃষ্টান্ত আছে। কিন্তু যিনি আপ্তকাম ও আত্মারাম, (যিনি) কৃতকৃত্য, যাঁহার কোন অভাব-বোধ নাই, তিনি (সুখ-দুঃখে সমদর্শী বলিয়া সুখের প্রলোভনে অথবা দুঃখের তাড়নায় বিচলিত হন না, এবং তাঁহার কোন কর্ত্তব্য থাকে না। কিন্তু তবু তিনি কার্য্য করেন। এ কর্ম্ম স্বভাবের কর্ম্ম, ইচ্ছার প্রেরণা বা 'অহং'বুদ্ধির প্রণোদন হইতে এ কর্ম্ম উদ্ভূত হয় না।) যে হৃদয়ে কর্ত্তৃত্বাভিমানের আবিলতা নাই সেখানে

ফলাকাঙ্ক্ষারূপ ইচ্ছা ও কর্ত্তব্য-বিচারের উদয় হওয়ার সম্ভাবনা কোথায় ? এই কর্ম্মই অকর্ত্তার কর্ম্ম—স্বাভাবিক কর্ম্ম, নির্দ্দোষ কর্ম্ম। ইহা কর্ম্ম হইয়াও অকর্ম্ম। ভগবৎশক্তির উচ্ছ্বাসে সমগ্র বিশ্ব ব্যাপিয়া যে কর্ম্মের স্বতঃ উৎসারিত প্লাবন বহিয়া চলিয়াছে ইহা সেই কর্ম্ম। ইহা লীলারূপী। কর্ত্তার ব্যক্তিগত প্রয়োজনের দ্বারা ইহা পরিচ্ছিন্ন হয় না—জগৎকল্যাণই ইহার একমাত্র ফল। অজ্ঞ জীব আপন সীমাবদ্ধ জ্ঞানের দ্বারা এই মঙ্গলময় লক্ষ্য সব সময়ে ধরিতে না পারিলেও ইহা স্বীকার না করিয়া থাকা যায় না।

মার স্বাভিনীত জীবন-নাটকের ক্রম-বিকাশের পথে আমরা নিম্নলিখিত সত্যগুলি প্রত্যক্ষ করি :—

(ক) অন্তরের তীব্র ব্যাকুলতাই ভগবৎ-প্রাপ্তির প্রধান সহায়। তাঁহাকে পাইতে হইলে দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বৎসরের পর বৎসর, (সর্ব্বদার জন্য সর্ব্বাবস্থাতে)—শয়নে, স্বপ্নে, জাগরণে, উত্থানে, উপবেশনে, যাবতীয় কর্ম্মের আরম্ভে ও পর্য্যবসানে—মনের মধ্যে (তাঁহার জন্য একটা বেদনা জাগাইয়া রাখিতে হয়। সংসারের সুখ-সম্পৎ আরাম আড়ম্বর কিছুতেই যেন হৃদয় হইতে তাঁহাকে ভুলাইতে না পারে।)

(খ) ইহার ফলে ক্রমশঃ চিত্ত তাঁহার চিন্তায় তন্ময় হইতে থাকে ও যাহা কিছু তাঁহার চিন্তার অন্তরায় বলিয়া প্রতীত হয়, তাহার প্রতি অনাস্থা উৎপন্ন হয়। এইরূপে ভগবদ্ভাবের বিরোধী আচরণ ও বৃত্তির প্রতি বৈরাগ্য জন্মে ও সাংসারিক বিষয়ে ক্রমে ক্রমে অনাসক্তি দৃঢ়মূল হয়।

(গ) তখন একান্তে কিছু সময় তাঁহাকে নিয়া থাকিতে হয়। উপদেষ্টার অভাব বোধ হওয়ার কোনই কারণ নাই। কারণ, আপাততঃ হৃদয়ই উপদেষ্টার কার্য্য করিতে পারে। যাহার যে রূপ, যে নাম, যে ভাব ভাল লাগে, তাহার পক্ষে তাহাই প্রথমাবস্থায় স্মরণের পক্ষে অবলম্বনীয়। দীক্ষা না হইলেও ইহাতে কোন বাধা নাই। ক্রমশঃ স্মরণের কাল, মাত্রা, তীব্রতা প্রভৃতি বাড়াইতে হয় বা আপনিই বাড়িয়া যায়। গুরু মন্ত্র, দেবতা প্রভৃতির আবশ্যকতা হইলে ঐ সব যথাসময়ে আপনিই উপস্থিত হয়। তাহার যখন যাহা দরকার তাহাই তখন আবির্ভূত হয়। অবিচ্ছিন্ন স্মৃতিই ধ্যান ও উপাসনা— যাহাতে তাহা আয়ত্ত হয় তাহার জন্য মনোযোগ দিতে হয়। তাঁহার করুণার দিকে দৃষ্টি রাখিয়া ফলের আশা বর্জ্জন-পূর্ব্বক যথাশক্তি নিজে নিজে চেষ্টা করিয়া যাইতে হয়। আহার-শুদ্ধি ও সংযম, বাক্‌সংযম, মৌন, চিন্তাশূন্যতা, কর্ত্তব্য-নিষ্ঠা, সদাচার, সত্য, দয়া, প্রেম, ক্ষমা ও বিচার—সব সদ্‌গুণ চিত্তক্ষেত্রে ধীরে ধীরে প্রয়োজনানুসারে উদ্ভূত হয়। এইরূপে ক্রমশঃ বিশুদ্ধ ভাবের উদয় হয়।

(ঘ) ক্রমে আপন-পর ভাবটা কমিয়া আসে। ব্যবহার-ক্ষেত্রেও আপন-পর ভাবের বিচার উঠিয়া যায়। সমস্ত জগৎই এক অখণ্ড পরিবার বলিয়া বোধ হইতে থাকে।

(ঙ) ধীরে ধীরে ভাবগ্রন্থিগুলি খুলিয়া যায়। মুক্ত শক্তি স্বাধীনভাবে খেলিতে থাকে। সংস্কারের পাশ কাটিয়া যায়।

(চ) এইরূপে সাধনার পরিপক্কতায় খণ্ডভাবের মধ্যে অনন্ত ও অখণ্ড সত্তার প্রকাশ উপলব্ধিগোচর হয়। তখন চিরদিনের জন্য খণ্ডভাব ও খণ্ডকর্ম্মের সমাধান হইয়া যায়। এই যে বিচ্ছিন্নের মধ্যে অবিচ্ছিন্ন সত্তার বোধের কথা বলা হইল, ইহা সাক্ষাৎ অনুভূতি—শাস্ত্রীয় বাক্য ও যুক্তি হইতে উদ্ভূত পরোক্ষজ্ঞান-মাত্র নহে। সেই জন্য যাহার এই বোধ জন্মে তাঁহার চিত্তে সাম্প্রদায়িকতার লেশমাত্র থাকিতে পারে না। যে জন অনন্ত বিভিন্ন ভাবের মধ্যেও একই পরম সত্তার সন্ধান পায়, সে কোন বিশিষ্ট ভাবে বদ্ধ না হইয়াও উহার খেলা অনুভব করিতে পারে।

(ছ) এই প্রকারে ভাবের খেলা দেখিতে দেখিতে ভাবের রাজ্য ছাড়াইয়া উঠিতে পারিলে নির্ম্মল জ্ঞানের আলোকে অন্তরাকাশ উজ্জ্বল হইয়া উঠে। তখন সাধকের নিকট নিত্য ও পূর্ণ সত্য প্রকাশমান হয় ও তাহার মধ্যে তাহার আত্মসমর্পণ পূর্ণতা লাভ করে। এই কালেই 'অহং'বুদ্ধির চরম আহুতি সম্পন্ন হইয়া যায়। তখন নিজের ইচ্ছা বা অনিচ্ছা বলিয়া আর কিছু অবশিষ্ট থাকে না। সর্ব্বত্র সর্ব্বকর্ম্মে এক স্বভাবের খেলাই দৃষ্টিগোচর হয়।

মা বলেন, "অসীমকে পাইতে হইলে প্রথমে সীমার মধ্যে নিজেকে আবদ্ধ রাখিয়া চলিতে হয়—পরে অনন্তের আভাসে সীমার বন্ধন খুলিয়া যায়"। মার নিজের জীবনা-ভিনয়ে আমরা এই সত্য স্পষ্ট বুঝিতে পারি।

(৬)

গ্রন্থপ্রণেত্রী শ্রীমতী গুরুপ্রিয়া দেবীর সম্বন্ধে এইখানে দুই একটী কথা বলা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। গুরুপ্রিয়া, মার একনিষ্ঠ ভক্ত ও সেবক অবসরপ্রাপ্ত সিভিল সার্জ্জন শ্রীযুক্ত শশাঙ্কমোহন মুখোপাধ্যায় (বর্ত্তমানে যিনি স্বামী অখণ্ডানন্দ গিরি নামে পরিচিত) মহাশয়ের কন্যা। তিনি ১৩৩২ সালের পৌষ মাস হইতে মার সৎসঙ্গ-লাভের সৌভাগ্য প্রাপ্ত হইয়াছেন। মাঝে মাঝে কিছু সময়ের জন্য মায়ের আদেশে ব্যবধান ঘটিলেও ঐ সময় হইতে মার সহিত তাঁহার সাহচর্য্য একপ্রকার অবিচ্ছিন্ন ভাবেই বিদ্যমান রহিয়াছে। তিনি অনুক্ষণ মায়ের সেবাকার্য্য ও আনুষঙ্গিক বহু কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিয়াও যে ধারাবাহিক ভাবে মার চরিত্র ও উপদেশাদি লিপিবদ্ধ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন ও করিতেছেন, ইহাতে মার ভক্তবৃন্দ সকলেই তাঁহার নিকট ঋণী। গুরুপ্রিয়া ব্রহ্মচারিণী, বৈরাগ্য-সম্পন্না, নিষ্ঠাবতী ও সর্ব্বোপরি মার প্রতি অসাধারণ ভক্তিবিশিষ্টা—ইহা ছাড়া তাঁহার সূক্ষ্ম দর্শনের ও নিপুণভাবে বর্ণনা করিবার ক্ষমতা অতুলনীয়; বিশেষতঃ নানা কারণে তিনি ঘনিষ্ঠভাবে মার সঙ্গ ও সেবার অধিকার প্রাপ্ত হইয়াছেন। সুতরাং মার বিবরণ লিখিবার যোগ্যতা তাঁহার যে বিশেষভাবে থাকিবে, তাহা নিঃসন্দেহ। বলা বাহুল্য, তিনি সেই যোগ্যতার সদ্ব্যবহার করিয়া ধন্য হইয়াছেন।

শ্রীগোপীনাথ কবিরাজ

অবতরণিকা

(সংক্ষিপ্ত পূর্ব্বজীবন-কথা)

জন্ম ও বাল্যলীলা (১৩০৩-১৩১৫)

শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী * ত্রিপুরা জিলার অন্তর্গত খেওড়া নামক গ্রামে ১৩০৩ সনের ১৯শে বৈশাখ (৩০শে এপ্রেল, ১৮৯৬), বৃহস্পতিবার দিন রাত্রি প্রায় ৩টার সময় জন্মগ্রহণ করেন †। তাঁহার পিতা ৺বিপিনবিহারী ভট্টাচার্য্য ও মাতা শ্রীযুক্তা মোক্ষদাসুন্দরী অথবা বিধুমুখী দেবী ঐ সময়ে স্বস্থান বিদ্যাকূট পরিত্যাগ করিয়া খেওড়া গ্রামে বাস করিতেছিলেন। ঐ গ্রামটি দাদামহাশয়ের (বিপিন বাবুর) মাতুলালয়।

মা তাঁহার পিতার দ্বিতীয় সন্তান। তাঁহার জন্মের পূর্ব্বে তাঁহার একটী ভগিনী জন্মগ্রহণ করিয়াছিল, কিন্তু এই বালিকা

---

*মার গর্ভধারিণী-প্রদত্ত প্রসিদ্ধ নাম নির্ম্মলাসুন্দরী। ইহা ব্যতীত তীর্থবাসিনী, দাক্ষায়ণী, গঙ্গগঙ্গা, বিমলা ও কমলা—এই পাঁচটি নামও তাঁহার ছিল। "আনন্দময়ী" নামটী ঢাকার জ্যোতিষচন্দ্র রায় মহাশয় রাখেন। তদবধি এই নামেই মা সর্ব্বত্র পরিচিতা হইয়াছেন।

† মার জন্মকালে কৃষ্ণপক্ষীয় চতুর্থী তিথি ছিল।

দীর্ঘদিন জীবিত ছিল না। মার জন্মের পূর্ব্বেই সে পরলোক গমন করিয়াছিল। মার পরে তিনটী ভাই পর পর জন্মগ্রহণ করে ও অল্পদিন থাকিয়াই মানবলীলা সম্বরণ করে। তন্মধ্যে প্রথমটী সাত বৎসর জীবিত ছিল। এই ছেলেটীকে যখন শেষ সময়ে বাহির করা হয়, তখন মাকে সে তিনবার "মা, আমি কিন্তু মরি" এই কথা বলিয়া মারা যায়। দ্বিতীয়টীর কপালে রাজটীকার চিহ্ন ছিল দেখিয়া সকলেই বলিত "গরীবের ঘরে এই ছেলে বাঁচিবে না।" মৃত্যুর পূর্ব্বে দাদামহাশয় এই চিহ্ন দেখিয়া বলিয়াছিলেন—"যাওয়ার পূর্ব্বে বুঝি চিহ্ন দেখাইয়া গেল।" চারি বৎসর বয়সের সময় এই ছেলেটীর মৃত্যু হয়। তৃতীয়টী মাত্র দেড় মাস ধরাধামে ছিল। এই তিনটী ভাইয়ের পরে মার দুইটী ভগিনী ও সর্ব্বশেষে একটী ভ্রাতা জন্মগ্রহণ করে। ভগিনী দুইটীর নাম যথাক্রমে সুরবালা * ও হেমলতা এবং ভাইটীর নাম মাখন।

মার পূর্ব্বে একটী সন্তান মরিয়া যাওয়ায় দিদিমা মার আবির্ভাবের পরদিন ভোরবেলাই মাকে তুলসী তলায় গড়াগড়ি দিয়া নিয়া আসিলেন। এইরূপ আঠার মাস পর্য্যন্ত প্রত্যহ গড়াগড়ি দেওয়াইতেন। একটু বড় হইলে মা নিজেই যাইয়া গড়াগড়ি দিয়া আসিতেন। মা'র আবির্ভাবকালে দিদিমা

---

* সুরবালা প্রায় ১৭।১৮ বৎসর বয়সে "দিদি" বলিতে বলিতে দেহরক্ষা করে।

প্রসব-বেদনা ততটা অনুভব করেন নাই, সামান্য একটু বেদনা হইতেই দশ মিনিটের মধ্যেই প্রসব হয়। আর একটী কথা। মা আবির্ভূত হইয়া সাধারণ ছেলে-মেয়ের ন্যায় কাঁদেন নাই—একেবারে চুপ করিয়া ছিলেন। মা এ কথা শুনিয়া বলেন, "কাঁদিব কেন? আমি যে তখন বেড়ার ফাঁক দিয়া আমগাছ দেখিতেছিলাম।" মা'র গর্ভে আবির্ভাব বার্ত্তা প্রকাশ পাইবার পূর্ব্ব হইতে দিদিমা নানা দেবদেবীর মূর্ত্তি স্বপ্নে দেখিতেন, এবং সেই সব মূর্ত্তিকে যে বরণ করিয়া ঘরে তুলিতেছেন এইরূপ দেখিতেন। মার আবির্ভাব হওয়ার পরেও অনেক দিন পর্য্যন্ত তিনি এইরূপ দেখিতেন।

দাদামহাশয়ের বংশমর্য্যাদা খুব। ইঁহারা কাশ্যপগোত্র—বিদ্যাকূটের কাশ্যপেরা বিখ্যাত। বিদ্যাকূটে ইঁহাদের বহু ঘর জ্ঞাতি। ইঁহার মাতামহকুলে একজন এবং দিদিমার পিতৃকুলে একজন সহমরণ গিয়াছিলেন। দাদামহাশয়ের পূর্ব্ব-পুরুষদের মধ্যে কেহ কেহ সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। প্রথম কন্যার জন্মের পর একটী চাকুরী পাইয়া দাদামহাশয় বিদেশে চলিয়া যান। বাড়ী হইতে গিয়া তিন বৎসরের মধ্যে বাড়ীতে কোন খবর দেন নাই বা বাড়ীর কোন খবর নেন নাই। দিদিমাকে মাতামহীর কাছে খেওড়া রাখিয়া গিয়াছিলেন। পরে সেই মেয়েটী মারা যায়—কিন্তু দাদা-মহাশয়ের কোন খবর নাই। গরীব গৃহস্থ—খবর নেওয়াও

মুস্কিল ছিল। পরে প্রতিবেশীরা দিদিমার দিকে চাহিয়া একটী লোক পাঠাইয়া খবর নেন। তিন বৎসর পর দাদামহাশয় বাড়ী আসেন। তখন জানা গেল মেয়েটীর মৃত্যুসংবাদও তিনি পাইয়াছিলেন—কিন্তু তাহাতে তাঁহার কোন দুঃখ হয় নাই। ইহার কিছুদিন পরেই মা গর্ভে আবির্ভাব হন। কখন কখন মা তাই বলেন, "এই শরীর আবির্ভাব হওয়ার পূর্ব্বেই বাবা গৃহত্যাগ করিয়াছিলেন। কয়েকদিন গেরুয়া বসনও নাকি পরিয়াছিলেন। হরিসংকীর্ত্তনে সময় কাটাইতেন। তাঁর এই বৈরাগ্যভাবের সময়েই এই শরীরের আবির্ভাব হয়।"

শুনিতে পাওয়া যায় যে দাদামহাশয়ের মা কস্‌বার বিখ্যাত কালীবাড়ীতে যাইয়া "বিপিনের একটী যেন ছেলে হয়" এই প্রার্থনা জানাইতে গিয়া প্রার্থনা করিয়া বসিলেন "একটী যেন মেয়ে হয়।" বৃদ্ধার এই প্রার্থনার কিছুদিন পরেই মা আবির্ভাব হন (৮৩ পৃঃ—দ্রষ্টব্য)।

মা'র অসাধারণত্ব ছোট বেলাতেই প্রকাশ পাইয়াছিল। শৈশব হইতে মা খুব হাসিখুসী ছিলেন। তাঁহার স্বাভাবিক শক্তি এখনকার মতনই ছিল। সকলেই মাকে নিয়া আদর করিত। গরীবের ঘরে জন্ম নিলেও মা পিতামাতার যত্নে কষ্ট বড় বোঝেন নাই। মা'র তিনটী ছোট ভাইয়ের মৃত্যুশোকে দিদিমাকে বিশেষ কেহ কাঁদিতে দেখে নাই। কখনও কাঁদিবার উপক্রম করিলে মা এমন চীৎকার করিয়া কাঁদিতে আরম্ভ করিতেন যে, দিদিমা বাধ্য হইয়া নিজে শান্ত হইয়া মাকে শান্ত

করিতেন। মা এইরূপে দিদিমাকে কাঁদিতে দিতেন না। মা'র সব সময় পূর্ণজ্ঞান ছিল মনে হয়। একদিন কথা প্রসঙ্গে দিদিমাকে বলিতেছিলেন, "মা, আমার আবির্ভাবের তেরদিনের দিন শ্রীনন্দন চক্রবর্ত্তী (দিদিমার মামাশ্বশুর) আমাকে দেখিতে আসিয়াছিলেন না?" দিদিমার হয়ত সেই কথা মনেই ছিল না, পরে মা'র কথা শুনিয়া মনে পড়িয়া গেল। ছোটবেলা হইতেই তাঁহার সমাধির মত হইত। বহুদূরে কীর্ত্তন হইতেছে, মা হয়ত ঘরে শুইয়া আছেন—বলিতেছেন, "শরীরের অস্বাভাবিক একটা অবস্থা হইয়া গিয়াছে। কিন্তু ঘর অন্ধকার—বাবা, মা কেহ দেখিতে পায় নাই। আর আমারও কেমন একটা ভাব ভিতরে থাকিত, কেহ যেন না দেখে। তাই বোধ হয় গুপ্তভাবেই থাকিত।" * (দ্রষ্টব্য—পৃঃ ৮২-৮৩)।

---

* এই কথায় কাহারও বাল্যকালের কথা ধরিয়া জিজ্ঞাসা আসে: তখন ত সাধনের ক্রিয়াদি শরীরে আরম্ভ হয় নাই। তবে এই সব ক্রিয়াদি তখন কি করিয়া আসিত? ইহার উত্তরে মা বলিলেন, "এই শরীরটা যেমন বউ, মেয়ে সাজিয়া থাকিল তেমনই এই সব অবস্থাও যখন যে ভাবের ভিতরে শরীরটা থাকিত সেই সময় সেই সেই অবস্থা ঐ খেলার মতই আবার প্রকাশ দেখাইত। কারণ তোমাদের মত চলাফেরাটা এবং ঐ সমাধিও কোন কোন সময় ভাবস্থ থাকা বা সন্ধ্যা যেমন করছে এই ভাবে প্রকাশ পাওয়া, এই শরীরের যে সব এক সমান"। আবার ইহাও শুনিয়াছি কখনও হয়ত কোনও স্থান কাল ও অবস্থার অপেক্ষা রাখিত না—নিজের ভাবে খেয়াল অনুযায়ী নিজেতেই থাকিয়া খেলিতেন।

দুই বৎসর দশমাস বয়সের সময় দিদিমা মাকে কোলে নিয়া প্রতিবেশীর (চন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্যের) বাড়ীতে কীর্ত্তনে গিয়াছেন। মা ঢুলিয়া পড়িতেছেন দেখিয়া তিনি বলিতেছেন, "ঘুমাস কেন? কীর্ত্তন শোন্।" পরে মা দিদিমাকে নিজেই সেই দিনের কথা স্মরণ করাইয়া দিয়াছিলেন, কোন্ বাড়ীতে কীর্ত্তন শুনিতে গিয়াছিলেন তাহাও বলিয়া দিয়াছিলেন। দিদিমারও তখন মনে পড়িয়াছিল। মা বলেন, "এখনও যেমন কীর্ত্তনে অবস্থা হয় তখনও তেমনই হইত। বোধ হয় সময় না হওয়ায় তখন প্রকাশ হয় নাই।"

মার বালিকা বয়সে দিদিমার দিদিশাশুড়ীর সঙ্গে চান্‌লাতে পাগলা শিব দেখিতে যান। তিনি মাকে যেখানে বসাইয়া রাখিয়া গিয়াছিলেন সেখান হইতে মা দেখিতেছেন ঐ শিবটী নিকটস্থ পুকুরের মধ্যে একস্থান হইতে অন্যস্থানে যাইতেছেন। অনবরত এই ভাবেই জলের মধ্যে খেলিতেছেন। মা আরও কিছু দেখিয়াছিলেন। ইহাও প্রবাদ আছে শিবটিকে নাকি সব সময় মন্দিরের মধ্যে পাওয়া যায় না। জাগ্রত শিব।

বালিকা বয়সে যখন দিদিমা মাকে ভাত খাওয়াইতে বসাইতেন, তখন মা অন্যমনস্ক হইয়া পড়িতেন। দিদিমা মাকে ধাক্কা দিয়া মন্দ বলিতেন—"খাইতে বসিয়া খাওয়ার দিকে লক্ষ্য নাই, উপর দিকে চাহিয়া আছে।" মা কিছু বলিতে পারিতেন না। পরে বলিয়াছেন—তিনি দেখিতেন কত কত দেব-দেবীর মূর্ত্তি আসিতেছে ও যাইতেছে (দ্রষ্টব্য—পৃঃ ৩৮)।

"এটা একেবারে সোজা, কিছুই বুদ্ধি-শুদ্ধি নাই।" মা একদিন এক কলসী জল পুকুর হইতে নিয়া কাখে করিয়া বাঁকা হইয়া দাঁড়াইয়া দিদিমাকে বলিতেছিলেন "তোমরা যে সকলে আমাকে সোজা বল, এই ত আমি বাঁকা হইয়াছি" (দ্রষ্টব্য—পৃঃ ৩৮)।

মার লেখাপড়া সামান্যই হইয়াছিল। কিছুদিন স্কুলে পড়িয়াছিলেন। মামা বাড়ীতে বালিকাবিদ্যালয়ের এক পণ্ডিত ছিলেন। মা তথায় গিয়াই স্কুলে প্রথম গেলেন। তিন অ, আ পড়া দিলেন। পরদিনই অ, আ শিখিয়া পড়া দিয়া আবার ক, খ পড়া নিয়া আসিলেন। তার পর দিনই আবার ক, খ সব শিখিয়া ফেলিলেন। ইহা দেখিয়া পণ্ডিত-মশাই আশ্চর্য্য হইলেন। এবং ভাবিলেন বোধহয় পূর্ব্বে নিশ্চয়ই কিছু পড়া ছিল। কিন্তু মার ঐ প্রথম পুস্তক পরিচয় এই ভাবেই সব কেমন করিয়া হইয়া যাইত। অল্প দিনই তথায় ছিলেন। পরে খেওড়া গেলেন। তখন তথাকার স্কুলের মাষ্টার ছিলেন মার এক ঠাকুরদাদা। মা স্কুলে খুব কমই যাইতেন, কারণ স্কুল দূরে ছিল আর ছোট ভাইদের অসুখও কিছুদিন চলিয়াছিল। তিনি পড়িতেন না বটে, কিন্তু মাষ্টারের কাছে পড়া দেওয়ার সময় সব ঠিক ঠিক হইয়া যাইত। একবার বই খুলিয়া একটু দেখিয়াই একটা পদ্য মুখস্থ করিলেন। সে দিন ইন্সপেক্টর আসিয়াছিলেন। তিনিও বই খুলিয়া দেখিয়া ঠিক সেই পদ্যটীই মাকে বলিতে বলিলেন। মা ভালই বলিয়াছিলেন। পড়া ও নামতা আপনা আপনি হইয়া যাইত।

৩

শিক্ষক মহাশয় স্কুলের নামের জন্য মা ও আর তিনজন মেয়েকে ক, খ ক্লাস হইতে নিম্ন প্রাইমারী ক্লাসে তুলিয়া নিলেন। মা প্রায়ই স্কুলে যাইতেন না। অনেক দিন পর স্কুলে গিয়া দেখিলেন মেয়েরা অনেক পড়িয়া গিয়াছে। শিক্ষকটী মাকে ক্লাসের সমান রাখিবার জন্য তাহাদের সঙ্গে সঙ্গে তাহারা যেখানে পড়িতেছে মাকেও সেই পড়া দিয়া দিলেন। তাঁহার পড়া বেশ ঠিক ভাবে হইয়া গেল।

দাদামশাই একদিন বলিয়া দিয়াছিলেন—যেখানে কমা বা দাঁড়ি আছে পড়িবার সময় সেখানে গিয়া থামিতে হয়। দাদামশাইয়ের আদেশ—তাই মা এক নিঃশ্বাসে পড়িতে থাকিতেন। যদি মধ্যস্থানে শ্বাস একটু পড়িয়া যাইত, মা আবার প্রথম হইতে আরম্ভ করিতেন। এক নিঃশ্বাসে পড়িয়া অতিকষ্টে শরীর বাঁকাইয়া দাঁড়ির কাছে গিয়া নিঃশ্বাস ফেলিতেন। যখন দুঃখের ভাব দেখাইতে হইত শরীর দিয়া ঐ ভাব প্রকাশ পাইত। যখন লজ্জা দেখাইতে হইত শরীর দিয়া লজ্জার ভাবই প্রকাশ পাইত।

বাল্যকালে হিন্দু-মুসলমান সকলেই মাকে খুব স্নেহ করিত। মুসলমানরা মাকে সর্ব্বদা কোলে করিত। মাকে মাটিতে ছাড়িয়া দেওয়া হইলে তাহারা কোলে উঠাইয়া লইত। দিদিমা বলিতেন—'মুখে ভাত' (অন্নপ্রাশন) না হওয়া পর্য্যন্ত মুসলমান ছুঁইলে দোষ নাই। ভাত খাওয়ার পর ছুঁইলে স্নান করিতে হয়।

খেওড়াতে অবস্থানকালে মার একটী বাল্যজীবনের ঘটনা এখানে উল্লেখ করিলাম। মা তখন খুব ছোট, একদিন দেখিলেন, একটী গাছে একটী মাত্র আম গাছের মাথায় পাকিয়াছে। তখন বৈশাখ মাস, গাছের আম বিশেষ পাকে নাই। কি পূজা ছিল, সকলে পয়সা দিয়া পাকা আম কিনিয়া পূজা করিবে। মা দিদিমাকে বলিলেন, "মা, তুমি পূজায় আম দিবে না ?" দিদিমা বলিলেন, "পয়সা কোথায় পাব ? আর গাছের আমও ত' পাকে নাই। কি করিয়া পূজায় আম দিব ?" এই কথা শুনিয়াই মা দৌড়াইয়া সেই আমগাছের নীচে গিয়া দেখেন ঠিক সেই আমটী মাটিতে পড়িয়া আছে। তিনি আনিয়া উহা মাকে দিলেন। এই প্রসঙ্গে মা বলিয়াছেন, "আমার উপর খুব শাসন ছিল যে, পরের জিনিষে যেন হাত না দেই। আমাকে হঠাৎ এই পাকা আম আনিতে দেখিয়া মা আমাকে শাসন করিতে লাগিলেন—"তুই অপর কাহারও বাড়ী হইতে আম নিয়া আসিয়াছিস, আমাদের গাছে ত' আম পাকে নাই।" আমি মাকে বলিলাম, 'না মা, আমি কাহারও বাড়ী হইতে আনি নাই। এই স্থানে পাইয়াছি। তুমি আসিয়া দেখিয়া যাও।"

(২)
বিবাহ ও উত্তরকাল
(১৩১৫—১৩২৪)

১৩১৫ সালের ২৫শে মাঘ বার বৎসর দশ মাস বয়সের সময় ঢাকা-বিক্রমপুরের অন্তর্গত আটপাড়া গ্রামনিবাসী, ডিংশাই

শ্রোত্রিয় ৺জগবন্ধু চক্রবর্ত্তী ও ত্রিপুরাসুন্দরী দেবীর পুত্রের সহিত শ্রীশ্রীআনন্দময়ীর শুভ বিবাহ-ক্রিয়া সম্পন্ন হয়। বরের নাম রমণীমোহন চক্রবর্ত্তী, কিন্তু পরবর্ত্তীকালে ঢাকায় যাওয়ার পর হইতে ভক্তগণ তাঁহাকে ভোলানাথ বলিয়া ডাকিতেন এবং ঐ নামেই তিনি সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধি লাভ করেন। এই জন্য এখানে আমরা ভোলানাথ নামই ব্যবহার করিলাম।

ঐ সময়ে ভোলানাথের মা বর্ত্তমান ছিলেন না, কিন্তু পিতা জীবিত ছিলেন। বিবাহের তুই বৎসর পরে পিতার মৃত্যু হয়। তাঁহার তুইটী বড় ভাই ছিলেন—নাম রেবতীমোহন ও সুরেন্দ্র-মোহন। তাঁহার ছোট ভাইও তুইটী,—একটীর নাম কামিনী-কুমার ও অপরটীর নাম যামিনীকুমার। ভগিনী পাঁচটী ছিলেন। বিবাহের পর ভোলানাথ মাকে তুই একখানা বই আনিয়া দিয়াছিলেন, কিন্তু যুক্তাক্ষর, লাইন ও ছন্দ ধরিয়া পড়া মার মহা মুস্কিল—তাই বই পড়া আর হইল না।

বিবাহের সময় ভোলানাথ পুলিশ বিভাগে কার্য্য করিতেন। বিবাহের কিছু পরেই অর্থাৎ ১৩১৬ সালের ভাদ্রমাসে তাঁহার চাকুরী যায়। এই সময় হইতে কয়েক বৎসর পর্য্যন্ত তিনি নিরালম্ব অবস্থায় ছিলেন। মা বিবাহের পর হইতে চার বৎসর কাল বড় ভাসুর রেবতীবাবুর নিকট ছিলেন। ইনি শ্রীপুর, নরুন্দী প্রভৃতি স্থানে (ঢাকা—জগন্নাথগঞ্জ লাইনে) রেলওয়ে বিভাগে ষ্টেশনমাষ্টারের কার্য্য করিতেন। ইতিমধ্যে ১৩১৮ সালে মার পিতৃদেব মাতুলালয় খেওড়া গ্রাম ত্যাগ করিয়া স্বস্থানে বিদ্যাকূট-

গ্রামে আসিয়া বাস করিতে আরম্ভ করেন। মার ছোট ভাই মাখন প্রায় এই সময়েই জন্মগ্রহণ করে।

ভাস্থরের কাছে থাকিবার সময় মা নিজ হাতে সমস্ত গৃহ-কার্য্য সম্পন্ন করিতেন ও যথাশক্তি ভাস্থরের সেবা-শুশ্রূষা করিতেন। ভাস্থরও তাঁহাকে খুব স্নেহ করিতেন। তিনি তখন খুব লজ্জাশীলা ছিলেন, কুলবধূর পালনীয় সকল নিয়ম ও আচার পালন করিতেন। ঐ সময়েও মাঝে মাঝে মার ভাবের আবেশ হইত, তবে প্রকাশ ছিল না বলিয়া লোকে বুঝিতে পারিত না। কখনও কখনও পাক করিতে যাইয়া ঐরূপ অবস্থার উদয় হইত—লোকে মনে করিত বউ বড় ঘুমায়। হয়ত ডাল-ভাত ধরিয়া যাইত, বড় জা আসিয়া মন্দ বলিতেন। তখন মা মহা লজ্জিতা হইয়া বসিতেন ও আবার সব ঠিক করিয়া রান্না করিতেন। প্রকৃতি খুব শান্ত ছিল বলিয়া সকলেই তাঁহাকে ভালবাসিতেন।*

ভাস্থরের মৃত্যুর পর মা আটপাড়ার বাড়ীতে আসিয়া বড় জায়ের কাছে ছয় মাস ছিলেন। তারপর ছয় মাস পিত্রালয় বিদ্যাকূটে ছিলেন। মা আটপাড়ায় থাকার সময় ভোলানাথ অষ্টগ্রামে ঢাকা নবাব ষ্টেটের অধীনে সেটলমেণ্ট বিভাগে

* মার বড় জা ও ননদের মুখেও আমরা এ সব কথা শুনিয়াছি। পরে মার সঙ্গে সঙ্গে আমরা আটপাড়া, বাজিতপুর প্রভৃতি স্থানে গিয়া সেখানকার লোকদের মুখেও সব কথা শুনিয়াছি। মার পূর্ব্বলীলার সব স্থান দেখিয়া আসিয়াছি।

চাকুরী লাভ করেন। তারপর মা অষ্টগ্রামে আসেন। এই স্থানে তিনি এক বৎসর চার মাস কাল ছিলেন।

অষ্টগ্রামে জয়শঙ্কর সেন মহাশয়ের স্ত্রী মাকে "খুসীর মা" বলিয়া ডাকিতেন। তাঁহার পুত্র সারদাশঙ্কর মাকে ভাগবত শুনাইতে তথায় গিয়াছিলেন। সেন মহাশয়ের শ্যালক হরকুমার রায়ের সম্বন্ধে দুই একটী কথা এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য মনে হইতেছে। মা অষ্টগ্রাম যাওয়ার কিছুদিন পূর্ব্বে এই গ্রামেই হরকুমারের মাতৃবিয়োগ হইয়াছিল। তাঁহার মা যে ঘরে থাকিতেন, ঘটনাচক্রে মাও সেই ঘরে থাকিতেন। এই সূত্রে হরকুমার মাকে "মা" বলিয়া সম্বোধন করিতে লাগিলেন। ইহাই মাকে সর্ব্ব প্রথম "মা" বলিয়া সম্বোধন। তখন মার বয়স ১৭।১৮ বৎসর হইবে। মাঝে মাঝে হরকুমারের মস্তিষ্ক বিকৃতি লক্ষিত হইত। মাথা ভাল থাকিলে তিনি কাজকর্ম্ম বেশ করিতেন। ইনি একেবারে অশিক্ষিত ছিলেন না, চাকুরীও ভালই করিতেন। তবে ধর্ম্মের ভাবে অনেক সময়ে পাগল হইয়া যাইতেন বলিয়া চাকুরী বেশীদিন টিকিল না। তিনি অষ্ট-গ্রামে ভগিনীর বাড়ীতে থাকিতেন। মার যাহাতে কোন প্রকার অসুবিধা না হয়, সে বিষয় তাঁহার বিশেষ লক্ষ্য ছিল। মা তাঁহার সহিত কথা বলিতেন না, তাঁহার সম্মুখে ঘোমটা দিতেন, কিন্তু তিনি প্রত্যহ মার বাজার করিয়া দিতেন। অনেক সময় ভিজা বা কাঁচা কাঠে রাঁধিতে মার কষ্ট হইতেছে দেখিলেই তিনি যে কোন স্থান হইতে শুক্‌না কাঠ আনিয়া মাকে দিতেন ও

বলিতেন—"নে বেটী,—এই লাকড়ী নিয়া পাক কর।" মাকে কথা বলিবার জন্য তিনি বিশেষ পীড়াপীড়ি করিতেন, কিন্তু মা কথা বলিতেন না। অনেক দিন পরে ভোলানাথের আদেশে মা তাঁহার সঙ্গে কথা বলিয়াছিলেন। মাকে এতটা যত্ন করা প্রতিবাসীরা পছন্দ করিতেন না। কিন্তু তাহাতে তাঁহার ভ্রূক্ষেপ ছিল না। প্রতিদিন সকাল সন্ধ্যায় মাকে প্রণাম করা তাঁহার দৈনন্দিন কার্য্য ছিল। মা খাইতে বসিলে তিনি প্রসাদের জন্য হাত পাতিয়া বসিয়া থাকিতেন। মা তাঁহাকে প্রসাদ ত' দিতেনই না, তাঁহার সম্মুখে খাইবেন না বলিয়া হাত তুলিয়া বসিয়া থাকিতেন। কয়েকদিন এ ভাবে নিরাশ হইয়া তিনি ভোলানাথকে যাইয়া বলিলেন—"দেখ, বেটীকে এত করিয়া বলি, বেটী প্রসাদ দেয় না।" মাও ভোলানাথকে সব কথা বলিলেন। সব শুনিয়া ও হরকুমারের ভাব দেখিয়া ভোলানাথ মাকে বলিলেন, "ওর যখন এতটা আগ্রহ, তুমি একটু কিছু খাওয়ার সময় দিয়া দিও।" ভোলানাথের আদেশে মা তখন সবই করিতেন। একদিন প্রসাদ দেওয়ার পর দেখা গেল প্রত্যহই মার খাওয়ার সময় হরকুমার আসিয়া হাজির হইতেন; একদিনও ইহার অন্যথা হইত না। মধ্যে মধ্যে মাকে বলিতেন—"বেটী, তুই যে কি কেহ বুঝিল না।" মাকে যখন অনেক অনুরোধেও তাঁহার সহিত কথা বলাইতে পারিতেছিলেন না তখন একদিন তিনি ভয়ানক ভাবে বলিতে লাগিলেন—"বেটী, তুই এত বড় পাষাণী। আমি

এই এক বৎসর যাবৎ তোকে কথা বলিবার জন্য বলিতেছি, তুই আমার সঙ্গে কথা বলিতেছিস্ না। আমি যদি পাষাণের কাছে গিয়া এ ভাবে মা বলিয়া ডাকিতাম, পাষাণেও আমি প্রাণ-সঞ্চার করিতে পারিতাম। ছেলের কাছে মায়ের লজ্জা—এ আবার কি কথা ?" আর একদিন তিনি বলিয়াছিলেন, "বেটী তুই দেখ্‌বি—আমি তোকে মা বলিয়া ডাকিলাম, একদিন জগৎ তোকে মা বলিয়া ডাকিবে।" হরকুমারের এই ভবিষ্যদ্বাণী সত্য হইয়াছে। কিন্তু হরকুমার আজ কোথায় ? মা তাঁহার সহিত কথা বলার কিছুদিন পরই হরকুমার একটা চাকুরী পাইয়া অন্যত্র চলিয়া যান।*

এই হরকুমারই মার পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন তুলসী তলাটী দেখিয়া সর্ব্বপ্রথম কীর্ত্তনের বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন। মাঝে

* ই·ার পর আর হরকুমারের সহিত অনেক দিন দেখা হয় নাই। একদিন বর্ষাকালে বাজিতপুরে ঘরে বসিয়া মা হঠাৎ ভোলানাথকে বলিয়া উঠিলেন—"দেখ, হরকুমারের গান শুনিতেছি।" ভোলানাথ এ কথা বিশ্বাসযোগ্য নহে বলিয়া বুঝাইয়া দিলেন, কিন্তু দেখা গেল কিছুক্ষণ পরেই অষ্টগ্রামের ক্ষেত্রবাবু নামক এক ভদ্রলোকের সহিত হরকুমার নৌকা করিয়া আসিয়া মার কাছে উপস্থিত হইলেন। তখন তাঁহার মাথা ভাল ছিল না। ক্ষেত্রবাবু বলিলেন, "হরকুমার মাকে একবার দেখিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া আমার সঙ্গে আসিয়াছে।" সেই শেষ দেখা। উহার পর হরকুমারের আর কোন খবর পাওয়া যায় নাই। হরকুমার মাকে কয়েকখানা চিঠি লিখিয়াছিলেন। চিঠির প্রথমেই তিনি মাকে "দেবী" বলিয়া সম্বোধন করিয়া লিখিতেন।

মাঝে সেখানে কীর্ত্তন হইত। অষ্টগ্রামে থাকা কালে গগন রায়ের কীর্ত্তনের সময় মার বাহিরে ভাবের আবির্ভাব-জনিত বিকারাদি প্রথম লক্ষিত হইয়াছিল। যখন প্রথম ভাবের প্রকাশ হইতে লাগিল, তখন মার বয়স ১৭।১৮ বৎসর।

একবার নিকটবর্ত্তী কোন এক ব্রাহ্মণীবাড়ী যাওয়ার সময় এই অষ্টগ্রামেই মাকে একজন একখানা শাড়ী পরাইয়া দিয়াছিল। তাহাতে মার রূপ হঠাৎ দেখিয়া অষ্টগ্রামের ক্ষেত্রবাবু মাকে 'দেবী' বলিয়া সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিয়াছিলেন। অষ্টগ্রামে থাকিতে দুইদিন কীর্ত্তনে মার ভাব হইয়াছিল এবং সকলেই তাহা জানিত ও দেখিতে আসিয়াছিল। এখানে প্রথম প্রথম মা কিছুদিন বেশ ভাল ছিলেন। তাহার পর কিছুদিনের জন্য অসুস্থ হন। পরে ভাল হইয়া যান। ভাল হইয়া কিছুদিন পর বিদ্যাকূটে যান ও সেখানে প্রায় দুই বৎসর আটমাস কাল থাকেন। অষ্টগ্রাম ও বিদ্যাকূট উভয় স্থানে অবস্থানকাল প্রায় চারি বৎসর। ভোলানাথ তখনও অষ্টগ্রামেই ছিলেন।

(৩)

বাজিতপুরে—(১৩২৪—১৩৩০)

ভোলানাথ ১৩২৪ সালের মাঘ মাসের কাছাকাছি অষ্টগ্রাম হইতে বাজিতপুরে বদলী হন। মা বিদ্যাকূট হইতে আটপাড়া যান। আটপাড়া হইতে বাজিতপুর যান। ভোলানাথ তখন সেটলমেণ্টে কাজ করিতেন। ঐ সময় ঢাকা নবাব বাগানের ট্রাষ্টী রায়বাহাদুর যোগেশচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের ছোট জামাতা শ্রীযুক্ত

ভূদেবচন্দ্র বসু মহাশয় বাজিতপুরের নবাব ষ্টেটের Assistant Superintendent হইয়া আসেন ও ১৩২৮ সাল পর্য্যন্ত থাকেন। তিনি ভোলানাথকে ঐ ষ্টেটের ল ক্লার্কের পদে নিযুক্ত করেন। এই ভূদেববাবুর স্ত্রীর সঙ্গে মার খুব ভালবাসা হইয়াছিল—মা ভূদেববাবুর ছেলেদের খুব আদর যত্ন করিতেন।

পূর্ব্বের ন্যায় কীর্ত্তনে ভাব তখনও হইত। একবার ভূদেববাবুর মেয়ের অসুখের সময় বাড়ীতে কীর্ত্তন দেওয়া হইয়াছিল—মা অসুস্থ মেয়ের কাছে বসিয়াছিলেন। বাহিরে কীর্ত্তন হইতেছিল, মা ভূদেববাবুর স্ত্রীকে ইসারায় ডাকিয়া বলিলেন, তাঁহার শরীর যেন কেমন করিতেছে। ভূদেববাবুর স্ত্রী তাঁহার মাথায় জল ও বাতাস দেন ও ভূদেববাবুকে খবর পাঠান। মা বাসায় যাইতে চাহিলে তাঁহাকে ধরিয়া বাসায় নিয়া যাওয়া হয়। ভূদেববাবু এই কথা অন্যত্র গোপন রাখিতে বলিলেন। কীর্ত্তন শুনিলেই মার শরীর অসুস্থ হয় শুনিয়া ভূদেববাবু কিছু অসন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। তখন তিনি উহা হিষ্টীরিয়া বলিয়া ধারণা করিয়াছিলেন।

ভূদেববাবু বাজিতপুর ছাড়িয়া যাইবার কিছুদিন পর হইতেই মার জীবনের বৈশিষ্ট্য লোকসমক্ষে কিছু কিছু প্রকাশিত হইতে আরম্ভ হয়। পূর্ব্বে যে ভাবের কথা বলা হইয়াছে তাহা ক্রমশঃ খুব গাঢ় ও ব্যাপক হইয়া পড়ে। ইহার পূর্ব্বে সর্ব্বসাধারণে উহা তত জানিত না। মার এখানকার জীবনের ধারা বড়ই বিচিত্র ছিল। প্রত্যহ নিয়মিতরূপে তাঁহার সাধনের

ক্রিয়া হইয়া যাইত। তিনি দিনে সংসারের যাবতীয় কর্ত্তব্য কর্ম্ম সম্পাদন করিতেন—পতিসেবা, রন্ধন, বাসনমাজা, ঘরঝাড় দেওয়া হইতে আরম্ভ করিয়া মধ্যবিত্ত গৃহস্থের সমুদয় কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন করিতেন। রাত্রিতে যখন ভোলানাথ বিশ্রাম করিতেন তখন তিনি শোয়ার ঘরেরই এক কোণে মাটিতে বসিয়া থাকিতেন। ঐ সময় তাঁহার শরীরে নানা প্রকার ক্রিয়া হইত, যাহা সাধারণের দৃষ্টিতে 'আশ্চর্য্যজনক। নানা রকম আসন, মুদ্রা, পূজা ইত্যাদি আপনিই হইয়া যাইত। ঐ সময় দেহ হইতে একটা তীব্র জ্যোতিঃ প্রকাশিত হইত, সেজন্য অনেক সময় তিনি কাপড় মুড়ি দিয়া থাকিতেন। ভোলানাথ চৌকীর উপর শুইয়া থাকিতেন। কখন দেখিতে দেখিতে ঘুমাইয়া পড়িতেন। কখনও বা বসিয়া বসিয়া দেখিতেন। মার বসা অবস্থায় ঐ সব ক্রিয়াদি হইত।* মা জ্যোতির্ম্ময়ী পবিত্রতার মূর্ত্তি। যে ঘরে এই সব ক্রিয়াদি হইত সেই ঘরের বাহিরের চারিদিক প্রায় দুই হাত পর্য্যন্ত স্থান প্রত্যহ তিনি পরিষ্কার করিয়া রাখিতেন—একগাছা কাঠির সঙ্গেও ঘর ছোঁয়া থাকিত না। ধূপতি নিয়া চারিদিক ঘুরিয়া আসিতেন। (দ্রষ্টব্য—পৃঃ ৩৭) এই সময় মা গুপ্ত ছিলেন, বিশেষ কেহ জানিতে পাইত না। তবে কোন জিনিষই একেবারে গোপন থাকে না। মার এই সব অদ্ভুত অদ্ভুত

---

* যে স্থানে বসিয়া মার এই সব আসনাদি হইত—সেখানকার মাটী আনিয়া পরে রমনার আশ্রমে পঞ্চবটীর বেদীর মধ্যস্থানে রাখা হয়।

শারীরিক ক্রিয়াদি বাজিতপুরে কেহ কেহ বেড়ার ফাঁক দিয়া দেখিয়াছিল। তবে কেহই তাহার তত্ত্ব বুঝিতে পারিত না। অনেকেরই বিশ্বাস ছিল ইহা ভৌতিক ব্যাপার—কেহ কেহ মনে করিত ইহা এক প্রকার রোগ ইত্যাদি। সকলেই নিজ নিজ বিশ্বাস অনুসারে ভোলানাথকে ভাল ওঝা বা চিকিৎসক দেখাইবার জন্য উপদেশ দিত।

ভোলানাথ বাধ্য হইয়া দুই একজন ওঝাকে দেখাইয়াছিলেন, কিন্তু মার ভাব দেখিয়া তাহারা 'মা' 'মা' বলিয়া নমস্কার করিয়া বিদায় নিয়াছিল। একবার একজন ওঝা রাত্রিতে মাকে দেখিতে আসে ও মার ঘরের এক কোণে আসন করিয়া বসে। মা সেই ঘরের আর এক কোণে বসিয়াছিলেন। ওঝাটী বহুক্ষণ নানাপ্রকার ক্রিয়া করিয়া একটু বাহিরে যায়। পরে ভিতরে আসিয়া তামাক ভরিয়া যেই হুঁকাটী ভোলানাথের হাতে দিতে যাইবে অমনি সে কাঁপিয়া প্রায় পড়িয়া যাইবার উপক্রম হইল। ভোলানাথ তাহাকে ধরিয়া ফেলিলেন। তথাপি সেই লোকটী মাটীতে পড়িয়া গোঁ গোঁ শব্দ করিতে লাগিল। পরে 'মা' 'মা' রবে কাতর ভাব প্রকাশ করিল। ভোলানাথ মাকে বলিলেন, "যাতে লোকটী স্থির হয় তাহা কর।" মার একটা অস্বাভাবিক ভাব প্রকাশ হইল—এদিকে লোকটী ধীরে ধীরে স্থির হইল। সে ক্রমশঃ সুস্থ হইয়া মাকে প্রণাম করিয়া চলিয়া গেল। যাওয়ার সময় বলিয়া গেল, "এ সব আমাদের কাজ নয়। ইনি সাক্ষাৎ দেবী ভগবতী।"

কালীকচ্ছের ডাক্তার মহেন্দ্র নন্দী মহাশয় একজন ভাল লোক। তিনি একবার মাকে দেখিয়া ভোলানাথকে বলিয়াছিলেন, "এ সব খুব উচ্চ অবস্থা, ব্যারাম নয়। আপনি যাকে তাকে দেখাবেন না।" তাই ভোলানাথ পরে আর বড় কাহাকেও দেখাইতেন না।

১৩২৯ সালের বৈশাখ মাস হইতেই মার ভাবের বিশেষ পরিবর্ত্তন আরম্ভ হয়। তিন মাস পরে অর্থাৎ ১৩২৯ সালের শ্রাবণ মাসে ঝুলন-পূর্ণিমার দিন মার দীক্ষাদি আপনা আপনি হইয়া যায়। দীক্ষার পর পাঁচ মাস পর্য্যন্ত আসন, প্রাণায়াম, মুদ্রা প্রভৃতি যোগক্রিয়া মার শরীরে বিশেষভাবে হইতে থাকে। অবশ্য ইহার পূর্ব্ব হইতেই আসন, প্রাণায়াম, মুদ্রাদি হইতে আরম্ভ হইয়াছিল, কিন্তু স্তোত্রাদি দীক্ষা হইবার পর হইতেই আরম্ভ হয়। মন্ত্র ও স্তোত্রাদি বাহির হইবার পূর্ব্বে "ওঁ" "ওঁ" বাহির হইয়াছিল। একদিন রাত্রিতে রোজকার মতন মা আসন অবস্থায় উপুড় হইয়া মাটিতে প্রণামের ভাবে ছিলেন, ভোলানাথ দেখিতে দেখিতে ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলেন। ভোলানাথ উঠিয়া যখন বসিলেন তখন দেখিলেন মার আঙ্গুলগুলি জপ করার নিয়মে ঘুরিতেছে—জপ হইতেছিল। মা ঠাকুরমাকে এই ভাবে জপ করিতে দেখিয়াছিলেন—এখন দেখিলেন তাঁহার আঙ্গুল গুলিও সেই ভাবে জপের সংখ্যা রাখিতেছে।

বাজিতপুরে এইরূপে ভাবের বিকাশ হওয়ার পূর্ব্বে মাকে সকলেই ভালবাসিত, সকলেই তাঁর কাছে আসিত। কিন্তু এই

অবস্থা আরম্ভ হওয়ার পর সকলে 'মাকে ভূতে পাইয়াছে' মনে করিয়া তাঁহার নিকট আসা বন্ধ করিল। মাও একান্ত পাইয়া আপন মনে বসিয়া থাকিতেন (দ্রষ্টব্য—পৃঃ ৩৭—৩৮)।

মা একদিন রাত্রিতে বিছানায় বসিয়া আছেন—ভোলানাথ পাশে শুইয়া আছেন। মা দেখিলেন তাঁহার শরীর যেন ফুলিয়া মোটা হইয়াছে আর মনে হইল গায়ে যেন অসাধারণ শক্তি। এই অবস্থায় তাঁহার হাতখানা ভোলানাথের গায়ে পড়ে। ভোলানাথ চমকিয়া জাগিয়া উঠেন ও অন্ধকারে পুরুষের হাত বলিয়া চোর বলিয়া মনে করেন। শুধু ভোলানাথ এ সব জানিতেন—মা তাহাকে এ সব অন্যত্র প্রকাশ করিতে মানা করেন ও নিশ্চিন্ত থাকিতে বলেন।

নিশিকান্ত ভট্টাচার্য্য নামে মার একজন মামাত ভাই কিছুদিন মার কাছে ছিলেন। এইসব আসনাদি ও অলৌকিক ক্রিয়াদির প্রতি উদাসীনতার জন্য তিনি ভোলানাথকে মন্দ বলিতেন। একদিন তিনি ভর্ৎসনা করিতেছিলেন, মা তখন আসন করিয়া নিজের ঘরে বসিয়া ছিলেন।* ঐ সময় মার ভাবটা অস্বাভাবিক ছিল—মাথায় কাপড় ছিল না, শরীর প্রায় খোলা ছিল। মা বলিয়াছেন "আমি বেশ বুঝিতেছিলাম যে, মাথায় এবং গায়ে কাপড় নাই, কিন্তু কাপড় ঠিক করিয়া দিবার মত লজ্জার ভাব ছিল না।" মা নিশিকান্তবাবুর চোখের দিকে

---

*দীক্ষার পর হইতে নিয়মিতভাবে আসন ও পূজাদি হইয়া যাইত—পূজাদির সমাপ্তি না হওয়া পর্য্যন্ত তিনি জলগ্রহণ করিতেন না।

তীব্রভাবে চাহিয়া কি বলিয়া উঠিলেন। তিনি ভয়ে দুই তিন হাত পিছাইয়া গেলেন। তখনি মা আবার হাসিয়া বলিলেন, "ভয় কি?" তখন তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি কে?" মা তখন নিজের পরিচয় দিলেন। তিনি পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি যে এই সব ক্রিয়াদি করেন, আপনার কি দীক্ষা হইয়াছে?"

মা—হাঁ, হইয়াছে।

নিশিবাবু—রমণীবাবুর হইয়াছে?

মা—না, পাঁচ মাস পরে আগামী ১৫ই অগ্রহায়ণ অমুক বার, অমুক তিথি, অমুক নক্ষত্রে হইবে।

নিশিবাবু—নক্ষত্রটা বুঝিতে পারা গেল না।

মা—ঐ পুকুরে জানকীবাবু মাছ ধরিতেছে, তাহাকে ডাকিয়া লইয়া আস, সে বুঝিবে।

জানকীবাবু নবাব ষ্টেটে কার্য্য করিতেন। মার বাড়ীর পাশেই তাঁহার বাসা ছিল। তাঁর স্ত্রী ঊষার সঙ্গে মার খুব ভাব ছিল। মা তাহাকে ঊষা দিদি বলিয়া ডাকিতেন। জানকী-বাবু যে মাছ ধরিতেছিলেন তাহা মার জানিবার (বাহিরের দিক হইতে) উপায় ছিল না, বিশেষতঃ তখন তাঁহার ত কাছারী যাইবার সময়। তাঁহাকে ডাকা হইল। তিনি আসিলেন। তাঁহার সম্মুখে মা এতদিন বাহির হন নাই, কিন্তু আজ আর সঙ্কোচ নাই—মাথায় কাপড় নাই, আলু-থালু বেশ,—ঘরের ভিতর বসিয়া আছেন। এই অবস্থায় কেহ মাকে ছুঁইতে সাহস পাইত

না। নক্ষত্রের কথা জানকীবাবু বুঝিলেন। জানকীবাবুর প্রশ্নের উত্তরে মা আপন পরিচয় দিয়াছিলেন—যাহা অন্যত্র প্রকাশ করা হইল। এই সব কথায় ঐ দিন তাঁহার আফিস যাওয়া হইল না, প্রায় সন্ধ্যা পর্য্যন্ত এই ব্যাপার চলিয়াছিল।

এদিকে ভোলানাথ সব বিবরণ শুনিলেন। তিনি স্থির করিলেন—যাহাতে ঐ তারিখে ও তিথিতে মন্ত্রগ্রহণ না হয় তাহার চেষ্টা করিবেন। তিনি রোজ কাছারীতে যাওয়ার সময় জলখাবার খাইয়া যাইতেন—কিন্তু সে দিন আবদ্ধ হইবার আশঙ্কায় না খাইয়াই গেলেন। নির্দ্দিষ্ট সময়ে মা তাঁহাকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। তিনি আসিবেন না বলিয়া খবর পাঠাইলেন। মা খবর দিলেন, তিনি না আসিলে বাধ্য হইয়া তাঁহাকেই কাছারীতে যাইতে হইবে। ইহা শুনিয়া ভোলানাথ আপনিই চলিয়া আসিলেন। কারণ তিনি মার প্রকৃতি ভালরূপেই বুঝিতেন। তিনি জানিতেন মার পক্ষে কিছুই অসম্ভব নয়। বাড়ী আসিয়া দেখিলেন, মা পায়চারী করিতেছেন ও তাঁহার মুখ দিয়া মন্ত্রাদি বাহির হইতেছে। মা তাঁহার পরিধেয় বস্ত্র আনিয়া দিলেন ও তাঁহাকে স্নান করিয়া আসিতে বলিলেন। ভোলানাথ স্নান করিয়া আসিলে মা তাঁহাকে স্থিরভাবে এক আসনে বসিতে বলিলেন। ভোলানাথ সেইভাবে বসিবার পর মার মুখ হইতে একটী বীজ বাহির হইল—মা ভোলানাথকে তাহাই জপ করিতে বলিলেন

ও বৃথা মাংসাদি খাইতে নিষেধ করিয়া শুদ্ধভাবে থাকিতে বলিলেন। ভোলানাথ তাহাই করিতে লাগিলেন।

১৩২৯ সালের পৌষ মাস হইতে (সম্ভবতঃ ১৩ই পৌষ হইতে) মার 'মৌন' আরম্ভ হয় এবং প্রায় তিন বৎসরকাল ছিল। ঐ সময় কখনও কখনও কুণ্ডলী দেওয়া হইয়া যাইত। এইভাবে কুণ্ডলী হইয়া গেলে মার মুখ দিয়া স্তোত্রাদি ও মন্ত্রাদি নানা শব্দ বাহির হইত তারপর মা কথা বলিতে পারিতেন। কিন্তু কুণ্ডলী দিবার কোন সময় অসময় ছিল না। এই সময়ে অন্য বাড়ী যাওয়া বন্ধ ছিল।

বাজিতপুরের কালীপূজার ব্যাপার উল্লেখযোগ্য। এই পূজা ভোলানাথের পৈতৃক পূজা। ইহা প্রতি বৎসরেই নিয়মিতভাবে হইত।* একবার এই পূজার ভোগের জন্যে খুব শুদ্ধভাবে চাউল করা হইয়াছিল, কিন্তু কাকে মুখ দেওয়ায় তাহা নষ্ট হইয়া যায়। পরে আবার চাউল করা হয়—উহাতেই ভোগ রান্না হয়। মা নিজে রান্না করিতে পারেন নাই, অন্য

---

* কালীপূজার পরদিন ভোলানাথ প্রায় সব পরিচিত ভদ্রলোকদের ডাকিয়া আনিয়া খাওয়াইতে বসাইতেন। লোককে খাওয়াইতে তাঁহার খুব আনন্দ। তাই যাহাকে দেখিতেন ডাকিয়া আনিয়া প্রসাদ নিতে বসাইয়া দিতেন। এই ভাবে অনেক লোক প্রসাদ পাইত। কিন্তু প্রথম হইতে সে রকম কোন বন্দোবস্ত হইত না। প্রতি বৎসরেই এইরূপ চলিত। যাহা রান্না হইত তাহা দিয়াই সকলের কুলাইয়া যাইত। লোকের কোন হিসাব থাকিত না। কিন্তু কখনও জিনিষ কম পড়িত না।

৪

একজন করিয়াছিলেন। মা রান্না ঘরের দরজায় বসিয়াছিলেন। আর সকলেই পূজার কাছে ছিল। পূজার পর ভোগ নেওয়া হইবে, তাই মা ভোগের রান্নাঘরের দরজায় বসিয়াছিলেন, যেন ভোগ নষ্ট না হয়। পরিষ্কার দেখিলেন—একটী শুভ্রবর্ণ ব্রাহ্মণ মার ডান অঙ্গ হইতে প্রকাশিত হইয়া গিয়া ঘরে ঢুকিলেন এবং যে পাথরে ভোগ সাজান ছিল, তাহা হইতে একটু তুলিয়া মুখে দিলেন। তারপর অদৃশ্য হইয়া গেলেন, মা পরিষ্কার বসিয়া বসিয়া দেখিতেছিলেন। পরে যখন ভোগ লইয়া যাইতে ভোলানাথ আসিলেন—তুই তিনজন লোক সঙ্গে সঙ্গে চলিল ভোগ যেন নষ্ট না হয়। ভোলানাথ ভোগ লইয়া চলিলেন, হঠাৎ কোথা হইতে কুকুর আসিয়া ভোগ ছুঁইয়া দিল। তখনই ভোগ পুকুর পাড়ে ফেলিয়া ভোলানাথ স্নান করিয়া আসিলেন। শেষ রাত্রে চাউল কিনিয়া আনা চলিবে না, সময় নাই, তাই ভোলানাথ মাকে বলিলেন—"মার ইচ্ছা, ঐ কাকের মুখের যে চাউল ঘরে আছে তাহাই ভোগের জন্য শীঘ্র বাহির করিয়া দাও।" অগত্যা তাহাই হইল। ডাল তরকারি সব ছিল—ঐ চাউল দিয়া তাড়াতাড়ি ভাত পাক করিয়া পুনরায় ভোগ দেওয়া হইল। মা ভোলানাথকে যাহা যাহা দেখিয়াছিলেন সব বলিলেন, ভোলানাথ পুরোহিতকে বলিলেন। পুরোহিত ঠাকুর খাইতে বসিয়া এ সব শুনিয়া বলিলেন—"সেই প্রসাদই আসল প্রসাদ, কারণ উহা ভৈরব-গৃহীত বলিয়া মহাপ্রসাদ, আমাকে একটু আনিয়া দাও।" কিন্তু তাহা সব

জলে দেওয়া হইয়াছিল। এই সময় ভূদেববাবু বাজিতপুরে ছিলেন—তাঁহার বাসা বড় বলিয়া তাঁহার বাসাতেই পূজা হইয়াছিল। তুই বাসা এক জায়গাতেই ছিল।

বাজিতপুরে ভূদেববাবু যে কাজে ছিলেন, তাঁহার পূর্ব্বে সেই কাজে শ্রীযুক্ত রাসবিহারী ঘোষ ছিলেন। তাঁহার মেয়ের নাম উষা (শ্রীযুক্ত জানকীনাথ বসুর স্ত্রী)। ইঁহাকে মা উষাদিদি বলিয়া ডাকিতেন। রাসবিহারীবাবুর স্ত্রীও মাকে খুব ভালবাসিতেন—মা তাঁহাকে "মাসীমা" বলিয়া ডাকিতেন। অনেকেই মাকে খুব ভালবাসিত। মার অপূর্ব্ব রূপের প্রভা দেখিয়া অনেকে আশ্চর্য্য হইত। ভুদেববাবুর স্ত্রী বলিয়াছেন—"মার এমন রূপ যে, ঘাটে গেলে ঘাট আলো করিত।" তাই মাকে কেহ কেহ "রাঙ্গাদিদি" বলিত। মার আনন্দপূর্ণ স্বভাবে অনেকেই তাঁহাকে "খুসীর মা" বলিয়া ডাকিত।

অষ্টগ্রামের একটী ভদ্রলোক—তাঁহাকে মা ভাইয়ের মতন দেখিতেন ও তিনিও মাকে রাঙ্গাদিদি বলিতেন—মাকে একখানা ধর্ম্মপুস্তক পড়িয়া শুনাইতেছিলেন। একটু পরেই মার অবস্থা দেখিয়া তিনি বুঝিলেন মার কানে কিছুই যাইতেছে না। মা স্থিরভাবে বসিয়া ছিলেন—তিনি তখন আস্তে আস্তে বই নিয়া উঠিয়া গেলেন। আর কখনও তিনি মাকে বই পড়িয়া শুনাইতে চেষ্টা করেন নাই।

একবার শিবরাত্রিতে দাদামহাশয় উপবাসী ছিলেন। মা ও ভোলানাথ শিবরাত্রিতে উপবাস করিতেন। তাঁহাদের

দুইটী ও দাদামহাশয়ের একটী, আরও কাহার জন্য একটী— চারিটী শিব গড়াইয়া দিয়াছেন। দাদামহাশয় একে একে পূজা করিতেছেন। যখন একটী শিব লইয়া তিনি পূজা আরম্ভ করিয়াছেন, তখন হঠাৎ মার মুখ হইতে কি সব মন্ত্রের মত বাহির হইতে লাগিল। পরে দাদামহাশয় বলিয়াছেন—যেই মায়ের নামের শিবটী পূজা করিতে আরম্ভ করিয়াছেন, তখনই ঐরূপ হইয়াছিল।

(৪)

ঢাকা শাহবাগে

(১৩৩১——)

১৩৩০ সালের শেষভাগে ভোলানাথের চাকুরী যায়। তখন তিনি অত্যন্ত চিন্তান্বিত হইয়া পড়েন। ঢাকাতে গেলে হয়ত কার্য্যের সুবিধা হইতে পারে, এই মনে করিয়া তিনি ঐ বৎসর ২৮শে চৈত্র ঢাকা গমন করেন। মাও সঙ্গে ছিলেন। কিন্তু ঢাকাতে এদিক ওদিক অনুসন্ধান করিয়াও যখন কোন কার্য্যের যোগাড় করিতে পারিলেন না তখন মাকে পাঠাইয়া দিবার সঙ্কল্প করিলেন। মা তাঁহাকে তিনদিন অপেক্ষা করিয়া দেখিতে বলিলেন। বলা বাহুল্য, এই তিন দিনের মধ্যেই ১৩৩১ সালের ৩রা বৈশাখ তারিখে, শাহবাগে নবাবদিগের বাগানের তত্ত্বাবধায়কের পদে তাঁহার নিয়োগ হইল।

শাহবাগ প্রকাণ্ড বাগান। তাহারই এক অংশে ভোলানাথের থাকিবার ব্যবস্থা হইয়াছিল। তাঁহার থাকিবার জন্য একটী ঘর ছিল—তাহা ছাড়া একটী বড় নাটমন্দিরও ছিল। তাহার দুই পার্শ্বে দুইটী ছোট ছোট কুঠুরী ছিল। আর একটী ছোট দালান ছিল—তাকে 'খানাঘর' বলিত।

যখন শাহবাগে আসা হয়, মার মৌনাবস্থা তখনও চলিয়াছে। শাহবাগেও প্রায় দেড়বৎসর পর্য্যন্ত ঐ অবস্থা ছিল। ইহা ছাড়া আহারাদি সম্বন্ধে মাঝে মাঝে নানাপ্রকার নিয়মাদি হইত। প্রায় ৮।৯ মাস পর্য্যন্ত প্রতিদিন তিন গ্রাস মাত্র খাইতেন। এমন কি, ফলাহার করিলেও তিনবারের বেশী মুখে দিতেন না। অন্য সময় জল পর্য্যন্ত গ্রহণ করিতেন না। তাহার পর ফলাদি খাইয়া থাকার নিয়ম হইল। কিন্তু তাহার জন্য কোন ব্যবস্থা করিতে নিষেধ হইল। আপনা আপনি যাহা জুটিয়া যাইত তাহার উপরই নির্ভর ছিল। এই সময় মার শরীরে বিশেষভাবে যৌগিক ক্রিয়াদি হইতে থাকে এবং সাতমাস পর্য্যন্ত মার ঋতু বন্ধ ছিল, তাহার পর কিছুদিন আবার স্বাভাবিক ভাবে হইয়া ২৭।২৮ বৎসর বয়সেই ঋতু বন্ধ হইয়া যায়।

মা সংসারের কাজকর্ম্ম সবই করিতেন। তখন ওখানে মাখন (মার ছোট ভাই) ও আশু (ভোলানাথের ভ্রাতুষ্পুত্র) থাকিত—তাহারা স্কুলে পড়িত। তাহাদের জন্য প্রাতে রান্না করিয়া দিতে হইত—খাওয়া হইয়া গেলে বাসন মাজিতেন ও

স্নান করিয়া পুকুর হইতে জল আনিয়া আবার ভোগের রান্না করিতেন। তারপর ভোগ নিবেদনের পর ভোলানাথ ভোজন করিতেন। মসলাপেযা, তরকারী কোটা হইতে আরম্ভ করিয়া সমস্ত গৃহকর্ম্ম একাই করিতেন। তখন দিন রাত্রি সব সময়েই একটা তন্ময়তা ভাব লাগিয়াই থাকিত। অনেক সময়েই মাটীতে পড়িয়া থাকিতেন—কোন কাজ করিতে গিয়া হঠাৎ অবশ হইয়া পড়িয়া থাকিতেন। পরে ঐ অবস্থা কাটিলে—উঠিয়া অসম্পূর্ণ কার্য্য সম্পূর্ণ করিতেন। তখন সব সময় ঘোম্‌টা দিয়া চলিতেন। তবে কুণ্ডলী দিয়া কথা আরম্ভ হইলে মাথার কাপড় অনেক সময় থাকিত না।

দীপান্বিতা কালীপূজার বিবরণ গ্রন্থমধ্যে আছে (পৃঃ ৫৮)— ইহা ১৩৩২ সালের কার্ত্তিক মাসে হইয়াছিল। ১৩৩৩ সালের দীপান্বিতাতেও কালীপূজা হয়—এই কালীর ইতিহাসও গ্রন্থে আছে (পৃঃ ১২৩-১২৮)। এই কালীর বিসর্জ্জন হয় নাই। ইনি এখনও আছেন। সিদ্ধেশ্বরীর ঘটনা ১৩৩১ সালের ভাদ্র মাসে হইয়াছিল (পৃঃ ৪৫-৪৬)। তখন মা বাহিরে ততটা প্রকাশিত না হইলেও একেবারে গুপ্ত ছিলেন না। কোন কোন ভক্ত প্রায়ই আসিতেন। প্রাণগোপালবাবু, প্রমথবাবু, বাউলবাবু, ননীবাবু, নিশিবাবু প্রভৃতি অনেকেই মাঝে মাঝে আসিয়া মার সঙ্গ করিতেন।

শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী।

প্রথম ভাগ।

প্রথম অধ্যায়।

বাঙ্গলা ১৩৩২ সনের পৌষ মাসে (ইং ১৯২৫ ডিসেম্বর-১৯২৬ জানুয়ারী) মার সঙ্গে প্রথম দেখা। পিতৃদেব শ্রীযুক্ত শশাঙ্কমোহন মুখোপাধ্যায় মহাশয় (অবসরপ্রাপ্ত সিবিল সার্জন) পূর্ব্বে ডেপুটী পোষ্ট মাষ্টার জেনেরল ৺প্রমথ-নাথ বসুর কাছে মার খবর পাইয়া দুইদিন গিয়া তাঁহাকে দেখিয়া আসার পর আমাকে নিয়া গেলেন। মা তখন ঢাকা শাহবাগে থাকেন। বাবা ভোলানাথ* তখন ঐ বাগানের তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন। প্রকাণ্ড সাজান বাগান—মার থাকিবার উপযুক্ত স্থানই হইয়াছে। আমি কখনও বড় বাহির হইতাম না, অপরিচিত স্ত্রী কি পুরুষ কাহারও সহিত কথা বলিতেও পারিতাম না—কেমন একটা স্বভাব ছিল। এ জন্য বাবা-মা কত মন্দ বলিয়াছেন, কিন্তু কিছুতেই অপরিচিত কাহারও দিকে চাহিতে বা কাহারও সহিত কথা বলিতে পারিতাম না। কোন সাধুর কাছে যাওয়াও আমার একেবারে স্বভাব-বিরুদ্ধ ছিল। কিন্তু যে দিন বাবা

প্রথম পরিচয়।

---

* মার স্বামী শ্রীযুক্ত রমণীমোহন চক্রবর্ত্তী।

মাকে দেখিয়া আসিয়া খবর দিলেন, তাহার পর দিনই আমার মনটা অত্যন্ত অস্থির হইয়া উঠিল, ইচ্ছা হইল মাকে দেখিতে যাইব। কিন্তু বাবাকে কিছু বলি নাই, কাজেই তিনি সন্ধ্যাবেলা একাই চলিয়া গেলেন। যখন বাবার গাড়ী ছাড়িয়া দিয়াছে, আমার বেশ মনে আছে, রাস্তার ধারের বারান্দায় দাঁড়াইয়া আমি খুব কাঁদিলাম। কি আশ্চর্য্য, যাঁহাকে কখনও দেখি নাই, যাঁহার সম্বন্ধে বলিতে গেলে কিছুই জানি না তাঁহাকে দেখিতে যাইতে পারিলাম না বলিয়া কি কান্না! আজও সে কথা ভাবিলে অবাক্ হই। তবে এখন বুঝিতেছি কেন তখন না দেখিয়াই কাঁদিয়াছিলাম, কিসের আকর্ষণ ছিল। বাবা ফিরিয়া আসিলে সব কাজ সারিয়া, মার সঙ্গে কি কি কথা হইল, সেই খবর শুনিতে গেলাম। বাবা কিছু কিছু বলিলেন, কিন্তু তাহাতে তৃপ্তি হইল না। বাবা বলিলেন, মা নাকি আমাকে নিয়া যাইতে বলিয়াছেন। মনে হইল বাবার মুখে আমার কথা শুনিয়া নিয়া যাইতে বলিয়া থাকিবেন।

পরদিন দুপুরবেলা খাওয়া দাওয়া করিয়া মার দর্শনে শাহবাগে গেলাম। গিয়া মাকে দেখিয়াই কত পরিচিতার মত কাছে গিয়া দাঁড়াইলাম। আজ আর অপরিচিতা বলিয়া চক্ষু-লজ্জা নাই। বেশ তাঁর দিকে চাহিয়া দেখিয়া প্রণাম করিলাম। মূর্ত্তি যাহা দেখিলাম তাহা আর কি বুঝাইব— মাথা যেন তাঁর চরণে আপনিই লুটাইয়া পড়ে। মার মাথায়

বেশ বড় ঘোমটা ছিল, বড় লাল চওড়া-পাড়ের শাড়ী পরা, বড় সিন্দুরের ফোঁটা কপালে ছিল। কিন্তু মুখখানায় অসাধারণ জ্যোতি মাখা, চোখ দুটী লাল, ছল ছল করিতেছে, ভাবে যেন বিভোর। কথা বড়ই জড়ান, অস্পষ্ট—শুনিলাম তিন বৎসর মৌন থাকিবার পর অল্প দিন মাত্র কথা বলিয়াছেন। শেষে দেখিয়াছি ঠিক সে জন্যও নয়। একটু সময় চুপ করিয়া থাকিলেই মার সমস্ত শরীর, এমন কি জিহ্বা পর্য্যন্ত, আড়ষ্ট হইয়া যাইত। দেখিলাম বাগানে মা, ভোলানাথ, এক বিধবা ননদ (মটরী পিসিমা), মার এক ভাসুর পো (আশু) ও এক ভাগিনেয় (অমূল্য) থাকেন। আশু স্কুল হইতে আসিয়াছে—মা ভাত বাড়িয়া দিতে গেলেন। কিন্তু হাত যেন অবশ। অতি কষ্টে ভাত বাড়িয়া দিয়া আসিয়া আমার কাছে বসিলেন। আমাকে বসিবার জন্য কি যেন পাতিয়া দিলেন। পান তৈয়ার করিয়া আনিয়া দিলেন। আমি বলিলাম, "আমি ত কখনও পান খাই না।" মা বলিলেন,—"আমি পান খাই, তাই তোমায়ও দিলাম।" আমিও কেমন হইয়া গেলাম, বলিলাম "বেশ ত, আপনি দিয়াছেন, খাইব।" দেখিতেছি ভাবে এত ভরপুর যে চোখও ভাল খুলিতে পারিতেছেন না। আমি ত এই প্রকার ভাব আর কখনও চক্ষে দেখি নাই। মুগ্ধ হইয়া দেখিতেছি, আর কেমন মনে হইতেছে যাহা চাহিতেছিলাম আজ যেন তাহা পাইয়া কৃতার্থ হইয়া গিয়াছি। কিছুক্ষণ দুই চারিটী কি কথা হইল ঠিক মনে নাই।

কখন যে 'আপনি' সম্বোধন গিয়া 'তুমি' হইয়া গিয়াছে ও গায়ের কাছে লাগিয়া বসিয়াছি কিছুই খেয়াল নাই। মা তখন আমাকে নিয়া যে ঘরে বসিয়াছিলেন সে ঘরটীতে মার ভঁাড়ারের জিনিষপত্র থাকিত; পাশের ঘরটা একটু বড়, সেটাতে মা শুইতেন; তার পরে আরও একটা ছোট কোঠা, তার মধ্যে মটরী পিসিমা ছেলেদের নিয়া থাকিতেন। এই তিনটী কোঠা নিয়া এই ছোট দালান টুকুতেই মা থাকিতেন। কিছু দূরে দুইটী ছাপড়া দেখিলাম, তাহাতে নিরামিষ ও আমিষ পাক হয়। রোজ ভোগ দিয়া খাওয়া হয় শুনিলাম। মা দুই চারিটী কথা বলিয়াই মধ্যের দরজাটা বন্ধ করিয়া দিলেন। ঐ মধ্যের কোঠায় বাবা ও ভোলানাথ বসিয়া ছিলেন। দরজা বন্ধ করিয়া মা খুব পরিচিতার মতই কথা বলিতে লাগিলেন। আমাকে হঠাৎ বলিলেন, "তুমি এতদিন কোথায় ছিলে?" এই বলিয়া হাসি-হাসি মুখে আমার দিকে চাহিয়া রহিলেন। কথা বলিতে বলিতে ভাবটা আবার কেমন জমিয়া আসিল, বলিলেন, "তুমি বস, আমি একটু আসি।" আমি অমনি বলিলাম "তা কি হয়, আমি আসিলাম তোমাকে দেখিতে, তুমি এখন যাইতে পারিবে না।" আমি ভাবিয়াছিলাম মা বুঝি উঠিয়া যাইবেন, কিন্তু দেখি তা ত নয়, মা ঐখানেই আমার কোলের কাছে মাটির মধ্যেই শুইয়া পড়িলেন। আমি রামকৃষ্ণ দেবের কথামৃত পড়িয়াছিলাম, তাই ভাবিলাম এই বুঝি সমাধি। আমি চোখ বুজিয়া মার শরীর স্পর্শ

করিয়া বসিয়া রহিলাম। অনেকক্ষণ পর মা উঠিয়া বসিলেন। শরীর যেন অসাড়। ভাবিলাম একটু স্থির ভাব আনিবার জন্য মানুষকে কত সাধনা করিতে হয়, কিন্তু ইঁহার দেখিতেছি সর্ব্বদাই সেই ভাব লাগিয়াই আছে। উঠিয়া আবার অতি অস্পষ্ট ভাষায় কথা বলিতে বলিতে ক্রমে কথা কিছু স্পষ্ট হইয়া আসিল। অনেকক্ষণ কথা হইল।

আমি মার কোলে মাথা দিয়া শুইয়া পড়িয়াছি। মাও বসিয়া বসিয়া কত কথা বলিতেছেন। এদিকে মাকে দেখিবার জন্য প্রমথবাবুর পুত্র প্রতুলবাবু আসিয়াছেন। প্রতুল বাবু এই অবস্থায়ই দরজা খুলিয়া দিয়াছিলেন। ইনি মার খুব ভক্ত, মার কাছে অনেক দিন যাবৎ আসা যাওয়া করেন। ইঁহার পিতাও মার খুব ভক্ত। বাবা আমাকে ডাকিয়া বলিলেন, "উঠিয়া এস, মাকে দেখিবার জন্য আর আর ভক্তেরা আসিয়াছেন"। দরজা খুলিয়া দেওয়া হইল। আমরা মাকে নমস্কার করিয়া চলিয়া আসিলাম। আসিবার সময় মা আমাকে পুনরায় নিয়া যাইবার জন্য বাবাকে বলিয়া দিলেন।

নেশা লাগিয়াছে। পরদিন আবার গেলাম, দেখিলাম, কথা শুনিলাম, চলিয়া আসিলাম। কিন্তু বাসায় আর প্রাণ টিকে না। রোজই যখনই হয় একবার করিয়া মার কাছে যাই, সেই সময়-টুকুর প্রতীক্ষায় সারা দিন-রাত বসিয়া থাকি। এক একদিন মাকে দেখিবার জন্য মন হঠাৎ এত চঞ্চল হইয়া উঠিত যে, দিনের মধ্যে দুইবারও গিয়া উপস্থিত হইতাম। ক্রমে

পরিচয় গাঢ় হইতেছে, মধ্যে মধ্যে গিয়া মাকে সাহায্য করি, পরিবেশনে সাহায্য করি। শুনিলাম প্রাণগোপাল বাবু (ডেপুটী পোষ্ট মাষ্টার জেনেরল শ্রীযুক্ত প্রাণগোপাল মুখোপাধ্যায়), বাউলবাবু (উকিল স্কুলের মাষ্টার শ্রীযুক্ত বাউলচন্দ্র বসাক), ননীবাবু (ঢাকা বিশ্ব বিদ্যালয়ের প্রোফেসার), নিশিবাবু (বিক্রমপুর সামসিদ্ধির জমিদার শ্রীযুক্ত নিশিকান্ত মিত্র) প্রভৃতি কয়েকজন মার কাছে যাওয়া আসা করিতেন। প্রাণগোপালবাবু বদ্‌লী হইয়া স্থানান্তরে যাওয়ায় তাঁহার স্থানে প্রমথবাবু আসিয়াছেন। তিনিও মার কাছে রোজই সপরিবারে যাইতেন। ইঁহাদের সকলেরই সংসার আছে, আর সকলে ব্রাহ্মণও নন, কাজেই বেশী সময় থাকিতে বা মার রান্নার সাহায্য করিতে তাঁহারা পারিয়া উঠেন নাই। আমাকে পাইয়া মা খুব আনন্দ করিয়া বলিতেন, "ভগা তোমাকে উপস্থিত করিয়া দিয়াছেন। এখন এই শরীর দিয়া সব কাজগুলি যেন ঠিক মত হয় না, তাই সাহায্য করিবার জন্য ভগা তোমাকে নিয়া আসিয়াছেন।" শুনিলাম মা এতদিন একাই ছিলেন, কিন্তু অধিকাংশ সময়ই পড়িয়া থাকিতেন বলিয়া রান্না প্রভৃতি করার অসুবিধা হইত, তাই ভোলানাথের বিধবা ভগিনী মটরী পিসিমা আসিয়াছেন। মাছের রান্না বিধবাদের ছুঁইতে দেওয়া মোটেই মা ইচ্ছা করিতেন না; তাই মাছের ভোগটা যখন যে ভাবে হয় মা নিজেই পাক করিয়া নিতেন, নিরামিষ সব মটরী পিসিমাই করিতেন। শুনিলাম মার আরও একজন ননদ—শ্রীযুত কালীপ্রসন্ন কুশারী

মহাশয়ের স্ত্রী—বড়দিনের বন্ধে (ডিসেম্বর ১৯২৫) মার কাছে গিয়াছিলেন। মা তাঁহার সঙ্গে একত্র বসিয়া খাইয়াছিলেন।

রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের বাড়ী হইতে সর্ব্বদাই মেয়েরা আসিতেন। যোগেশবাবুর তৃতীয় ছেলে প্রফুল্ল বাবুর স্ত্রী মাকে খুবই ভালবাসিতেন, তিনি বলিতেন, "ঐ যে শাহবাগের সেই বউটি, প্রায় প্রতিদিন বাগানে সেই বউটিকে দেখিতে যাইতাম। বৈকাল ৩টা হইতে ৪টার মধ্যে কতক্ষণে সেই সময়টা আসিবে তাহার জন্য অস্থির হইতাম। শাশুড়ী ঠাকুরাণী বলিতেন, 'বাড়ী থাকিয়া কি ধর্ম্ম হয় না? রোজই সেখানে কি?' ধর্ম্ম মনে করিয়া যাইতাম তাহা মনে হয় না। কিন্তু একদিন সেই বউটিকে না দেখিলে প্রাণ অস্থির হইত। বাগানে যাইবার জন্য ব্যাকুল হইতাম। কেবলই মনে হইত "ঐ যে শাহবাগের সেই বউটি"। আমার ভালবাসাও যেন ক্রমশঃ সেই "বউটির" দিকেই যাইতে লাগিল। মার এইরূপ তীব্র আকর্ষণের প্রমাণ আরও অনেক পাওয়া গিয়াছে। এখনও মার কাছে খুব বেশী লোক যাতায়াত করেন না। শুনিলাম জ্যোতিষচন্দ্র রায় আই, এস, ও (I. S. O.), (Personal Assistant to the Director of Agriculture, Bengal) মাকে কয়েক মাস পূর্ব্বে আসিয়া দেখিয়া গিয়াছিলেন। তিনিও তখন বেশী আসিতেন না, তবে না আসিলেও অধীনস্থ কর্ম্ম-চারীদের সর্ব্বদাই শাহবাগে পাঠাইয়া মার খবরাখবর নিতেন। পরে শুনিয়াছি তিনি আসিয়া যখন দেখিলেন মার মাথায় বেশ

বড় ঘোমটা তখন তিনি ভাবিলেন, "আমরা 'মা' ভাবিয়া আসিলাম কিন্তু মার এত বড় ঘোমটা ! এখনও আমাদের আসিবার সময় হয় নাই।" এই ভাবিয়া তিনি নিজে আর আসিতেন না, লোক পাঠাইয়া খবর নিতেন। জ্যোতিষ দাদা বড় বিচার করিয়া চলিতেন। তাই তখনও বিচার করিয়াই দূরে রহিলেন।

পরে ধীরে ধীরে বেশী সময় মার কাছে কাটাইতে লাগিলাম। মা অনেক সময়ে কথা-প্রসঙ্গে পূর্ব্বের সব কথা বলিতেন, আমি মুগ্ধ হইয়া শুনিতাম। মনে হইত কখনও যেন এমন আর শুনি নাই। আমরা ধীরে ধীরে শাহবাগে প্রায় ঘরের লোক হইয়া উঠিলাম। ধীরে ধীরে নূতন নূতন লোকও আসিতে লাগিলেন। কিন্তু মা মাথায় ঘোমটা দিয়াই ভোলানাথের আদেশে সকলের কাছে আসিয়া বসিতেন ও তাঁহারাই অনুমতিক্রমে সকলের সহিত প্রয়োজনানুসারে দুই চারিটী কথা বলিতেন। ভদ্র-লোকেরা চলিয়া গেলে আমাদের সঙ্গে কখনও খুব আনন্দের সহিত কথা বলিতেন। আবার এক এক সময় একেবারে জিহ্বা আড়ষ্ট থাকিত, কিছু বলিতে পারিতেন না। নিজের অবস্থার কথাও আমার কাছে অনেক বলিতেন—আমার মত প্রায় সর্ব্বদার সঙ্গী ও কথা শুনিবার মত লোক এখনও জোটে নাই। তাই যেন মহা আনন্দে প্রাণ খুলিয়া কত কথাই বলিতেন। আমি ত মুগ্ধ। প্রত্যহ কোন প্রকারে বাসায় গিয়া কিছুক্ষণ কাটাইয়া আবার চলিয়া আসিতাম।

মা পাতের প্রসাদ কাহাকেও দিতেন না। পায়ের ধূলাও

দিতেন না—দূর হইতে সকলে মাটিতে পড়িয়া প্রণাম করিতেন, মাও হাত জোড় করিতেন। কেহ পায়ে ধরিয়া প্রণাম করিলে অমনি মাও তাঁহার পায়ে হাত দিয়া প্রণাম করিয়া ফেলিতেন। এই ভয়ে আর কেহ পায়ে হাত দিতেন না। রান্না হইয়া গেলে মা ও ভোলানাথ ঘরে গিয়া ভোগ দিতেন, পরে সকলে প্রসাদ পাইত। মা ভোলানাথের পাতেই প্রসাদ পাইতেন। আমরা যখন প্রথম যাই তখন মা সোমবার ও বৃহস্পতিবার তিন গ্রাস খাইতেন, অন্য পাঁচ দিন নয়টা ভাত গণিয়া খাইতেন। আর কোন খাওয়া ছিল না। কিন্তু কাজ কর্ম্ম বেশ করিতেন। যতটা সম্ভব ভোলানাথের সেবা করিতে ত্রুটি করিতেন না। পতি-ভক্তি এমন আর দেখি নাই। শিশুর মত আদেশ পালন করিয়া যাইতেন—কোন বিচার করিতেন না।

একদিন সোমবার কি বৃহস্পতিবার বাবা নিজের টিকাটুলীর বাড়ীতে মাকে ভোগ দিবার জন্য নিয়া আসিলেন। মা এই প্রথম এই বাসায় আসিয়াছেন। সঙ্গে ভোলানাথ ও আরও কয়েকজন আছেন। মা বাসায় সব ঘরে ঘুরিয়া ঘুরিয়া দেখিতেছেন, রাস্তার দিকে বারান্দায় গিয়া বলিতেছেন, "প্রথম যখন ঢাকা আসিলাম, এই রাস্তায় বেড়াইতে যাওয়ার সময় এই কলে (বাসার সামনেই রাস্তায় কল ছিল) কতবার পা ধুইয়া গিয়াছি। তখন বাড়ী তৈয়ার হইতেছিল। এই বাড়ীটা দেখিয়া মনে মনে বলিয়াছি, হয়ত

আমাদের বাড়ীতে মায়ের ভোগ। পৌষ ১৩৩২।

কোন সাহেবদের বাড়ী হইবে। দেখ আগেই বাড়ীটা লক্ষ্য করিয়া গিয়াছিলাম। আর বাবা ত সাহেবের কাজেই ছিলেন। কাজেই ভুল করি নাই।" এই বলিয়া হাসিতে লাগিলেন। মা পূর্ব্বেই এ বাসা লক্ষ্য করিয়াছেন শুনিয়া আমাদের ত মহা আনন্দ। ভোগ হইবার একটু পূর্ব্বেই নিশিবাবু ব্যস্তভাবে আসিয়া মাকে প্রণাম করিয়া প্রার্থনা জানাইলেন, তাঁহার দৌহিত্রটীর কর্ণমূল হইয়াছে, এখন বড়ই শোচনীয় অবস্থা, মা যদি কৃপা করিয়া একবার তাঁহার বাসায় যান তবে তিনি কৃতার্থ হন। তাঁহার বাসা নিকটেই ছিল, বাবা গাড়ী আনিতে যাইতেছিলেন, কিন্তু মা যাইতে দিলেন না। ভক্তের কাতর প্রার্থনায় দয়াময়ী তখনই হাঁটিয়াই তাঁহার বাসায় গিয়া উপস্থিত হইলেন ও একটু পরেই ফিরিয়া আসিলেন। ওখানে যাইয়া কি করিলেন তাহা জানি না। কাহারও কথা অন্য কাহারও কাছে প্রায়ই প্রকাশ করেন না। তবে দেখা গেল কর্ণমূলটী আপনিই ফাটিয়া গেল, ছেলেটীও ভাল হইয়া উঠিল। যাওয়ার সময় আমাকে বলিয়াছিলেন, "কি ছেলেটী ভাল হইবে ত?" আমি অমনিই উত্তর দিয়াছিলাম, "তুমি যখন যাইতেছ, নিশ্চয়ই ভাল হইবে"। তিনবার জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, তিনবারই আমি ঐ ভাবে পরিষ্কার জবাব দিয়াছিলাম। মাও হাসিয়া সবাইকে বলিলেন, "ও ত বলিতেছে ভাল হইবে, তবে ভালই হইবে।" এই বলিয়া চলিয়া গেলেন *।

* পরেও এই ভাবের ব্যাপার দেখিয়াছি—কোন ঘটনা হইয়াছে

নিশিবাবুর বাসা হইতে ফিরিয়া আসিয়া মা বসিয়া আছেন। আজ মার তিন গ্রাস খাইবার দিন ছিল। ভোলানাথকে বলিলেন, "তুমি খাও, আমি পরে খাইব।" ভোলানাথ খাইয়া উঠিলে মা আমাকে দেখাইয়া বলিলেন, "আমি ওর সঙ্গে একত্র খাই?" তিনি বলিলেন, "বেশ ত, খাও। কিন্তু আজ ডাক্তারবাবু প্রথম তাঁহার বাসায় আনিয়াছেন, সব যোগাড় করিয়াছেন, আজ তোমাকে সব খাইতে হইবে।" স্বামীর আদেশে মা যথাসাধ্য সব নিয়মই ভঙ্গ করিতেন। বিশেষতঃ মার ত কোন নিয়ম ইচ্ছা করিয়া হইত না—যখন যাহা হইবার হইয়া যাইত। কিছুদিন হয়ত একটা নিয়ম চলিল, আবার তাহা বদলাইয়া গেল, এইরূপ হইত। তিনি ভোলানাথের আদেশ রক্ষা করিতে সর্ব্বদাই চেষ্টা করিতেন। ভোলানাথও মার কাজে বড় বাধা দিতেন

যে কেহ কাছে আছে মা তাহাকেই কি হইবে জিজ্ঞাসা করিতেন, ভাল মন্দ তাহার মুখ দিয়াই বলাইয়া নিতেন, নিজ মুখে কিছুই বলিতেন না। আবার যদি কেহ উত্তর দিবার সময় পরিষ্কার ভাবে বলিতে না পারিত তবে বলিতেন, "কি জানি, কেমন বলিতেছে, ভাল ত মনে হয় না।" আশ্চর্য্যের বিষয় ইহা জানা সত্ত্বেও মা কোন বিষয়ের ভাল মন্দ জিজ্ঞাসা করিলে সব সময় খোলা ভাষায় "ভালই হইবে" বলিতে পারা যাইত না। উত্তর যেন ঠেকিয়া যাইত, আর বাস্তবিকই সেই বিষয়ে গোলমালও হইত। মা এই ভাবে অপরের মুখ দিয়া কথা বাহির করিয়া লইতেন।

না। কারণ তিনি জানিতেন মা যাহা করেন তাহা ভালর জন্যই হয়। ভোলানাথের আদেশ পাইয়া মা হাসিয়া আমাকে হাত ধরিয়া উঠাইয়া বলিলেন, "চল, আমরা এক সঙ্গে খাইব। আমার এই অবস্থার পর আর কাহারও সহিত খাই নাই। আমার ননদ (কালীপ্রসন্ন বাবুর স্ত্রী) আসিয়াছিলেন, শুধু তাঁহার সঙ্গে খাইয়াছিলাম, আর আজ তোমার সঙ্গে খাইব।" আমি অনেকদিন পূর্ব্বেই মাছ মাংস খাওয়া ছাড়িয়া দিয়াছিলাম। মাংস ত বহুকাল হইতেই খাই নাই, মাছও প্রায় দুই বৎসর হইল একেবারে ত্যাগ করিয়াছিলাম। এর পূর্ব্বেও মাছ বড় খাইতাম না। মার মাছের ভোগ হয়, মার সঙ্গে খাইলেই মাছ খাইতে হইবে ; কিন্তু মাকে দেখিয়াই এমন একটা ভাব হইয়াছে যে তাঁহার আদেশ লঙ্ঘন করিবার যেন ক্ষমতা নাই,—অনিচ্ছায় নয়, সানন্দে তাঁর আদেশ মানাইয়া নিতেছেন। আত্মীয় স্বজন সকলের অমতেও আমি মাছ ত্যাগ করিয়াছিলাম, কিন্তু আজ মার আদেশ অমান্য করিবার ক্ষমতা হইল না।

মার সঙ্গে ভোলানাথের পাতে গিয়া খাইতে বসিলাম। মা তখন নিজ হাতেই খাইতেন, নিজে একটু খাইয়াই আমাকে মাছ ভাত খাওয়াইয়া দিলেন। আমি বলিলাম, "তুমি যাহা দেও তাহাই খাইব।" আত্মীয়েরা বলিতে লাগিলেন, "আজ হইতে তুমি আদেশ করিয়া যাও, ওর মাছ খাইতে হইবে।" কিন্তু মা একটু হাসিয়া বলিলেন, "না, তা বলিতেছি না। আমার সঙ্গে যখন খাইবে তখনই খাইবে, অপর সময় খাওয়ার

দরকার নাই"। আমি তখন আলু-সিদ্ধ ভাত খাইতাম, কিন্তু মা এত মাছ-তরকারী খাওয়াইয়া দিলেন যে সকলেই মনে করিল আমার অসুখ করিবে। মার সহিত অল্পদিনের পরিচয়, তখন মার শক্তির ঠিক পরিচয় অনেকেই পায় নাই, তাই ঐরূপ মনে করিতেছিল। আমি হাসিয়া বলিতেছিলাম, "তুমি খাইবে না, শুধু আমাকেই খাওয়াইতেছ।" মাও হাসিয়া জবাব দিলেন, "আজ তোমাকে খাওয়াইয়া দিলাম, পরে আমাকে তুমি খাওয়াইয়া দিবে।" এ কথার অর্থ তখন ঠিক বুঝিলাম না। খাওয়া দাওয়া শেষ হইয়া গেল। বৈকালে মা শাহবাগে চলিয়া গেলেন।

৩০শে পৌষ ১৩৩২।

ইহার কিছুদিন পরেই পৌষ-সংক্রান্তির দিন সূর্য্যগ্রহণ পড়িল। সকলে মিলিয়া সে দিন শাহবাগে মার কাছে দিনে সূর্য্য গ্রহণ-উৎসব। কীর্ত্তনাদি করিবে ও প্রসাদ নিবে স্থির করিয়া তাহার আয়োজন করিতে লাগিল। আমরা সে দিন প্রাতেই আসিয়াছি। আসিয়া দেখি মা তরকারী কাটিতেছেন। আমাকেও সে কাজে বসাইলেন। অনেক লোক প্রসাদ পাইবে। বাউল বাবু ও তাঁহার স্ত্রী আসিয়া মার সাহায্য করিতেছেন। প্রথমে ইঁহারাই মার সব কাজের সাহায্য করিতেন। মা তরকারী গুছাইয়া চাল ডাল প্রভৃতি ঠিক করিয়া দিতেছেন। দেবেন্দ্র কুশারী প্রভৃতি কয়েকজন ভক্তেরা পাক করিবেন। মটরী পিসিমা ত আছেনই। বাবা গ্রহণের সময় পুরশ্চরণ করিতেন

—তিনিও আজ বাসায় না গিয়া এইখানেই জপ করিতে বসিলেন। মা নিজেই পূজার বাসন মাজিয়া বাবাকে পূজার জায়গা করিয়া দিলেন। গ্রহণের আরম্ভ হইতেই কীর্ত্তন সুরু হইল। ধীরে ধীরে প্রমথবাবুর স্ত্রী, নিশিবাবুর স্ত্রী প্রভৃতি স্ত্রীলোকেরা আসিয়া মাকে প্রণাম করিয়া কীর্ত্তনের কাছে একটা গোল ঘরে গিয়া বসিলেন। নাচ ঘরে কীর্ত্তন হইতেছে। মালিকেরা মার অবস্থা দেখিয়া শ্রদ্ধান্বিত হওয়ায় এখন সব জায়গায়ই মার উৎসব চলিতেছে। মা সমাগত স্ত্রীলোকদিগকে নিজ হাতে সিন্দুর দিয়া দিতেছেন, বসিবার জন্য মাতুর ইত্যাদি পাতিয়া দিতেছেন, কোন কাজেরই ত্রুটী নাই। এদিকে পাকের সব আয়োজন করিয়া দিয়া গিয়াছেন। এখন গিয়া মেয়েদের নিয়া কীর্ত্তনের সামনে গোল ঘরটায় বসিলেন। মা কোনও আসনে বড় বসিতেন না—মাটিতেই বসিতেন, মাটিতেই শুইয়া পড়িতেন। অনেক সময় এই অবস্থায় সারাদিন কাটিয়া যাইত—মা মাটিতেই পড়িয়া থাকিতেন। কখনও কখনও দেখিয়াছি পিঁপড়ায় মার মুখ হাত ভরিয়া আছে, মা এককোণে পাথরের মত মাটিতে পড়িয়া আছেন। আজও আসিয়া মাটিতে এক কোণে বসিলেন। মাথায় গায় বেশ করিয়া কাপড় ঢাকা দিয়াছেন। সর্ব্বদাই দেখিতাম, মাথার কিংবা গায়ের কাপড় কখনও খুলিয়া বসিতেন না, শরীর ভাল ভাবে ঢাকা থাকিত। কীর্ত্তন চলিতেছে, বেলা প্রায় দ্বিপ্রহর, আমরাও সকলে মার

কাছে বসিয়া আছি। হঠাৎ দেখি মার সমস্ত শরীর দুলিতে লাগিল, মাথার কাপড় পড়িয়া গেল। চোখ বুজিয়া গিয়াছে, কিন্তু শরীর যেন কীর্ত্তনের তালে তালে নামের সঙ্গে সঙ্গে দুলিতেছে।

কীর্ত্তনে মার ভাবাবেশ।

এই ভাবে দুলিতে দুলিতেই উঠিয়া দাঁড়াইলেন। কিন্তু শরীর যেন ছাড়িয়া দিয়াছেন, যেন কোন অদৃশ্য শক্তির সাহায্যে শরীরের নানারূপ ক্রিয়া হইতে লাগিল। অবস্থা দেখিয়া পরিষ্কার বোঝা যায় এর মধ্যে নিজের কোন ইচ্ছা শক্তি নাই। শরীর এমন ছাড়িয়া দিয়াছেন যে গায়ের কাপড়ও পড়িয়া যাইতেছে। তখন মা সেমিজ গায় দিতেন না, কাপড়ই এমন সুন্দর ভাবে পরিতেন যে কখনও বাহু পর্য্যন্ত দেখা যাইত না। মেয়েরা সকলে মার গায়ের মধ্যে একটা চাদর শক্ত করিয়া জড়াইয়া দিলেন। মা বাতাসের সঙ্গে সঙ্গে—যেন একবার পড়ি পড়ি করিয়াও বাতাসে ভর করিয়াই—উঠিতেছেন। সমস্ত ঘরটা এইভাবে ঘুরিতে লাগিলেন। যেন কি ভয়ানক নেশায় মাতাল। ঠিক সেই রকমও নয়—কি যে অবস্থা দেখিলাম তাহা ভাষায় বুঝান দুঃসাধ্য। জীবনে আর কখনও এইরূপ অবস্থা দেখি নাই। চৈতন্যদেবের ও রামকৃষ্ণদেবের জীবনীতে এই মহাভাবের বিষয় কিছু কিছু পড়িয়াছিলাম মাত্র। আজ এই অবস্থা প্রত্যক্ষ দেখিয়া ত যেন আড়ষ্ট হইয়া গেলাম। কি আশ্চর্য্য অবস্থা! যিনি কিছুক্ষণ পূর্ব্বেই কত কাজ করিতেছিলেন, তিনি যেন এখন কোথায় চলিয়া গিয়াছেন।

সাধারণের বুদ্ধিরও অতীত অবস্থা। দেখিতে লাগিলাম— মার শরীরটা ঐ ভাবে ঘুরিতে ঘুরিতে বারান্দা দিয়া ক্রমে কীর্ত্তনের দলের মধ্যে গিয়া পড়িয়া ঘুরিতে লাগিল। ঊর্দ্ধ ও পলকহীন চক্ষু, মুখে অস্বাভাবিক জ্যোতি, যেন ঝক্‌ঝক্ করিতেছে, সমস্ত শরীরে রক্তাভা, দেখিতে না দেখিতে দাঁড়ান অবস্থা হইতেই একেবারে মাটিতে পড়িয়া গেলেন। কিন্তু কিছু মাত্র চোট পাইলেন বলিয়া মনে হইল না। বলিয়াছি ত' বাতাসের সঙ্গেই যেন শরীর ছাড়িয়া দিয়াছেন, বাতাসের সঙ্গে সঙ্গেই যেন মাটিতে গড়াইয়া পড়িলেন, পড়িয়াই যেমন ঘূর্ণিবায়ুতে কাগজ কি পাতা উড়াইয়া নেয়, এমনি ভাবে শরীর দ্রুত ভাবে ঘুরিতে লাগিল। আমরা ধরিয়া রাখিবার চেষ্টা করিলাম, কিন্তু সে বেগ সামলান অসম্ভব। কিছুক্ষণ পর স্থির হইয়া বসিলেন। চোখ বুজিয়া আছেন, আসন করিয়া বসিয়া আছেন, স্থির, ধীর, অচল, অটল। অবস্থা দেখিয়া বাবাকে দেখাইবার জন্য তাঁহাকে ডাকিয়া আনিতে মার শুইবার ঘরে গেলাম। দেখিলাম বাবা জপ করিতেছেন। বলিলাম, "দেখিয়া যান কি অদ্ভুত অবস্থা! এমন কখনও দেখি নাই।" কিন্তু বাবা জপ ফেলিয়া উঠিলেন না, তখনও গ্রহণ ছাড়ে নাই। পরে দেখিলাম মা কীর্ত্তনের ঐ এলোমেলো বেশেই বাবা যে ঘরে জপ করিতে বসিয়াছিলেন চলিতে চলিতে সেই ঘরে গিয়া একেবারে দরজা খুলিয়া একাই ঢুকিয়া পড়িলেন, কি করিলেন জানি না, মুহূর্ত্ত পরেই আবার বাহির

হইয়া দরজা বন্ধ করিয়া ঐ ভাবেই কীর্ত্তনের ভিতর চলিয়া আসিলেন। বাবা কিন্তু মাকে দেখেন নাই। মা বসিয়া প্রথমে ধীরে ধীরে, পরে অতি উচ্চৈঃস্বরে পরিষ্কার ভাবে নাম করিতে লাগিলেন,—"হরে মুরারে মধুকৈটভারে, গোপাল গোবিন্দ মুকুন্দ শৌরে।" শুধু এই টুকুই ঘুরাইয়া ঘুরাইয়া গাইতে লাগিলেন। কি সে সুর, আজও তাহা মনে করিতে শরীরে রোমাঞ্চ হয়। এমন মধুর ধ্বনি আর কখনও শুনি নাই। সবই নূতন। সকলেই এ ব্যাপার প্রায় নূতন দেখিলেন। কারণ মার এই ভাব এত দিন খুব গোপনেই ছিল, সকলের সাম্‌নে কীর্ত্তনের মধ্যে তিনি এই ভাবে আর কখনও বাহির হন নাই। ইহার পর মা চুপ করিয়া কিছুক্ষণ বসিয়া থাকিয়া শরীর ছাড়িয়া দিয়া মাটিতে লুটাইয়া পড়িলেন। শরীরে যেন কোনরূপ স্পন্দন নাই। শ্বাস অতি ধীরে ধীরে একটু একটু চলিতেছিল। গ্রহণ ছাড়িয়া গেল, বাবা উঠিয়া আসিয়া দেখিলেন মার বেশ আলু-থালু, মাথার চুলগুলিও এলোমেলো এই ভাবে মাথা গুঁজিয়া বসিয়া আছেন। মাটিতে পড়িয়া নমস্কার করিলেন।

বৈকাল হইয়া গিয়াছে। ভোলানাথ অনেক ডাকাডাকি করিয়া মাকে উঠাইলেন। তখনও শরীর অবশ, গায়ের কাপড় ঠিক করিয়া দিতে পারিতেছেন না। আমরা কাপড় ঠিক করিয়া দিলাম। কথা বলিতে পারিতেছেন না, জিহ্বা একেবারে আড়ষ্ট হইয়া গিয়াছে। ভোলানাথের কথায়

তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে উঠিয়া গেলেন বটে, কিন্তু শরীর মোটেই ঠিক নাই। ভোলানাথ মাকে রান্নার জায়গায় নিয়া ঘুরাইয়া আনিয়া শুইবার ঘরে নিয়া গেলেন। মা সেই ঘরে গিয়া মাটিতে বসিয়া পড়িলেন। ধীরে ধীরে সকলের সহিত একটু একটু কথা বলিতে বলিতে ক্রমে কথা একটু স্পষ্ট হইল। ধীরে ধীরে শরীরের অবসন্ন ভাবটাও একটু কমিয়া আসিল। আমরা শরীরে হাত বুলাইতে লাগিলাম। বলিলেন, "শরীরের ভিতরটা ঠিক নাই, কেমন যেন হইয়া গিয়াছে।" চোখ তখনও জলে ভরা। এই ভাবে সন্ধ্যা হইয়া আসিল। ভোলানাথ কীর্ত্তনের কাছে বাতাসা নিয়া যাইতে বলিলেন। মা আবার মাথার ও গায়ের কাপড় ঠিক করিয়া লইয়া একখানা পিতলের পরাতে করিয়া বাতাসা নিজে লইলেন ও আর একখানা পিতলের পরাতে যে ফল কাটা ছিল তাহা আমার হাতে দিয়া কীর্ত্তনে চলিলেন। কীর্ত্তনের একধারে বাতাসা রাখা হইল, ফলও রাখা হইল। গ্লাসে করিয়া জল দেওয়া হইল। খুব জোরে কীর্ত্তন আরম্ভ হইল। সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে, মা ঘোমটা দিয়াই মেয়েদের নিয়া কীর্ত্তনের একধারে মাটিতে বসিয়াছেন। কিছুক্ষণ পরেই আবার সেই ভাব, শরীরে যেন নূতন নূতন ক্রিয়া হইতে লাগিল। এবার চোখের সে শান্ত দৃষ্টি কিছু সময়ের জন্য বদলাইয়া গিয়া ভীষণ ভ্রূকুটীতে পরিণত হইয়াছে। পা এবং দুই হাত এমন ভাবে চলিতেছে যে দেখিলেই মনে হয় পা এবং দুই হাত, কোন সময় এক পা

এমন ভাবে চলিতেছে যেন যুদ্ধ ও তাণ্ডব নৃত্য হইতেছে। গায়ের রংও লাল নাই, যেন কালো আভা পড়িয়াছে। কিছুক্ষণ পরে সে ভাব বদলাইয়া গেল, অন্য রকম হইতে লাগিল, চেহারাও একেবারে বদলাইয়া গেল। এক-একবার মনে হইতেছিল যেন সমস্ত শরীর দিয়া আরতি করিতেছেন। আরতির সঙ্গে সঙ্গে যেন শরীর আহুতি দিতেছেন। কত রকমই না হইতে লাগিল। শেষে বসিয়া পড়িলেন। বসিয়া আছেন, কিন্তু মনে হইতেছে কি যেন ভিতর ঠেলিয়া মুখ দিয়া বাহির হইবে, কিন্তু হইতেছিল না, আওয়াজ বাহির হইতেছিল না। কয়েকবার চেষ্টার পরই অপূর্ব্ব মন্ত্র ও স্তোত্র বাহির হইতে লাগিল। কি সুন্দর সে ধ্বনি, আর উচ্চারণই বা কি সুন্দর ও পরিষ্কার, কিন্তু সে ভাষা কেহই বুঝিতেছে না—কয়েকটা বীজ মন্ত্রের মত শুনাইতেছে, আর কিছুই বোঝা যায় না। অনর্গল স্তোত্র বাহির হইয়া যাইতেছে। আবার ধীরে ধীরে স্তোত্র বন্ধ হইয়া আসিল। ক্রমে ক্রমে মা নীরব হইয়া স্থিরভাবে বসিয়া রহিলেন ও কিছুক্ষণ পর শুইয়া পড়িলেন। এদিকে অনেক রাত্রি হইয়া যাওয়ায় উপবাসী সব ভক্তেরা প্রসাদ পাইবে বলিয়া ভোলানাথ মাকে উঠাইবার অনেক চেষ্টা করিতেছেন, কিন্তু মা উঠিতে পারিতেছেন না। অস্পষ্ট ভাবে বলিতেছেন, "উঠিতে পারি না, শরীর অবশ।" আমরা আবার সমস্ত শরীর হাত দিয়া ঘষিয়া দিতে দিতে অনেকক্ষণ পর উঠিয়া বসিয়াছেন। কাপড় ঠিক করিতে চেষ্টা

করিতেছেন, কিন্তু হাত ঠিক নাই, পারিতেছেন না। এই জন্য নিজেই আবার শিশুর মত হাসিতেছেন। চোখও ভাল খুলিতে পারিতেছেন না, কিন্তু মুখে হাসিটুকু লাগিয়া আছে। ভাবে মুখ উজ্জ্বল, তার মধ্যে এই হাসিটুকুও খুবই মিষ্টি লাগিতেছিল।

কিছুক্ষণ পর মা উঠিয়া দাঁড়াইলেন—নিজের শুইবার ঘরের দিকে চলিলেন, সেই ঘরে ভোগের সব প্রস্তুত। মা ও ভোলানাথ ঘরে গেলেন, ধূপ দীপ জ্বালাইয়া দেওয়া হইল, দরজা বন্ধ করিয়া দেওয়া হইল। ভোগ নিবেদন হইল, তাঁহারা বাহিরে আসিলেন। বহু লোক প্রসাদ পাইবে, কাজেই নাচ ঘরে, যেখানে কীর্ত্তন হইয়াছিল সেই ঘরে, খাবার জায়গা করা হইল। মা ভোলানাথকে বলিলেন, "তুমি এঁদের সকলকে নিয়া বস, আমি ও খুকুনী পরিবেশন করিব, পরে আমরা খাইব।" মার আদেশ, কাজেই সকলেই বসিয়া পড়িলেন।

একটী ঘটনা।

এর মধ্যে একটী ঘটনা হইয়া গিয়াছে। মা যখন কীর্ত্তনের মধ্যে বসিয়াছিলেন তখন স্ত্রীলোকেরা সব মাকে ঘেরিয়া বসিয়াছিলেন—মার কাছে বলিয়া কাহারই সঙ্কোচ ছিল না। কিছু দূরে একটী লোক দাঁড়াইয়াছিল, আর কেহই তাহা বড় লক্ষ্য করেন নাই, কিন্তু ঘোমটার মধ্য হইতেও মার দৃষ্টি তার দিকে গিয়া স্থির হইয়া ছিল। ক্রমে ক্রমে দৃষ্টি এত তীব্র হইয়া উঠিল যে লোকটী আর চাহিতে না পারিয়া মাটির দিকে চক্ষু নামাইয়া লইল। মার

তীব্র দৃষ্টি শান্ত হইয়া গেল। মা একটু হাসিয়া ঐ লোকটীকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়া উঠিলেন, "এই সব মেয়েরা আজ আমাকে উপলক্ষ্য করিয়াই সকলের সামনে বাহির হইয়াছে, তুমি এদের কাহারও দিকে চাহিতে পারিবে না। শুধু আমার দিকে চাহিতে পার, তাতে আমার কিছুই হইবে না, কিন্তু সাবধান, আর কাহারও দিকে চাহিও না।" এ কথার অর্থ কেহই কিছু বুঝিল না। তখন সেখানে নূতন নূতন লোক আসিয়াছে, কেহ কাহাকেও বড় চিনে না। তার মধ্যে একজন ভদ্র লোককে মা এই ভাবে বলায় সকলেই ভাবিল এ আবার কি ব্যাপার। তারপর কীর্ত্তনাদিতে ও খাওয়ার যোগাড় করিতে ব্যস্ত থাকায় কেহ সে কথা বড় লক্ষ্য করিল না। যখন সকলে খাইতে বসিবে তখন দেখা গেল ঐ ভদ্রলোকটি খাইতে বসিতেছেন না। মা ও আমি পরিবেশন করিতে লাগিলাম। মাও কোমরে কাপড় জড়াইয়া নিয়াছেন, এখন যেন আবার আর এক মূর্ত্তি। ঐ ভদ্রলোকটী বসিতেছেন না দেখিয়া সকলে তাঁহাকে বসিতে অনুরোধ করিতেছেন। তিনি বলিলেন,—"আমি খাইব না, মা আমার উপর রাগ করিয়া-ছেন।" মা তখন নিকটেই পরিবেশন করিতেছিলেন। মাথা না উঠাইয়াই এক জনের পাতে খিচুড়ী দিতে দিতেই যেন আপন মনে বলিয়া উঠিলেন, "মা কাহারও উপর রাগ করে না।" ঐ লোকটীও ইহা শুনিলেন। সকলের কথায় এবার তিনি খাইতে বসিলেন, কিন্তু বেশী কিছু খাইতে পারিলেন না।

রাত্রি প্রায় দ্বিপ্রহরের সময় সকলের খাওয়া দাওয়া হইয়া গেলে আমি ও মা একসঙ্গে খাইতে বসিলাম। ভোলানাথ মাকে বলিলেন, "আমি বলিতেছি আজ ভাল ভাবে সব খাও"। মাও নিজের নিয়ম মত না খাইয়া কিছু খাইলেন। ঐ লোকটীর দিকে ঐরূপ তীব্র দৃষ্টির কথা উঠিল। মা শুধু বলিলেন, "দেখ, আমি যে নিজে ইচ্ছা করিয়া বা রাগ করিয়া ওভাবে তাকাই তা মোটেই নয়। এক একজনের ভিতরের ভাবেই তার দিকে ওরূপ দৃষ্টি পড়ে, সে ভয় পাইয়া যায়, আর মনে করে আমি রাগ করিয়া ওভাবে চাহিয়াছি। কিন্তু আমার ভিতরে রাগের ভাব মোটেই থাকে না, দৃষ্টি কখনও কখনও ওরূপ হইয়া যায়।" এই প্রকার নানা কথার পর আমরা নমস্কার করিয়া বিদায় হইলাম। মাও বিশ্রাম করিতে লাগিলেন।

পরদিন গিয়া শুনি মা রাত্রিতে কিছুক্ষণ বিছানায় থাকিয়াই মাটিতে নামিয়া বসিয়াছিলেন। অনেক সময়েই এইভাবে থাকেন, কখনও হয়ত মাটিতে উপুড় হইয়া (নমস্কার করিবার মত) পড়িয়া থাকেন, বহুক্ষণ কাটিয়া যায়। দিন-রাত্রি বলিয়া কোন সময় অসময় মার নাই। রাত্রিতে শুইতে হইবে ও দিনে উঠিতে হইবে এমন কিছু নিয়ম দেখিতেছি না, যখন শরীরে যে ভাব হইয়া যাইতেছে তখন সে ভাবেই চলিতেছেন। তিনি বলিতেন, "তোমাদের যেমন সকাল দুপুর সন্ধ্যা রাত্রি এই প্রকার ভিন্ন ভিন্ন সময়ের একটা উপলব্ধি হয়, ভাবে

পরিবর্ত্তন হয়, আমি তাহা কিছু বুঝি না, সব সময়ই যেন একেবারে একরকম, কোনই প্রভেদ বুঝি না।" আজ ভোর রাত্রিতেই মাটিতে নামিয়া, চোখ বুজিয়াই চৌকীর উপর মাথা দিয়া বসিয়া আছেন। এ দিকে ভোর বেলায় ঐ ভদ্রলোকটী আসিয়া মাকে প্রণাম করিয়া মার কিছু দূরে মাথা নামাইয়া বসিয়া আছেন। মার উঠিতে বিলম্ব দেখিয়া ভোলানাথকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মা কখন উঠিবেন?" ভোলানাথ মাকে ডাকিয়া ডাকিয়া উঠাইয়া বসাইলেন। মা সেই ভদ্রলোকটীর দিকে আবার চাহিলেন। ভদ্রলোকটী আবার প্রণাম করিয়া ভোলানাথকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কাল মা আমার দিকে কেন ঐ ভাবে চাহিয়াছিলেন এবং আমাকে ঐ সব কথা কেন বলিয়াছিলেন তাহাই জিজ্ঞাসা করিতে আসিয়াছি।" মা কি উত্তর দিলেন ঠিক মনে নাই। শুনিয়া ঐ ভদ্রলোকটী মার কাছে নিজের জীবনের সব কথা খুলিয়া বলিতে লাগিলেন। নিজের ভাবের কথাও বলিতে লাগিলেন। তিনি যাহা বলিলেন তাহার সারাংশ এই—কোন স্ত্রীলোকের উপর তাঁহার মাতৃভাব জাগে না, শুধু সখী-ভাব জাগে। তিনি শিক্ষিত, কিন্তু, কিছুতেই তাঁহার এই স্বভাবের পরিবর্ত্তন হইতেছে না। বাড়ীতে বড় ভাইদের কাছে এজন্যও এখনও অনেক অত্যাচার সহ্য করিতে হয়, কিন্তু উপায় কি? মাতৃভাব ত তাহার ভিতরে আসেই না। তিনি ইহাও বলিলেন, "আজ প্রথম আপনাকে 'মা' বলিয়া ডাকিলাম ও প্রণাম করিলাম। এখন

পর্য্যন্ত কাহাকেও মা বলিয়া ডাকিতে পারি নাই।" মা তাঁহাকে কিছু উপদেশ দিলেন ও বলিয়া দিলেন, "রোজ একবার এখানে আসিও। কোন স্ত্রীলোকের মুখের দিকে চাহিতে পারিবে না, পায়ের দিকে চাহিবে।" এক একদিন দেখিতাম মার কাছে হয়ত তিনি বসিয়া আছেন, অন্য স্ত্রীলোক ঘরে যাইতেই সর্ব্বদাই কাপড়-ঢাকা দিয়া মাথা গুঁজিয়া বসিতেন। মা যাইতে আদেশ করিলে কিছু প্রসাদ নিয়া চলিয়া যাইতেন। পরে শুনিয়াছি এই লোকটীর চরিত্রের পরিবর্ত্তন হইয়া গিয়াছে। তিনি এখন ভাল ভাবেই পরিবার নিয়া চাকুরী করিয়া দিনাতিপাত করিতেছেন।

শাহবাগে নিয়মিত কীর্ত্তনের আদেশ।

খোল করতাল তখনও শাহবাগেই পড়িয়া আছে। একদিন সন্ধ্যার সময় মা বলিলেন, "রোজ সন্ধ্যার সময় একটু একটু নাম হইলে মন্দ কি? খোল করতাল ত আছেই।" এই কথা বলায় ভোলানাথকে সঙ্গে লইয়া আশু, অমূল্য প্রভৃতি সকলেই সেদিন সন্ধ্যা বেলায় কীর্ত্তন করিতে বসিয়া গেল। মাও বসিয়াছেন, আমরাও বসিয়াছি,—একটু কীর্ত্তন হইল। ধীরে ধীরে আরও দুই চারিজন লোক সন্ধ্যা বেলায় আসিতে লাগিলেন, তাঁহারাও কীর্ত্তনে যোগ দিলেন। ভোলানাথ গান না জানিলেও খুব আনন্দের সহিত জোরে জোরে নাম করিতেন। এই ভাবে প্রত্যহ কিছুক্ষণ কীর্ত্তন হইতে আরম্ভ হইল। আমি বাতাসা নিয়া আসিতাম, তাহা

দিয়া লুট হইত। প্রতিদিনই কীর্ত্তনে মার একটু একটু ঐরূপ ভাব হইত, কোন দিন খুব বেশী হইত। মাঝে মাঝে স্তোত্রাদিও মুখ হইতে বাহির হইত, কিন্তু কেহই সে ভাষার অর্থ বুঝিতে পারিত না।

সংক্রান্তি দিবস মার ঐ অবস্থা হওয়ার পর মাকে দর্শন করিতে বহুলোক আসিতে লাগিল। অনেকে ভোগও দিত। মাও রান্না করিতেন, পরে যে উপস্থিত হইত প্রসাদ নিয়া যাইত। মার নিয়ম ছিল, যে দিন যে যাহা নিয়া আসিবে (কাঁচা লঙ্কা পর্য্যন্ত) সেই দিনই তাহা পাক হইয়া বিলি হইয়া যাওয়া চাই—ঘরে কিছু থাকিতে পারিবে না। আর খাওয়ার লোকও ঠিক সময়ে জুটিয়া যাইত। ইহার পর মা তিনটী ভাত খাইতে আরম্ভ করিলেন।

মার ভোগ।

প্রমথবাবু বদলী হইয়া যাইতেছেন—তিনি মার হাতের রান্না খাইয়া যাইবেন বলিয়া মার বাড়ীতে নানা জিনিষ পাঠাইয়াছেন। ভোলানাথ গিয়া আমাদের প্রসাদ নিবার জন্য বলিয়া আসিলেন। রাত্রিতে ভোগ হইবে। বাবা বহুবৎসর যাবৎ রাত্রিতে একটু দুধ-মিষ্টি খান, অন্য কিছু খাইলে অসুখ হয়। মা ইহা শুনিয়াছেন, তাই বলিয়া পাঠাইলেন, “বাবা যেন দিনে একটু দুধ-ফল খাইয়া থাকেন, তবে রাত্রিতে খাইলে আর অসুখ করিবে না।” মার আদেশে তাই করা হইল। দুপুরেই আমরা আসিলাম। মা রান্নার যোগাড় করিতেছেন, চিংড়ি

মাছের চপ কাটলেট্ ইত্যাদি করিবেন। আমি সঙ্গে সঙ্গে সাহায্য করিতেছি। দেখিলাম মা কোন বিষয়েই অপটু নন। এ কাজও অতি নিপুণভাবেই করিতেছেন। কাজ কর্ম্ম খুব পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ভাবে ও তাড়াতাড়ি করিতেন। রান্না হইয়া গিয়াছে, আগুনের তাতে মার মুখখানি লাল হইয়াছে, কিন্তু মুখে হাসিটুকু লাগিয়াই আছে। সন্ধ্যা হইতেই ভোগ হইল। ভোলানাথ, প্রমথবাবু, বাবা এবং আরও দুই চারিজন আহারে বসিলেন। মা পরে খাইবেন বলিয়াছেন। মা ও আমি পরিবেশন করিতেছি। সবটাতেই মার এক এক নূতন রূপ দেখিতেছি। এখন দেখিয়া মনে হয় না ইনিই কীর্ত্তনের সময় ঐরূপ ধরিয়াছিলেন। অবশ্য লক্ষ্য করিলেই চোখ দুটার অস্বাভাবিক ভাব এই কাজ কর্ম্মের মধ্যেও ধরা যাইত। কথা বেশী সময় অস্পষ্ট থাকিত—কিছুক্ষণ কথা বলিতে বলিতে তবে কিছু পরিষ্কার হইত। নতুবা চুপ করিয়া রান্না করিতেন পরিবেশন করিতেন, মুখে কথা নাই, অথচ হাতে খুব কাজ করিতেন। তখন যদি কোন কথা বলিতে আরম্ভ করিতেন, দেখিতাম কথা বাহির হইতেছে না। একটু চুপ করিলেই কথা জড়াইয়া যাইত। আর যদি কাজ কর্ম্ম না করিয়া চুপ করিয়া বসিতেন এমনি চোখ বুজিয়া যাইত যে, ঢুলিতে থাকিতেন কিংবা একেবারে শুইয়া পড়িতেন,—এমন ভাব হইয়া যাইত, উঠানো মুস্কিল। শুধু কীর্ত্তন বলিয়া নহে, যখন তখনই এই প্রকার ভাব হইত। তবে কীর্ত্তনে বেশী হইত ও নানারকমের

শারীরিক ক্রিয়া হইত। সকলের খাওয়া দাওয়া হইয়া গিয়াছে। মা সর্ব্বদাই ভোলানাথের পাতেই বসিতেন। আজ আমি ও মা এক সঙ্গে বসিলাম। খাওয়া দাওয়ার পর মার কাছে একটু বসিয়া আমরা সকলেই বাসায় চলিয়া গেলাম।

৺সরস্বতী পূজা আসিল—মেডিকেল স্কুলের ছেলেরা কাঙ্গালী ভোজন করাইবে ও কীর্ত্তন করিবে, মাকে নিতে চাহিল।

কাঙ্গালী ভোজন ও দরিদ্র নারায়ণের সেবা—১৯শে ফাল্গুন, ১৩৩২।

কিন্তু বাবা নিষেধ করিয়া দিলেন। সাধারণতঃ কীর্ত্তন হইলেই মার ঐরূপ ভাব হয়। স্কুলের ভিতরও যদি ঐরূপ হয় তখন বাহিরের যে সব লোক সেখানে থাকিবে তাহারা সকলে ঐ ভাবটা ধরিতে পারিবে না, কি জানি কে কি চক্ষে দেখিবে, কি বলিবে, মা এখনও ঘোমটা দিয়া থাকেন—এই সব ভাবিয়া নিষেধ করিয়া দেওয়া হইল। শাহবাগেই কীর্ত্তন হয়, যে-যে উপস্থিত হয় দেখে। মা একবার বলিয়াছিলেন, "কাঙ্গালী ভোজনটা দেখিলে হইত।" এই কথায় আমার আগ্রহ হইল, গর্ভধারিণী মার মৃত্যু তিথি উপলক্ষ্যে কাঙ্গালী ভোজনের আয়োজন করিলাম। মাকে নিয়া যাইব এই আনন্দ।

বাগানের গাছ ইত্যাদি নষ্ট হইবে বলিয়া মালিকেরা শাহবাগে কাঙ্গালী ভোজন করিতে দিলেন না। ঘটনাচক্রে মেডিকেল স্কুলেই কাঙ্গালী ভোজনের আয়োজন করিতে হইল। প্রায় তিন হাজার লোকের খাওয়ার বন্দোবস্ত হইল। মার

ভক্তেরা ও স্কুলের ছাত্রেরাই সব বন্দোবস্ত করিল। আমরা মাকে ও ভোলানাথকে নিয়া কার্য্যের পূর্ব্বদিন রাত্রিতে সেখানে গেলাম। স্থির হইয়াছে রাত্রিতে ওখানে থাকা হইবে। মার আদেশ ছিল, দরিদ্র নারায়ণদের জন্য ভোর না হইলে পাক বসিতে পারিবে না, কারণ বাসি জিনিষ দেওয়া হইবে না। তরকারী কাটা হইতেছিল, মা বলিলেন, "আমরাও একটু তরকারী কাটিব। দরিদ্র নারায়ণের ভোগের কাজ করিতে হয়।" তাই হইল, উপরে বসিয়া আমরাও কিছু কিছু তরকারী কাটিলাম। পরদিন ভোরবেলা যাহাদের রান্না করিতে আসিবার কথা ছিল তাহারা আসে নাই। মথুরবাবু নামক মার এক ভক্ত (পুলিশে কাজ করিত) মাকে প্রণাম করিয়া বলিলেন—"পাচক ব্রাহ্মণ ত এখনও আসিল না; এদিকে ভোর হইয়া গিয়াছে।" মা বলিলেন, "চল, আমরা গিয়াই পাক বসাইয়া দিই।" মার কৃপায় কিছুক্ষণ পরে মথুরবাবু পাচক ব্রাহ্মণদের নিয়া হাজির হইলেন—আমাদের পাক বসাইবার দরকার হইল না। সারারাত্রি মা আমাদের কাহাকেও ঘুমাইতে দিলেন না, বলিলেন, "দরিদ্র-নারায়ণের সেবা করিবে আজ রাত্রি জাগিয়া থাক। সব কাজেরই পূর্ব্বে নিষ্ঠার সহিত সংযম করিতে হয়।" ভোরবেলা আমাকে বলিলেন, "এখন দরিদ্র-নারায়ণেরা যাহাতে তোমার কাছে উপস্থিত হন সেই জন্য তাঁহাদের উদ্দেশ্যে প্রার্থনা জানাও।" এই বলিয়াই আমাকে বলিলেন, "কি, নারায়ণেরা সব ঠিকমত আসিবে ত?" আমি

জানা সত্ত্বেও জবাব দিবার সময় কেমন ঠেকিয়া গেলাম, বলিলাম, "তোমার ইচ্ছা হইলে আসিবে।" মা তখনই বলিয়া উঠিলেন, "কেমন করিয়া বলিতেছে—গোলমাল বাধাইবে দেখিতেছি।"

যাহা হইবার হইবেই। দুপুরবেলা প্রায় ১১টা হইতে ছেলেরা কীর্ত্তন আরম্ভ করিল। সরস্বতী দেবীর মূর্ত্তি এখনও সেইখানেই আছে। মা হাসিয়া বলিলেন, "এই সরস্বতী পূজায় ছেলেরা আনিতে চাহিয়াছিল, মূর্ত্তি থাকিতে থাকিতেই আসা হইল।" কীর্ত্তন খুব জমিয়া উঠিল—মাও ভাবে বিভোর হইয়া পড়িয়াছেন। শরীরে কত রকমই না ক্রিয়া হইতেছে। আজও কিছুক্ষণ ঐরূপ উগ্রমূর্ত্তিতে উর্দ্ধ দৃষ্টিতে যেন খাঁড়া নিয়া কাহারও সহিত ভয়ানক যুদ্ধ হইতেছে এই ভাব আরম্ভ হইতেই জিহ্বা বাহির হইয়া পড়িল। মুহূর্ত্তের মধ্যেই আবার জিহ্বা ভিতরে চলিয়া গেল, ভাবের পরিবর্ত্তন হইল—মা ভাবে ঢল-ঢল শান্তমূর্ত্তি ধারণ করিলেন। কখনও আসন করিয়া বসিয়া যেন পূজা করিতেছেন—নিজেকেই নিজে পূজা করিতেছেন, আবার নিজের পায়েই মাথা লুটাইয়া প্রণাম করিয়া একেবারে অসাড় হইয়া পড়িতেছেন; আবার কখনও দ্রুতভাবে ঘুরিতে ঘুরিতে মাটিতে গড়াগড়ি দিতে দিতে স্থির ভাবে চিৎ হইয়া শুইয়া পড়িতেছেন—নাভি হইতে কণ্ঠ পর্য্যন্ত এমন শ্বাস চলিতেছে যেন ঢেউ খেলিতেছে; আবার কখনও অসাড় হইয়া পড়িয়াছেন, আমি কোলে করিয়া বসিয়া আছি,

সমস্ত শরীর পাথরের মত ঠাণ্ডা হইয়া গিয়াছে, একটু স্থির হইয়া আসিতেই মুখ দিয়া অসম্ভব রকমের লাল বাহির হইতে লাগিল, আমার সমস্ত কাপড় ভিজিয়া গেল ; কখনও চোখ দিয়া এত জল পড়িতেছে, কাপড় জামা সব ভিজিয়া যাইতেছে; কখনও আবার একেবারে মৃতের অবস্থা, আঙ্গুলের নখ সব কালো হইয়া গিয়াছে। মুখ মৃতের মুখের মত ফ্যাকাশে হইয়া গিয়াছে। নাড়ীর গতিও আছে কি নাই বোঝা যায় না। শ্বাসের লক্ষণ মোটেই নাই। আমরা ভয়ে অস্থির, কিন্তু মা পূর্ব্বেই বলিয়াছিলেন, "তোমরা নাম করিবে, যাহা ঠিক হইবার হয় তাহাতেই হইবে।" তাই আমরা মার এই অবস্থা হইলেই শুধু নাম করিতাম। ভোলানাথও খুব নাম করিতেন। এই কীর্ত্তন দোতলায় হইতেছিল। এই সময় বাবা নীচে পাকের স্থানে দাঁড়াইয়াছিলেন। একজন গিয়া বাবাকে বলিল, "উপরে গিয়া দেখুন মার কি চমৎকার ভাব হইয়াছে।" বাবা দৌড়াইয়া উপরে গেলেন, কিন্তু গিয়া দেখেন মা বসিয়া পড়িয়াছেন, এলো মেলো চুল, মাথা নীচু করিয়া বসিয়া আছেন। বাবা গিয়া বড়ই দুঃখের সহিত মনে মনে বলিলেন, "মা, আজ আমিই ঠকিলাম—তোমার ঐ রূপ দর্শন হইল না।" এই ভাবিয়া জপ করিতে বসিয়া গেলেন। একটু পরে চোখ হঠাৎ খুলিয়া গেল,—মার দিকে চাহিয়া দেখেন মার মুখের রঙ গভীর কৃষ্ণবর্ণ, ঠোঁট দুইটী লাল, জিহ্বা বাহির-করা দেখেন নাই। বাবা বলিয়াছেন, "আঁ

চোখ ঘসিয়া ঘসিয়া ভাল করিয়া দুই তিনবার দেখিলাম, ভাবিলাম চোখের ভ্রম নাকি? কিন্তু তা নয়, আমি পরিষ্কার ঐ রূপই দেখিলাম। খানিক পর সেই রঙের পরিবর্ত্তন হইয়া গেল—স্বাভাবিক গৌরবর্ণ হইয়া গেল।" মা কিছুক্ষণ পর শুইয়া পড়িলেন। আবার উঠিয়া বসিতেই সেইরূপ অনর্গল স্তোত্রাদি হইতে লাগিল। কিছুক্ষণ পর লুট দেওয়া হইল। মাও একটু সুস্থির ভাবে শুইয়া পড়িলেন। বেলা তিনটা বাজে-বাজে, অনেক চেষ্টায় মাকে উঠান হইল। এদিকে দরিদ্র নারায়ণদের ভোজনে বসান হইবে। মা উঠিলেন, কিছু সুস্থ হইয়াছেন, কাঙ্গালী কত হইয়াছে জানালা দিয়া দেখিয়া বলিলেন, "কৈ, বেশী ত দেখিতেছি না। তিন হাজারের বন্দোবস্ত, অর্দ্ধেক হইবে কি না সন্দেহ। সকালেই বলিয়াছি আজ গোলমাল করিবে।" নীচে যেখানে সব রান্না করিয়া রাখা হইয়াছে, মাকে সেই ঘরে লইয়া যাওয়া হইল। আজ আর বিশেষ ভাবে ভোগ দেওয়া যাইবে না, মাকে দর্শন করাইয়া পরে প্রসাদ বিতরণ হইবে, এই জন্য বাবা মাকে নীচে নিয়া গিয়াছেন। মা আমার কাঁধে হাত দিয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া সব দেখিতেছেন। ঘোমটার ভিতর হইতে যে ভাবে দৃষ্টি করিলেন আজও তাহা আমার মনে আছে। কেমন যেন চোখ ঘুরাইয়া সমস্ত জিনিষ একেবারেই দেখিয়া লইলেন। মা বলিলেন, "আমরাও একটু পরিবেশন করিব।" সকলে মার জয়ধ্বনি দিল। মা কোমরে কাপড় জড়াইয়া পরিবেশন করিলেন। একটী কুষ্ঠ রোগী আসিয়াছে, মা তাহাকে

বিশেষ যত্নের সহিত খাওয়াইলেন। পরে দরিদ্র নারায়ণদের উচ্ছিষ্ট উঠাইতে চাহিলেন, ভোলানাথ নিষেধ করায় তাহা আর করিলেন না। ভক্তেরা ও স্কুলের ছেলেরাই উচ্ছিষ্ট উঠাইল। অনেক ভদ্র মহিলা ঐ কার্য্য দেখিতে গিয়াছিলেন। মা বলিলেন, আজ আমরা সকলেই দরিদ্র, সকলেই এই প্রসাদ পাইব।" তাই হইল—সকলেই ঐখানেই প্রসাদ পাইতে বসিয়া গেলেন। ধনী, গরীব বিচার রহিল না। দরিদ্র নারায়ণেরা ভোজনে বসিয়াছেন, ভয়ানক অন্ধকার করিয়া বৃষ্টি আসিল, মাঠের মধ্যে সব বসিয়াছে, মা হঠাৎ ঘর হইতে বাহির হইয়া গেলেন, মাঠের একধারে গিয়া হাঁটীতে আরম্ভ করিলেন। সকলে ভোজন শেষ হইলে উঠিয়া গেল, মাও ঘরের ভিতর আসিয়া বসিলেন। তাহার পর বেগে বৃষ্টি আসিল। বুঝিলাম বৃষ্টির দরুণ সকলের খাওয়া নষ্ট না হয় এই জন্যই মা বাহিরে গিয়া হাঁটিতেছিলেন। পরে এইরূপ আরও তুই একবার দেখিয়াছি। রাত্রিতে অপর একটী ভদ্রলোকের উপর সব ভার দিয়া মা সকলকে নিয়া যেখানে দরিদ্র ভোজন হইয়াছিল অন্ধকারে সেই মাঠের মধ্যে গিয়া খাইতে বসিলেন ও বলিলেন, "আজ আমরাও ভিখারী, আমাদের ভিক্ষা দাও।" যে ভদ্রলোকটী ভার নিয়াছেন তিনি তাড়াতাড়ি খাবার আনিয়া মাকে পরিবেশন করিতেছেন। সকলেই চারিদিকে বসিয়া গেল। মা আলো আনিতে দিলেন না, বলিলেন, "ভিখারীরা কি আলো জ্বালিয়া খাইতে পারে?" খাওয়া দাওয়ার পর ধীরে ধীরে সকলে

বিদায় নিলেন। অবশেষে মাও আমাদের নিয়া চলিয়া আসিলেন। অনেক জিনিষ বেশী হইল। পরদিন বিলি হইবে। মা বলিয়া আসিলেন, "কাল আর আমি আসিব না।" রাত্রিতে টিকাটুলিতে আসিয়া পরে শাহবাগে চলিয়া গেলেন।

এদিকে এই দরিদ্র ভোজনের সময় একটী ছেলে মাকে দেখিয়া কেমন হইয়া গিয়াছিল; সে ঢাকায় আইন পড়িত— মেডিকেল স্কুলের নিকটেই একটা মেসে থাকিত। পরে শুনিলাম, সে সেইদিন রাত্রি হইতেই মাকে পাইবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিল, পরদিন ভোরে একবার নিজের কোঠার দরজা খুলিয়া কিছু ফুল তুলিয়া নিয়া পুনরায় দরজা বন্ধ করিয়া সারাদিন বসিয়া বসিয়া একান্ত মনে মাকে ডাকিতে লাগিল। তার মনে বিশ্বাস ছিল মা এই ডাকে নিশ্চয়ই তার ঘরে আসিবেন এবং তখন সে ফুলগুলি মার পায়ে দিবে। সে সারাদিন না খাইয়া দরজা বন্ধ করিয়া রহিল। বন্ধুবান্ধবেরা কেহই মা কোথায় থাকেন তাহা জানিত না। মেডিকেল স্কুলে জিজ্ঞাসা করিয়া ছেলেদের কাছে শুধু এই খবর পাইল—"এই মাতাজী শশাঙ্ক বাবুর গুরু-মা, শশাঙ্কবাবুরা রোজই সেখানে যান।" বাস্তবিক মা কাহাকেও দীক্ষা দেন না। ছেলেরা আমাদের বাসায় আসিয়া উপস্থিত হইল ও বাবার কাছে শাহবাগের খবর নিয়া সন্ধ্যার সময় অনাথকে নিয়া শাহবাগে গেল। আমরাও শাহবাগে গেলাম। ছেলেটী মাকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিয়া

অনাথের কথা।

পড়িয়াই থাকিল। এদিকে শুনিলাম দুপুরবেলা হইতেই মা বাহিরে যাইবার জন্য ছট্‌ফট্‌ করিতেছিলেন, মেডিকেল স্কুলের দিকে যাইবেন এই ভাব জাগিয়াছিল। কিন্তু পূর্ব্বের দিন বলিয়া আসিয়াছিলেন, "কাল আর এদিকে আসিব না, তোমরাই ভার নিয়াছ, তোমরাই সব বিলি করিয়া দিও"— এই জন্য রাত্রি প্রভাত হইলেই ওদিকে যাইবার প্রতীক্ষায় ছিলেন। মা বলিলেন, "আমি ত নিজে ইচ্ছা করিয়া কিছু করি না, কিন্তু ঐ দিকে যাইবার জন্য কেমন একটা বিশেষ ভাব জাগিয়াছিল।" এদিকে বন্ধুবান্ধবেরা জোর করিয়া দরজা খোলাইয়া অনাথকে নিয়া মার কাছে উপস্থিত করিয়াছে। সব ঘটনা শুনিয়া আমরা ত অবাক। কীর্ত্তনাদি হইল। কিন্তু অনাথ তখনও মায়ের পায়ের ধূলা লইবার জন্য পড়িয়াছিল। মা কাহাকেও পা ছুঁইতে দিতেন না। বহুক্ষণ কাটিয়া গেল, অনেক রাত্রি হইয়া পড়িল। মা তখনও ঘোমটা দিয়া বসিয়াই আছেন। উপায়ান্তর না দেখিয়া ভোলানাথ মাকে বলিলেন,— "এই ছেলেটী যখন এইভাবে সারাদিন তোমার জন্যই ব্যাকুল হইয়া আছে তখন আজ ইহাকে পায়ের ধূলা দাও।" ভোলানাথের আদেশ মা যে রকমেই হউক রক্ষা করিতে চেষ্টা করিতেন। ঐ দিনও ভোলানাথ পুনঃ পুনঃ ঐ ভাবে বলিতেছিলেন, কিন্তু মা স্থির হইয়া বসিয়াই রহিলেন। কিছুক্ষণ পর মা ধীরে ধীরে উঠিয়া দাঁড়াইলেন, মুখখানি যেন রক্তবর্ণ, পায়ের শুধু বৃদ্ধাঙ্গুলির উপর ভর করিয়া দাঁড়াইলেন।

ভোলানাথের ইঙ্গিতে অনাথ এবং তৎপর সকলেই মায়ের চরণ-ধূলা পাইয়া কৃতার্থ হইল। তখন অনাথের কত আনন্দ। মা ও ভোলানাথ আহার করিতে গেলেন। অনাথ বসিয়া আছে, ইচ্ছা ছিল সে মার পাতের প্রসাদ নিয়া যাইবে। মা তাহাও বড় কাহাকেও দিতেন না। কিন্তু অনাথের তখন সর্ব্ব কর্ম্মেই সিদ্ধি। একখানা ছোট রূপার থালায় করিয়া সমস্ত তরকারী দিয়া আমাকে দিয়া ভাত মাখাইলেন, পরে মাথায় বেশ ঘোমটা দিয়া অন্নপূর্ণা নিজেই প্রসাদ বিতরণ করিতে গেলেন। এক এক গ্রাস তুলিয়া হাত এক জায়গায়ই স্থিরভাবে ধরিয়া আছেন, প্রথমে অনাথ, পরে সকলেই ধীরে ধীরে মার হাতের নীচে হাত পাতিতেছেন, মা গ্রাসটী ফেলিয়া দিতেছেন, আবার এক গ্রাস তুলিতেছেন। এই ভাবে অনাথের জন্যই সে দিন সকলে মার পায়ের ধূলা ও প্রসাদ পাইয়া ধন্য হইল। পরে সকলে মাকে প্রণাম করিয়া বিদায় নিল। সম্ভবতঃ অনাথ সেদিন ঐখানেই ছিল, পরদিন দুপুরবেলা সে আবার মায়ের পায়ের ধূলা লইয়াছিল। নিয়ম হইল মাসে এই দুই তারিখে, যে দুই সময়ে অনাথ পায়ের ধূলা লইয়াছিল সেই দুই তারিখে নির্দ্দিষ্ট ঐ দুই সময়ে, পাঁচ মিনিটের জন্য সকলেই মার পায়ের ধূলা পাইবেন। পরের মাসে ভক্তেরা সকলে এই কথা জানিতে পারিয়া নির্দ্দিষ্ট তারিখে ঐ সময়ে উপস্থিত হইলেন। মা বসিয়া আছেন, ঘোমটা দিয়া বসিয়া ঢুলিতেছেন। সকলে ঘড়ি দেখিতেছেন,

মা কিন্তু চোখ বুজিয়া বসিয়া আছেন। কিন্তু ঠিক সময় হওয়া মাত্রই উঠিয়া দাঁড়াইলেন, তাড়াতাড়ি করিয়া একে একে সকলে চরণধূলা লইতেছে, মা চোখ বুজিয়া হাত জোড় করিয়া দাঁড়াইয়া আছেন, কাঁটায় ঠিক ২-১০ মিনিট হওয়া মাত্রই মা বসিয়া পড়িয়া মাটিতে লুটাইয়া প্রণাম করিলেন। কিন্তু এই নিয়ম এই মাসেই মাত্র তুই দিন ছিল, তার পর বন্ধ হইয়া গেল।

তারপর হইতেই অনাথ ও মেডিকেল স্কুলের আরও কয়েকটী ছেলে আসা যাওয়া করিত। ধীরে ধীরে সীতানাথ, সুবোধ, জটু, পোষ্টমাষ্টার সুরেনবাবু, গিরিজাবাবু, বিনয়বাবু, কেদার মাষ্টার প্রভৃতি অনেকেই আসিতে লাগিলেন, কীর্ত্তনও খুব সুন্দর ভাবে হইতে লাগিল।

একদিন মা নিজের পূর্ব্ব জীবনের কথা বলিতে বলিতে বলিতেছেন, "কত রকম যে অবস্থা গিয়াছে, তাহার অন্ত নাই। কিন্তু কোনটাই বেশী দিন চলিত না ; যেন একটার পর একটা শরীরের উপর দিয়া চলিয়া গিয়াছে। প্রাতঃস্নান কিছুদিন করিয়াছেন, পরান্ন-ভোজন কিছুদিন বাদ গিয়াছে, আচার নিষ্ঠার দিকে কিছুদিন ভয়ানক ঝোঁক ছিল। বলিতেন—"যে ঘরে বসিয়া এ সব ক্রিয়া হইত সেই ঘরের বাহিরের চারিদিকে প্রায় তুই হাত পর্য্যন্ত স্থান এত পরিষ্কার রাখিতাম যেন একগাছি কাঠির সঙ্গেও ঘর ছোঁয়া না থাকে। ধুপতি নিয়া চারিদিক ঘুরিয়া আসিতাম।" আরও বলিতেন,—"দিন রাত্রি যে কো

মার স্ব-বর্ণিত পূর্ব্বাবস্থার ইতিহাস

দিয়া চলিয়া যাইত তাহা বুঝিতাম না।" ভোলানাথের সেবাটুকু ঠিক করিয়া রাখিয়া গিয়া বসিতেন—খাওয়াদাওয়া (দিনের খাওয়া) হয়ত কোন কোন দিন ভোর রাত্রিতে হইত কোন কোন দিন হইতও না, কোন প্রকারে ছোঁয়া গেলেই কেমন অবস্থা হইয়া যাইত। বলিতেন, "আমি চৌকির উপর বসিয়া আছি, পিছন দিক হয়ত কাহারও কাপড়খানি চৌকীতে লাগিয়াছে, অমনি শরীর ঢলিয়া যাইত। আমি দেখিও নাই, কিন্তু শরীরের অবস্থায় বুঝিতাম কাহারও সহিত ছোঁয়া গিয়াছে।" আবার কি ভাবে এই নিয়ম ভাঙ্গিল সেই কথাও বলিতেন,— "একটী মেয়ের বিবাহে তাহাকে সিন্দূর দিয়া দিতে গেলাম, সিন্দূর পরাইয়া দিলাম। এই হইতেই আবার সকলকে ছুঁইতে পারি।" বলিতেন, "বাজিতপুরে এই অবস্থা হওয়ার পূর্ব্বে আমাকে সকলেই খুব ভালবাসিত, সর্ব্বদাই আমার কাছে আসিত। কিন্তু এই অবস্থা আরম্ভ হইলে আমাকে ভুতে পাইয়াছে ভাবিয়া সকলে আসা বন্ধ করিল। ভালই হইল, আমিও একান্ত পাইয়া আপন মনে বসিয়া ডাকিতাম। সবই যেন ঠিক ঠিক মত হইয়া গিয়াছে।" শিশুকালের কথায় একদিন বলিলেন, "ছোটবেলায় ভাত খাইতে বসাইলেই আমি অন্যমনস্ক হইয়া যাইতাম, মা আমাকে ধাক্কা দিয়া মন্দ বলিতেন, বলিতেন, 'খাইতে বসিয়া খাওয়ার দিকে লক্ষ্য নাই, উপর দিকে চাহিয়া আছে।' আমি কিছু বলিতে পারিতাম না। এখন বলিতে পারিতেছি, তাই বলিতেছি আমি দেখিতাম কত দেব-দেবীর মূর্ত্তি আসিতেছে, যাইতেছে।" একদিন হাসিয়া হাসিয়া

বলিলেন,—"ছোট বেলায় সকলেই আমাকে 'সোজা' বলিত, বিশেষতঃ মা সর্ব্বদাই বলিত, "এটা একেবারে সোজা, কিছুই বুদ্ধিশুদ্ধি নাই।" আমি একদিন এক কলসী জল পুকুর হইতে নিয়া কাঁখে করিয়া বাঁকা হইয়া দাঁড়াইয়া মাকে বলিলাম, তোমরা যে সকলে আমাকে 'সোজা' বল, এইত আমি বাঁকা হইয়াছি।' এই কথা শুনিয়া আমরা সকলেই হাসিয়া উঠিলাম, মাও হাসিতে লাগিলেন। আমি হাসিয়া বলিতাম, "এখন তোমার মা দেখিতেছেন সেই 'সোজা' মেয়েটী কি ভাবে এতগুলি লোককে পাগল করিয়া তুলিয়াছে।"

অপরের রোগ আকর্ষণ।

একদিন গিয়া দেখি মার হঠাৎ ভয়ানক সর্দ্দি হইয়াছে। পরে এর কারণ জানিতে পারিলাম। শুনিলাম প্রমথবাবুর ছেলে প্রতুল নাকি মাকে বলিয়াছিল, "আমার সর্দ্দি বোধ হইতেছে, পরীক্ষা আসিয়াছে, দেখিও পরীক্ষার সময় যেন সর্দ্দি না থাকে।" এই কথার ফলে তাহার সর্দ্দি কমিয়া গেল ও তার পরীক্ষার সময়ে মার সর্দ্দি হইল।

মৌন গ্রহণ ও ভঙ্গের প্রক্রিয়া।

একদিন প্রমথবাবুর স্ত্রী মাকে বলিলেন, "মা, আমি সোমবার মৌনী থাকিব।" মা অনেককেই কিছু সময় মৌনী থাকিতে বলিতেন। এই কথায় মা বলিলেন, "বেশ ত, তাই থাকিও।" এদিকে প্রমথবাবু মাকে বলিলেন, "মা, আমার স্ত্রী যে আমার আগে চলিয়া যাইবেন তাহা হইবে না—উনি সোমবার মৌনী থাকিবেন, আমি তার পূর্ব্বদিন রবিবার মৌনী থাকিব।" মা

তাহাতেও মত দিলেন। তিনি বেশ ভক্তিমান লোক ছিলেন। গত পৌষ-সংক্রান্তির দিন রাত্রিতে কীর্ত্তনে ভাবে বিভোর হইয়া দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া নাচিতেছিলেন। তিনি মার কাছে আসিয়া চুপ করিয়া বসিয়া নাম করিতেন ও প্রণাম করিয়া উঠিয়া যাইতেন,—এই তাঁর প্রতিদিন সন্ধ্যাবেলার কাজ ছিল। কি ভাবে ঠিকমত মৌনী থাকা যায়, সে সম্বন্ধে তিনি মাকে একান্তে জিজ্ঞাসা করিলেন, মাও তাঁকে একটী প্রক্রিয়া দেখাইয়া দিলেন। তিনি সেই প্রক্রিয়া করিয়া রবিবার মৌন লইলেন। সোমবার কথা বলিবার সময় দেখেন কথা আর বাহির হয় না। বড় অফিসার,—কতলোক আসিয়া কত কাগজ পত্র নিয়া বসিয়া আছে কিন্তু মহা বিপদ—তিনি কথা বলিতে পারিতেছেন না। তখন প্রতুল শাহবাগে আসিয়া মাকে সব জানায় ও তাঁহাকে সঙ্গে নিয়া যায়। মা গিয়া কথা বলিবার প্রক্রিয়া বলিয়া দেওয়ার পর সেই প্রক্রিয়া করিয়া প্রমথবাবু কথা বলিতে পারিলেন; মা বলিলেন, "তুমি কথা বন্ধ করিবার প্রক্রিয়া দেখিয়া আসিয়া সেই মত ক্রিয়া করিয়া মৌন নিয়াছিলে, কিন্তু খুলিবার প্রক্রিয়া দেখিয়া আস নাই, তাই এই গোলমাল হইল।"

সিদ্ধেশ্বরীর কথা।

আমাদের নিয়া মা একদিন সিদ্ধেশ্বরী বাড়ী গেলেন। দেখিলাম সেখানে একটা স্থান বাঁশের দ্বারা ঘেরাও করিয়া রাখা হইয়াছে ও তার মধ্যে ছোট একটি বেদি ইঁট ও মাটি দিয়া করা হইয়াছে, তার চারিদিকে তুলসী গাছ ও দুই একটী ফুলের গাছ আছে। সিদ্ধেশ্বরী কালীবাড়ীতে এক ভৈরবী সেবাদি করে।

সেই ওখানে একটু বাতি দিয়া যায়। মা গিয়া অনেকক্ষ সেখানে বসিলেন। শেষে চলিয়া আসিলেন। সিদ্ধেশ্বরী কালী বাড়ীও পুরাতন মন্দির,—একটী প্রকাণ্ড অশ্বত্থ বৃক্ষ, শিকড় শুদ্ধ উপড়াইয়া পড়িয়া আছে, কিন্তু গাছটী মরিয়া যায় নাই, গোড় হইতে আবার গাছ বাহির হইতেছে। শুনিলাম এই গাছের কি মহাত্ম্য-আছে।

সিদ্ধেশ্বরীর পূর্ব্ব ইতিহাস মার মুখে যেরূপ শুনিয়াছি এখানে তাহা উল্লেখযোগ্য মনে করিতেছি। মা বলিতেছেন,—

সিদ্ধেশ্বরীর পূর্ব্ব ইতিহাস।

"সন্ধ্যা হইলেই আপন কাজ সারিয়া রমনার কালীবাড়ীতে আসিয়া কখনও হয়ত বসিয়া থাকিতাম, কখনও বা প্রণাম করার মত ভাবে পড়িয়া থাকিতাম। এই ভাবে রাত্রি অনেক হইয়া যাইত। একদিন শুনিলাম রাত্রি দশটায় রমনার কালীবাড়ীর দরজা বন্ধ হইয়া যাইবে, এই নিয়ম হইয়াছে। এই সময়ে একদিন অটল এবং আরও দুই তিন জনকে আমি বলিলাম, "চল, রমনার কালী দেখিয়া আসি।" এই কথা বলিয়া তাহাদিগকে সঙ্গে লইয়া আমরা বাহির হইলাম। পথেই দশটা বাজিয়া গেল। তখন সকলেই বলাবলি করিতে লাগিল, 'আর ত দর্শন হইবে না, দরজা বন্ধ হইয়া গিয়াছে।' আমি বলিয়া ফেলিলাম, 'চল যাই।' আমরা যখন কালীবাড়ীর ফটক দিয়া ঢুকিতেছি তখন এক ব্যাপার হইল। ঠিক তখনই দেখা গেল একটী বিধবা দুইটী বালক বালিকা নিয়া আমাদের পাশ কাটাইয়া দ্রুতভাবে মন্দিরের দিকে চলিয়া গেল। আমরা গিয়া দেখি মে

স্ত্রীলোকটী মন্দিরে প্রণাম করিয়া বিদায় হইতেছে—মন্দিরের দরজা খোলা। সকলেই একটু আশ্চর্য্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, এখনও এই দরজা খোলা'? তখন জানা গেল ঐ স্ত্রীলোকটী কালীবাড়ীর মোহন্তের শিষ্যা—সে আসিয়াছিল বলিয়া দরজা খোলা আছে। আমরা যাইতেই স্ত্রীলোকটী চলিয়া গেল। আশ্চর্য্যের বিষয় রাস্তায় আর কোথাও এই স্ত্রীলোকটীর সহিত দেখা হয় নাই, একেবারে ফটকের কাছে গিয়া ঐভাবে দেখা হইল। এত রাত্রে ঐ স্ত্রীলোকটী ঐস্থানে একা কেন আসিল, এই প্রশ্ন কাহারও মনে উঠিল না। পরে ঐ স্ত্রীলোকটী একটী চারি বৎসরের মেয়ে নিয়া আমার কাছে শাহবাগে আসিয়াছিল। মেয়েটী ভাল হাঁটিতে পারে না, সেই কথাই আমাকে জানাইতে আসিয়াছিল। আমার মুখ হইতে কি বাহির হইল। আসিয়া পরে একদিন সেই স্ত্রীলোকটী বলিল, 'মা, তোমার কাছে জানাইয়া যাওয়ার পর মেয়েটী ভাল হইয়া গিয়াছে।' আমি ছোট মেয়েটীকে লক্ষ্য করি নাই, কিন্তু ঐ বিধবা স্ত্রীলোকটী যখন শাহবাগে আমার নিকটে আসিল তখন আমি তাহাকেই বিশেষ করিয়া লক্ষ্য করিলাম। এই সময়েই একদিন শ্রাবণ মাসে, যে বৎসর ভোলানাথের শাহবাগে চাকুরী হয় সেই বৎসরই—বাউল আমাদের সহিত শাহবাগে ফিরিবার পথে বলিল, 'একদিন তোমাদের সিদ্ধেশ্বরী নিয়া যাইব। বাউলের সহিত রমনার বাড়ীতেই কিছুদিন পূর্ব্বে দেখা শুনা হইয়াছিল। আরও পূর্ব্বের কথা এই যে বাজিতপুর একদিন আমার চোখের সামনে একটী গাছ ভাসিয়া উঠিয়াছিল ও ভিতরে জাগিয়াছিল, 'সিদ্ধেশ্বরী গাছ।' তারপর শাহবাগে আসিয়া একদিন

ভোলানাথকে জিজ্ঞাসা করিলাম, 'সিদ্ধেশ্বরী গাছ কোথায়' ভোলানাথ বলিতে পারিলেন না। পরে বাউলের মুখে এ কথা শুনিলাম। আমি ভোলানাথকে ইসারায় আমি যে পূর্বে সিদ্ধেশ্বরীর কথা বলিয়াছিলাম তাহা প্রকাশ করিতে নিষেধ করিয়া দিলাম। এর পর একদিন বাউল আসিয়া রাত্রিতে আমাদিগকে সিদ্ধেশ্বরী নিয়া গেল। যে অশ্বত্থ গাছটি পড়ি ছিল তাহা দেখিয়াই আমি স্পর্শ করিলাম ও পাতায় হাত দিলাম। বুঝিলাম এই গাছই আমি দেখিয়াছিলাম। বাউলের মুখে শুনিলাম এখানে বহু পূর্ব্বে মন্দিরাদি ছিল না। পরে সম্বরবন নামে এক সন্ন্যাসী এই মন্দির স্থাপন করে। এইখানে এক সঙ্গে তিনটী বৃক্ষ ছিল,—তাই তিন্তিরী নাম হইয়াছিল অন্য দুইটী এখন নাই—এই অশ্বত্থ গাছটী মাত্র আছে। প্রবাদ এই যে এই অশ্বত্থ বৃক্ষ হইতে একটি জ্যোতি বাহির হই মন্দিরস্থিত কালীমূর্ত্তিতে মিলিয়া গিয়াছিল। আমরা নাট দিয়া মন্দির দেখিয়া চলিয়া আসিলাম। তখন সিদ্ধেশ্বরীতে এ সব বাড়ী ঘর ছিল না এর পর আরও একদিন আমরা বাউলে সহিত সিদ্ধেশ্বরী গেলাম। গিয়া দেখি তালা বন্ধ, আমি তা ধরিয়া টান দিতেই তালা খুলিয়া গেল। বাউল বলিল, 'মা ইচ্ছাতেই এইরূপ হইল।' পরে আমরা আর রাত্রিতে ফিরি পারিলাম না, কারণ মন্দির খোলা রাখিয়া কি করিয়া ফিরি ভোর বেলায় তালাটী আল্‌গা ভাবে লাগাইয়া আমরা ফিরি আসিলাম। সিদ্ধেশ্বরীর মোহন্তদের এই কথা বলা হইয়াছি তাহারা তালা খোলা দেখিয়া মনে করিয়াছিল বন্ধ করিবার স হয়ত তালা ভাল লাগিয়াছিল না। তালা যে আমি টান দি

দিতেই খুলিয়া গেল, পূর্ব্বে খোলা ছিল না, এই কথা কাহাকেও বলিতে আমি বাউলকে নিষেধ করিয়াছিলাম। ইহার পর এক দিন আমি ভোলানাথকে বলিলাম, 'তুমি গিয়া একদরে সোয়া সের আলু, সোয়া সের সোনা মুগের ডাল ও একটী নারিকেল ও কিছু চাউল আন, দর দস্তুর করিও না।' ভোলানাথ আলু, চাউল ও নারিকেল নিয়া আসিল, কিন্তু সোনা মুগ পাওয়া গেল না। ইহার কিছু দিন পূর্ব্বে আমি নারায়ণগঞ্জে দ্বিজেন্দ্রবাবু উকিলের বাসায় গিয়াছিলাম। তিনি আশুর (ভোলানাথের ভ্রাতুষ্পুত্রের) মামা—আমাকে অত্যন্ত স্নেহ করিতেন। ছেলের অসুখে আমাকে নিয়াছিলেন। তাঁহার বাসায় আমি সোনা মুগ দেখিয়া আসিয়াছিলাম। সেখান হইতে দেড় সের মুগ আনাইলাম, দাম নিতে চাহে নাই, কিন্তু শেষে আশুকে দিয়া বলিয়া পাঠাইলাম, যাইয়া বল আমি চাহিয়াছি, দাম না নিলে কাজের জন্য আনিতে পারিব না'। আমার অবস্থা তাহারা জানে, তাই বাধ্য হইয়া দাম নিল। এই ভাবে সব ঠিক করিয়া ও সব গুছাইয়া একদিন আমি ভোলানাথকে বলিলাম, 'চল, সিদ্ধেশ্বরী যাইব।' ভোলানাথ আমার কথায় বাধা দিতেন না। তিনি চলিলেন। মাখন তখন শাহবাগে আমার বাসায়—তাহার খুব জ্বর। সুরবালার (মার ভগিনীর) মৃত্যুর পর আমার কাছে আসিয়াছে মাত্র। কিন্তু সে সব দিকে আমার খেয়ালই নাই। আমি চলিলাম। সেখানে গিয়া ঐ সব জিনিষ পাক করিয়া ভোগ দিয়া খাওয়া দাওয়া হইল। মুগ ডাল, নারিকেল ভাজা, আলু সিদ্ধ ভাত রান্না হইল। তার পর আমি ভোলানাথকে বলিলাম, 'আমি এখানে থাকিব।' তখন স্থির

৭

হইল দিনে বাবা গিয়া সিদ্ধেশ্বরী থাকিবেন ও সন্ধ্যার পর ভোলানাথ যাইবেন। আমি কালী মন্দিরের পাশের ছোট কুঠুরীতে থাকিব বলিলাম। তাহাই হইল। আমি অতি ভোর বেলা স্নানাদি করিয়া ঘরে ঢুকিতাম, দিন-রাত্রিতে আর বাহিরে আসিতাম না। সারাদিন কিছু খাওয়া ছিল না। রাত্রিতে বাউল গান করিতে করিতে ফলাদি নিয়া আসিত, অনেক রাত্রিতে তাহাই ভোগ দিয়া খাওয়া হইত। ভোগ আমি প্রথম প্রথম দিতাম, তোমরাও দেখিয়াছ। হয়ত সব সাজাইয়া দিয়া বসিয়া আছি অথবা পড়িয়া আছি—উঠিয়া বলিলাম, 'ভোগ হইয়া গিয়াছে।' কখনও কখনও রাত্রিতে মোহন্তরা ফুল ও চন্দন রাখিয়া যাইত। হয়ত ফুল কালীকে দিয়াছি। কিন্তু এসবই অস্বাভাবিক ভাবে !নিবেদন ও পূজা ইত্যাদি হইয়া যাইত। এই ভাবেই ভোগ নিবেদন করা হইত। পরে আমি ভোলানাথকে বলিলাম, আমার ত আর এসব হয় না যেন। তোমার যে মন্ত্র আছে তাহা দিয়াই তুমি ভোগ নিবেদন করিও।' তিনি পরে তাহাই করিতেন। এই ভাবে সাত দিন কাটিয়া গেল। ভোলানাথ কালীমন্দিরের একধারে থাকিতেন—কখনও নিজের কাজ করিতেন, কখনও শুইয়া থাকিতেন। আমিও রাত্রিতে কালীমন্দিরেই থাকিতাম, ভোরে স্নানাদি করিয়া ছোট ঘরে গিয়া ঢুকিতাম। বাউল মন্দিরের দরজায় থাকিত। এইভাবে সাতদিন কাটিল। আট দিনের দিন ভোরে ভয়ানক বৃষ্টি। আমি ভোলানাথকে ইসারায় (তখন মার তিন বৎসরের মৌন চলিতেছে) ডাকিয়া নিয়া বাহির হইয়া গেলাম। কোথায় কি রাস্তা কিছুই জানি না, একেবারে উত্তরদিকে চলিলাম

শেষে নির্দ্দিষ্ট স্থানে গিয়া শরীরটা দাঁড়াইল। তিনবার প্রদক্ষিণের মত হইল। পরে দক্ষিণ মুখ হইয়া কুণ্ডলী দিয়া বসিয়া পড়িলাম এবং স্তোত্রাদি কি সব হইতে লাগিল। কারণ তখন এই ভাবেই কথা বাহির হইত। বসিয়াই মাটিতে হাত খানা চাপিয়া রাখিলাম। আশ্চর্য্যের বিষয়, এক একটা মাটির পর্দ্দা সরিয়া যাইতেছে, আর হাতটা অবাধে ঢুকিয়া যাইতেছে। এই ভাবে যখন বাহুমূল পর্যন্ত ঢুকিয়া গিয়াছে তখন ভোলানাথ আমাকে ধরিয়া ফেলিলেন ও টানিয়া হাত তুলিয়া নিলেন। সঙ্গে সঙ্গে অল্প অল্প গরম জল লাল রঙের উঠিতে লাগিল। এবং মা হাতে কি একটা জিনিষ উঠাইয়া ছিলেন। মা মাটিতে ঢুকিয়া যাইতেছিলেন দেখিয়া ভোলানাথ ভয়ানক ভয় পাইয়া ছিলেন। এখন হাতে ঐ জিনিষটা দেখিয়া কি জানি আবার কি হয় ভাবিয়া মার হাত হইতে নিয়া ঐটী সিদ্ধেশ্বরীর পুকুরের জলে দিলেন। পরে ভোলানাথকে বলা হইল, 'তুমি হাত দাও।' ভোলানাথ হাত দিতে অমত করায় বলা হইল, 'ভয় নাই, তোমার হাত দেওয়া দরকার, হাত দাও।' তখন তিনিও হাত দিলেন। ভোলানাথ বলিলেন, 'স্থানটা যেন একেবারে ফাঁকা লাগিল আর গরম বোধ হইল।' ভোলানাথের হাত তুলিবার সঙ্গে সঙ্গে লাল গরম জল উঠিল। আমি ও ভোলানাথ তাহা দাঁড়াইয়া দেখিলাম—জল উঠিয়া গড়াইয়া যাইতেছিল। তখন মাটি দিয়া ঐ স্থানটী বন্ধ করিয়া আমরা চলিয়া আসিলাম। আশ্চর্য্যের বিষয় বাউল রোজ জাগিয়া থাকিত, কিন্তু সেই সময়ে ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল। আমরা তাহার গায়ের নিকট দিয়াই বাহির হইয়াছিলাম, কিন্তু সে টের পায় নাই। তারপর আমরা

ফিরিয়া আসিলে বাউল জাগিল। জাগিয়া খুব দুঃখ করিল। বাউলের ভোগ দিবার ইচ্ছা হইল। সেই বন্দোবস্ত করিতে সে চলিয়া গেল। আমি ও ভোলানাথ আবার সেই স্থানটায় গিয়া ভিতরে হাত দিলাম। পরে একবার শাহবাগ গিয়া সন্ধ্যার পর সিদ্ধেশ্বরী ফিরিয়া আসিলাম এবং রাত্রিতে আমিই ভোগ পাক করিলাম। তখন তোমাদের দিদিমা ও বাউলের স্ত্রীও আসিল। ভোগের পর শাহবাগ চলিয়া যাওয়া হইল। ঐ নির্দ্দিষ্ট স্থানটীর পাশেই একটী উইয়ের ঢিঁপি ছিল, তাহা তোমরাও পরে দেখিয়াছ। দেখ, ঐ স্থানে যখন প্রথম যাই তখন বাউল ঘুমে ছিল, চারিদিকে একটী লোকও ইহা দেখে নাই। যখন ফিরিয়া আসি তখন ভৈরবী দেখিয়াছিল।”

অষ্টম দিনও ভোগ হইল—মা বাহির হইলেন। তাহার পরদিনই ভাদ্র মাসের সংক্রান্তি ছিল। এর পর মা শাহবাগে একদিন শুইয়া ছিলেন—বাউলকে কয়েকটী জিনিষের কথা বলা হইল। সে যোগাড় করিয়া মার কথামত ঐ গহ্বরে রাখিয়া দিল। ঐ নির্দ্দিষ্ট স্থানে পুতিয়া রাখিতে এবং স্থানটী রোজ দেখিতে যাইতে বলিয়াছিলেন বাউল তাহা করিতেন। তিনি তুলসী ও কয়েকটা ফুলের গাছ তথায় লাগাইয়া রাখেন। পরে প্রাণগোপালবাবু ইহা শুনিয়াই স্থানটী রক্ষার জন্য বাউলবাবুকে দশটী টাকা দেন। সেই টাকা দিয়া মার নির্দ্দেশ মত দশ হাত মাপে ঐ স্থানটী বাঁশ দিয়া ঘেরিয়া রাখা হয় ও ঐ নির্দ্দিষ্ট স্থানে একটী ইষ্টকের বেদী করা হয়। তাহা সওয়া হাত স্কোয়ার হয়। পরে ঐ স্থানে টি

মধ্যে মধ্যে মা বসিতেন,—কীর্ত্তনাদি হইত। একদিন তথায় প্রাণগোপালবাবুদের নিয়া কীর্ত্তনে রাত্রি কাটিল। প্রাণগোপালবাবু বলিয়াছিলেন, এইভাবে কীর্ত্তনাদিতে রাত্রি কাটান তাঁহার জীবনে এই প্রথম। তিনি খুব নিয়মিত ভাবে আহার-বিহারাদি করিতেন। সেই সময় কীর্ত্তনে মার আসনে মা শুইয়াছিলেন, তখন বাউল প্রভৃতি সকলে দেখিল মার শরীর নাই, কাপড়খানা পড়িয়া আছে মাত্র। আর একটী বিশেষ কথা এই, উইয়ের ঢিঁপি ভাঙ্গিয়া যখন বাবা ঘর উঠাইলেন তখন কুলি-মজুরেরা সেই ঢিঁপি ভাঙ্গিতে কেমন একটা ভয় পাইতেছিল। পরে মার কথায় ভোলানাথ গিয়া তাহা ভাঙ্গিয়া দিয়া আসিলেন। ঐ উইয়ের মাটি বাসন্তী পূজার সময় প্রতিমার মাটিতে মিশাইয়া দেওয়া হইয়াছিল। এই উইয়ের ঢিঁপির বিবরণ কি তাহা এখনও মার মুখ হইতে প্রকাশিত হয় নাই। তবে মা এ কথা প্রকাশ করিয়াছেন যে, ভোলানাথ এইস্থানে এক সময় সাধন করিয়াছেন—তিনি দুর্গাপূজা করিয়াছিলেন এবং সেই দুর্গা-প্রতিমা কালীবাড়ীর পুষ্করিণীতে বিসর্জ্জন দেওয়া হইয়াছিল। পাঁচ হাজার পাঁচশত পাঁচ বৎসর পর পর এইভাবে বিশেষ বিশেষ সাধকগণ এই স্থানে আসিতেন।

এখানে একটী লক্ষ্য করিবার বিষয় আছে। ভোলানাথ বাজিতপুরে ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন, 'আমার ইচ্ছা হয় একটী পুষ্করিণীর সহিত বাড়ী করি। এবং বাসন্তী পূজা করি।' মা

তখনই বলিয়াছিলেন, "তোমার ত বাড়ী আছে—ঢাকায় গোকুল ঠাকুরের বাড়ীই তোমার বাড়ী। রমনার আশ্রমে পূর্ব্বে যে মার কথিত গোকুলঠাকুর মালিক ছিল তাহা পরে শুনা গিয়াছে। পরে ভোলানাথের বাসন্তী পূজা সিদ্ধেশ্বরীর আসনে হইল। সিদ্ধেশ্বরীর নির্দ্দিষ্ট স্থানে বহুপূর্ব্বে ভোলানাথই সাধক ছিলেন। তবেই দেখা যায় ভোলানাথের উপলক্ষ্যেই মা এই দুই স্থানে তাঁহাকে নিয়া আসিলেন। এই দুই স্থানেই তিনি ছিলেন।

ভোগে বাধা।

আর একটী ঘটনা ঘটিল। প্রমথবাবু রোজই মার বাড়ীতে কিছু মাছ ও পান পাঠাইয়া দিতেন। তিনি বদলী হইয়া গেলে তাঁহার ছেলে প্রতুল ঢাকায় ছিল, সেই চাকরদের বলিয়া রাখিল—বাসায় মাছ আসিলেই প্রথমে যেন মার জন্য একটু পাঠাইয়া দেওয়া হয়। একদিন একটী ছোট মাছের মাথা মার বাড়ী পাঠাইয়া দিয়াছে। মা নিজেই পাক করিয়াছেন। ভোলানাথ খাইতে বসিয়া যেই মাথাটী ভাঙ্গিয়াছেন, দেখেন মাথার মধ্যে একেবারে টাট্কা রক্ত, থালাতে বেশ একটু রক্ত জমিয়াছে। দেখিয়া সকলেই আশ্চর্য্য; সিদ্ধ হইয়া গিয়াছে অথচ সেই মাথায় এইরূপ টাট্কা রক্ত কি করিয়া থাকে। মা উহা খাইতে নিষেধ করিলেন। প্রতুল আসিয়াও এ কথা শুনিল, মাকে পুনঃপুনঃ ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিল। মা অগত্যা বলিলেন "হয়ত এই মাছ এখানে দিবার সময় কাহারও

অনিচ্ছা ছিল, তাই এইরূপ হইয়াছে।” সে বাসায় গিয়া চাকর ও ঠাকুরকে অনেক পীড়াপীড়ি করিয়া জিজ্ঞাসা করিতে তাহারা স্বীকার করিল—এই মাথাটী মার বাড়ী দিবার সময় তাহাদের মনে হইয়াছিল, মাথাটী প্রতুলবাবুর জন্যই রাখিয়া দেওয়া হউক, শেষে প্রতুলবাবু পাছে কিছু বলেন এই ভয়ে মার বাড়ীতেই দিয়া আসিয়াছে। তখন প্রতুল গিয়া মাকে ধরিল “যখন ভোগে এইরূপ গোলমাল হইল তখন আগামী অমাবস্যাতে আমি ভোগের সব পাঠাইব, আপনার সব খাইতে হইবে। প্রতুলেরও মার প্রতি খুব সরল বিশ্বাস-ভক্তি ছিল। মা তাহার ও ভোলানাথের কথায় অমাবস্যার দিন ভাত খাইতে রাজি হইলেন। অমাবস্যার দিন প্রতুল ভোগ পাঠাইয়া দিল, মা সেদিন নিয়ম মত আহার করিলেন। অপর দিন ঐ নয়টা ভাত খাইয়া আছেন, দুধ-ফলের কিছুই বন্দোবস্ত নাই। পরের অমাবস্যায় বাবা ধরিলেন এবং সেইদিন ভোগ দিলেন, মা সেই দিনও খাইলেন।

ইহার পর হইতেই প্রতি অমাবস্যায় বাবা ভোগ দিতেন এবং মাও নিয়ম মত আহার করিতেন। এই ভাবে অমাবস্যার ভোগ আরম্ভ হইল। মার ভাগিনেয় অমূল্য প্রথম চাকুরী পাইয়া পূর্ণিমায় লুচি মিষ্টান্ন ভোগ দিল। মা সেদিনও খাইলেন। ইহার পর হইতে প্রতি পূর্ণিমায় অমূল্য ভোগ দিত। পরে এই অমাবস্যা-পূর্ণিমার ভোগ সকলে মিলিয়াই দিতে লাগিলেন।

অমাবস্যা ও পূর্ণিমায় মার ভোগ।

অমাবস্যা ও পূর্ণিমায় দিনের বেলায় মা, ভোলানাথ এবং ভক্তেরা সকলেই সামান্য কিছু ফল খাইয়া থাকিতেন। রাত্রিতে কীর্ত্তন হইত ও মার ভোগ হইত। পরে সকলে প্রসাদ পাইতেন। আমরা প্রায় ভোরবেলা প্রসাদ পাইতে বসিতাম। কারণ কীর্ত্তনে মার ভাব হইত ও তাহা ভাঙ্গিতে ভাঙ্গিতে অনেক রাত্রি হইয়া যাইত। তার পর এত লোকের খাওয়া দাওয়া সমাপ্ত হইতে রাত্রি প্রায় ভোর হইয়া যাইত। তখন মার ভক্তদের মধ্যে অনেকে অমাবস্যা ও পূর্ণিমার দিনে খাইতেন না—রাত্রিতে রমনার আশ্রমে ভোগ হইত, সেইখানেই প্রসাদ পাইতেন। অমাবস্যা ও পূর্ণিমার রাত্রিতে মন্দিরে বিশেষ পূজার ব্যবস্থা ছিল।

খাওয়ার জিনিষে কাহারও লোভ থাকিলে তাহা মার ভোগে লাগিত না, ইহা অনেক সময়ে দেখিয়াছি। একদিন আমাদের টীকাটুলীর বাসায় মা ভোগে বসিয়াছিলেন; খুব বড় মাছ রান্না হইয়াছিল, মাকে একটু মুখে দেওয়া হইল, কিন্তু মা উহা কিছুতেই গিলিতে পারিলেন না। শেষে জানা গেল চাকরদের মধ্যে গোলমাল হইয়াছিল। একদিন হয়ত কেহ কেহ ভাল খাবার নিয়া গিয়াছেন, মা কিছুই খাইলেন না, সব বিলাইয়া দিলেন। আবার এক একদিন সামান্য জিনিষ এমন ভাবে খাইলেন যে, যে আনিয়াছিল সে দেখিয়া খুবই তৃপ্তি পাইল। শেষে মার খাওয়ার জিনিষ করিতে আমাদের

ভোগের জিনিষে লোভ হ'লে ভোগ হয় না।

খুবই আশঙ্কা হইত। কিছুদিন এমন হইয়াছিল যে, কোন ফলে পাখী মুখ দিলে সেই ফল খাইতে পারিতেন না। মা জানিতেন না—আমরা কাটিয়া নিয়া যাইতাম, কিন্তু খাইতে পারিতেন না। শেষে কারণ বলিতেন। আমরা দেখিয়াছি, সত্যই উহা পাখীর মুখের ছিল। কিছুদিন এইরূপ ভাব থাকিত, পরে আবার চলিয়া যাইত। তখন যে যাহা দিত অবাধে খাইতেন। এমন কি অপরের মুখের জিনিষও খাইতেন—একদিন একটা কুকুরকে কি খাইতে দেখিয়া "আমি ওর সঙ্গে খাইব" বলিয়া দৌড়াইয়া গিয়াছিলেন।

দ্বিতীয় অধ্যায়

একদিন ১৩৩২ সালে এক ঘটনা ঘটিল। সে দিন অমাবস্যা। তখনও খুব লোকজন আসা আরম্ভ হয় নাই। আমরাই কয়েকজন শাহবাগে গিয়াছি। রাত্রিতে অমাবস্যার ভোগ ও কীর্ত্তন হইতেছে, সীতানাথ প্রভৃতি কয়েকজন কীর্ত্তন করিতেছে। ভোগ নিরামিষ, মটরী পিসিমাই পাক করিয়াছেন। মাছের ঘরে মা পাক করিয়াছেন, আমি সঙ্গে সঙ্গে আছি। সামান্য একটু বাকী আছে। মা আমাকে ওখানে রাখিয়া কীর্ত্তনে আসিয়া বসিয়াছেন। অল্প লোক, তাই মা মধ্যের যে ঘরটীতে শুইতেন সেই ঘরেই কীর্ত্তন হইত। মটরী পিসিমা প্রভৃতি যে কোণের ঘরটায় শুইতেন সেই ঘরেই মা বসিতেন, মেয়েরা কেহ উপস্থিত থাকিলে সেই ঘরেই বসিত। রাত্রিতে মেয়েরা বড় থাকিত না, মধ্যে মধ্যে দুই চারি জন আসিত। ঐ দিন আর কেহ ছিল না, মা একাই ঐ কোণের ঘরে বসিয়াছিলেন। সেই ঘরেই ভোগ হইবে, রান্নার জিনিষও সেই ঘরেই রাখা হইতেছিল। অনেক সময়ই কীর্ত্তনের সময় মা ভাব-অবস্থায় মধ্যের ঘরে কীর্ত্তনের ভিতর চলিয়া যাইতেন। কখনও সমস্ত ঘর ঘুরিতেন, কখনও গড়াগড়ি দিতেন, কখনও শুধু বৃদ্ধাঙ্গুলের উপর ভর

অমাবস্যার ভোগ-কীর্ত্তন কালে বিচিত্রভাব—পায়ে ফুল দেওয়ার পরিণাম।

দিয়া দাঁড়াইয়া থাকিতেন,—ঐ সময়ে শরীরে কত ক্রিয়া হইত। কখনও শুধু পায়ের গোড়ালীর উপর ভর দিয়াই হাঁটিতেন, ভাবে নাচিতেন। আবার কখনও স্থিরভাবে বসিয়া থাকিতেন কিংবা পড়িয়া যাইতেন। প্রথম প্রথম কখনও কখনও লুটের বাতাসায় হাত বুলাইয়া একবার মাটিতে ফেলিয়া দিয়া শুইয়া পড়িতেন। কিছুদিন পর আর ইহাও পারিতেন না। ভোলানাথকে বলিতেন, তিনিই নিবেদন করিয়া লুট বিলাইয়া দিতেন। শেষে হয়ত কোন দিন অল্প চেষ্টায়ই উঠিতেন। কোন কোন দিন সকলে চলিয়া যাইত, মাকে উঠানই যাইত না, রাত্রি প্রায় দুইটা বা তিনটা পর্য্যন্ত আমি ও বাবা মার কাছে বসিয়া থাকিতাম। ভোলানাথ উঠাইবার জন্য নানা চেষ্টা করিতেন। কোন দিন হয়ত আমরাই আবার নাম করিতে করিতে মা একটু সুস্থ হইলে মাকে শোয়াইয়া দিয়া বাসায় আসিতাম। ঐ দিন মা কোণের ঘরে গিয়া বসিয়াছেন, কীর্ত্তন হইতেছে। বাকী রান্নাটুকু করিয়া আমি কীর্ত্তনের কাছে আসিয়া দেখি, মা ভাবে বিভোর হইয়া কীর্ত্তনের মধ্যে চলিয়া গিয়াছেন। এদিকে আমি রোজই মার জন্য একটী মালা ও কিছু ফুল নিয়া আসিতাম। সে দিনও আনিয়াছিলাম। মা যখন চুপ করিয়া বসিতেন, কীর্ত্তন আরম্ভ হইবার পূর্ব্বেই আমি মালাগাছটী মার গলায় দিয়া দিতাম, এবং ফুল হাতে দিতাম। আজ মা ঐ ঘরে চলিয়া গিয়াছেন, মালা দেওয়া হয় নাই, তাই মনটা কেমন খারাপ হইল। আমি প্রথম হইতে মার শরীর রক্ষা

করিবার জন্য ভাবের সময় পুরুষদের ভিড়ের মধ্যেও মার সঙ্গে সঙ্গে থাকিতাম, কোন সঙ্কোচ করিতাম না। কিন্তু সে দিন মা চলিয়া গিয়াছেন বলিয়া কেমন যেন আমার একা-একা কীর্ত্তনের মধ্যে যাইতে একটু লজ্জা করিতে লাগিল—যাইতে পারিলাম না। ঐ কোণের ঘরে অন্ধকারে দাঁড়াইয়াই মার দিকে চাহিয়া রহিলাম, মাকে যে মালা দিতে পারিলাম না এই দুঃখ মনে মনেই মাকে জানাইতে লাগিলাম। দেখিলাম মা কতক্ষণ ঘুরিয়া ঘুরিয়া প্রতিদিনের মত বাতাসা লুটাইয়া দিয়া মাটিতে শুইয়া পড়িয়াছেন। মনে হইল মা শীঘ্র উঠিবেন না,—কত চেষ্টা করিয়া যে তাঁহাকে উঠাইতে হয় তাহা জানা ছিল। কিন্তু কি আশ্চর্য্য, আজ ধীরে ধীরে মা উঠিয়া দাঁড়াইলেন। পূর্ব্বে আর কখনও এইরূপ দেখি নাই, কাজেই আশ্চর্য্য হইয়া দেখিতে লাগিলাম। দেখিলাম মা টলিতে টলিতে দাঁড়াইয়া কোণের ঘরের দিকে, আমার দিকে, আসিতেছেন। আমার তখনকার মনের অবস্থা বুঝাইতে পারিব না, বুকের ভিতর কেমন যেন করিয়া উঠিল, মুহূর্ত্তের মধ্যেই মা টলিতে টলিতে আমার কোলের উপর আসিয়া পড়িয়া গেলেন, আমিও তাঁকে জড়াইয়া নিয়া বসিয়া পড়িলাম। ঘরে আর কেহ নাই, অন্ধকার ঘর, আমার মনের বাসনা বুঝিতে পারিয়াই মা এই ঘরে এইভাবে উঠিয়া আসিলেন, ইহাতে আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ রহিল না। তখন মনে কেমন জোর হইল, আমি কোন বিধি-নিষেধ মানিলাম না, অন্ধকারে

মার গলায় মালা দিয়া ফুলগুলি পায় ঢালিয়া দিলাম, ভবিলাম আর ত কেহ দেখিবে না। কিন্তু ফুল পায় দিতেই মা কেমন শক্ত হইয়া কোল হইতে গড়াইয়া মাটিতে লম্বা হইয়া শুইয়া পড়িলেন, ভিতর হইতে কেমন একটা আওয়াজ বাহির হইতে লাগিল, চক্ষু কপালে উঠিয়াছে, মুখ লাল, হাত পা যেন উলটাইয়া যাইতেছে, একটা অস্পষ্ট শব্দ করিতেছেন। ভোলানাথ অবস্থা দেখিয়া দৌড়িয়া ঐ ঘরে আসিলেন। যে কয়জন কীর্ত্তনে উপস্থিত ছিলেন সকলেই আলো নিয়া দরজায় দাঁড়াইলেন। মার পায় ও কাপড়ে নানা রংয়ের ফুল বাতির আলোতে পরিষ্কার দেখা যাইতে লাগিল। সকলেই বুঝিল মার পায় আমি ফুল দিয়াছি, তাই মার এই অবস্থা। মারও অস্পষ্ট শব্দ ক্রমে একটু ফুটিল, বাহির হইল, "ফুল দিয়াছে আমি যাই।" এই বলিয়া যে কি ভাব করিতে লাগিলেন তাহা দেখিলেই ভয় হয়। ভোলানাথ নিষেধ করিয়া বলিলেন, "যাইও না।" সকলে মৃত্যু মৃত্যু ভাবে বলিলেন, "অন্যায়ই হইয়াছে যখন নিষেধ।" তাহাও আমার কানে গেল। মার এই অবস্থা, আমার অবস্থা বুঝাইব এমন ভাষা আমার নাই। আমি যেন কাঠের মত শক্ত হইয়া গিয়াছি, আঙ্গুল নাড়িবারও শক্তি হারাইয়াছি। লজ্জা, দুঃখ ও ভয় আমার ঐ অবস্থা করিয়া দিয়াছে। আমার মনে হইতেছিল পৃথিবী ফাঁক হইলে ভিতরে চলিয়া যাইতাম। কি করিয়া আর লোকের কাছে মুখ দেখাইব, বাবাই বা কি বলিবেন। সকলেই জানে মা আমাকে

একটু বিশেষ অনুগ্রহ করেন, কিন্তু আজ আমি কি করিয়া বসিলাম, লোকে কি মনে করিবে? মার আদেশ অমান্য করিলাম! এত কথা চিন্তা করিবার সেই সময়ে বোধ হয় আমার শক্তি ছিল না। আমি ত চৌকির কোণে মার পায়ের কাছেই মাথা গুঁজিয়া বসিয়া আছি, ভোলানাথ মাকে সান্ত্বনা দিতেছেন। সকলেই চুপ, মা যে আজ কি করিয়া ফেলিবেন সেই সকলের ভয়। হঠাৎ মা আলু-থালু বেশেই উঠিয়া বসিলেন, চোখ তখনও ঠাণ্ডা হয় নাই। উঠিয়াই আমাকে বলিতেছেন, "ওঠ্।" আমি কলের পুতুলের মত দাঁড়াইলাম। শেষে বলিলেন (নিজে তুই পা মেলিয়া বসিয়াছিলেন), "আমার তুই পায়ের উপর তুই পা দিয়া ঠিক ভাবে দাঁড়া।" দরজার কাছেই কত লোক দাঁড়াইয়া আছে, কি করিয়া তাঁহাদের দিকে মুখ করিয়া দাঁড়াইব? কিন্তু অত ভাবিবার অবসর তখন কোথায়? কলের পুতুলের মত এই আদেশও পালন করিলাম। তখন মা কি—সব মন্ত্র উচ্চারণ করিতে করিতে ঐ ফুলগুলিই আমার পায়ে ছিটাইয়া দিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ এই ভাবে করিবার পর মা ঠাণ্ডা হইলেন। আমাকে নামিতে বলিলেন, নিজেও পা গুটাইয়া ঠিক হইয়া বসিলেন। আবার সহাস্য মূর্ত্তিতে আমার দিকে চাহিয়া বলিলেন, "আজ হইতে তোমার পায় হাত দিয়া কাহাকেও প্রণাম করিতে দিও না, ছোট ভাই বোন্‌দেরও নয়।" পরে কোনও কারণে ইহাও বলিয়া দিয়াছিলেন, তুমিও তুই তিন জন ছাড়া

আর কাহারও পায় হাত দিয়া প্রণাম করিও না।" আমি কোণের ভিতর আবার বসিয়া পড়িয়াছি। এবার মাকে ঠাণ্ডা দেখিয়া অভিমানে ভয়ানক কান্না আসিল, কেনই বা মা নিজে এ ভাবে আসিলেন, মালা ফুল দেওয়াইলেন, আবার এ ভাবে সকলের কাছে আমায় লজ্জা দিলেন। ভয় তখন চলিয়া গিয়াছে, মা ত স্থিরই হইয়াছেন। আমি কাঁদিতে লাগিলাম। মা হাসিয়া ভোলানাথকে বলিলেন, "দেখ ত ও কাঁদে কেন?" ভোলানাথ বলিলেন, "তুমি যে ভাব করিয়াছ কাঁদিবেই ত, এখন ঠাণ্ডা কর।" তখনও আমরা খুব বেশী দিন যাই নাই—তখন মা দরজা বন্ধ করিয়া দিতে বলিয়া বাস্তবিকই সেই দিন ঠাণ্ডাই করিলেন। এই ঘটনার পর হইতে প্রতি অমাবস্যায় আমি মাকে ফুল দিয়া পায়ে অঞ্জলি দিবার অনুমতি পাইয়া প্রতি অমাবস্যায় পূজা করিতাম। একদিন বলিলাম, "মা আমি পূজা জানি না।" মা বলিলেন, "তুমি যে ভাবে দিবে তাহাতেই পূজা হইবে।" আমি সাধ্যমত ভক্তি-পুষ্পাঞ্জলি মার পায় দিতাম। যে দিন হইতে মার পায় অঞ্জলি দেওয়া আরম্ভ হইল সে দিন হইতে অন্য কোন দেবতার পায় অঞ্জলি দিতে নিষেধ করিয়া দিলেন। সেই হইতে ঐ এক পায় ছাড়া আর কোথাও অঞ্জলি দিতাম না। পরে বলিলেন, "চল, এখন ভোগ দিয়া পরিবেশন করি।" আমি বলিলাম, "আমি পরিবেশন করিতে যাইতে পারিব না। যে কাণ্ড হইয়াছে, সকলের কাছে যাইতে লজ্জা করে। তাঁহারা নিশ্চয়ই মনে মনে আমার

উপর খুব রাগ করিয়াছেন।” মা অমনিই বলিলেন, “আচ্ছা, আমি সকলকে জিজ্ঞাসা করি কেমন রাগ করিয়া আছে।” আমি দেখিলাম এ আবার এক মহাবিপদ বাধাইবেন। আমি অগত্যা মার কথা মত মার সঙ্গে পরিবেশন করিতে রাজি হইলাম। মা ও আমি সকলকে পরিবেশন করিয়া খাইতে বসিলাম।

মাংস খাইতে আমার ভয়ানক ঘৃণা হইত, তাই মা প্রসাদী মাংসও আমাকে কখনও দিতেন না। এক দিন খাইতে বসিবার পূর্ব্বে মা বলিলেন, “আজ হইতে খুকুনী আমাকে খাওয়াইয়া দিবে। ও যখন না থাকিবে তখন তোমরা দিবে।”

নিজ হাতে খাওয়া বন্ধ—আমার উপর খাওয়াইবার ভার।

কিছু দিন ভোলানাথ খাওয়াইয়া দিতেছিলেন, কখনও মুখ নামাইয়া নিজের হাত হইতে খাবার গ্রহণ করিতেন। অবশ্য কখনও হাত দিয়াও একটু খাইতে পারিয়াছেন। আজ হইতে নিজ হাতে খাওয়া একেবারেই বন্ধ হইল। মা নিজে ইচ্ছা করিয়া কিছুই করেন না। কিছু দিন পূর্ব্বে রাজেন্দ্র কুশারীর বাসায় ভোগে গিয়াছিলেন, তখন ভাত মুখে দিতে গিয়া দেখেন হাত মুখের দিকে না গিয়া নীচের দিকে নামিয়া যাইতেছে। তখনই বুঝিলেন হাতে খাওয়া বন্ধ হইয়া আসিতেছে। তার পর কোন প্রকারে চলিতেছিল। আমি এ কাজের ভার পাইয়া কৃতার্থ হইলাম। অনেকদিন পূর্ব্বে টিকাটুলীর বাসায় প্রথমদিন ভোগে বসিয়া যে আমাকে খাওয়াইয়া দিয়াছিলেন ও বলিয়াছিলেন—

"আমি যখন পারিব না তখন তুমি আমাকে খাওয়াইয়া দিবে" সে কথার অর্থ এখন বুঝিলাম। মা ত সবই জানিতেন, তাই তখন মুখ দিয়া ঐ কথা বাহির হইয়াছিল। খাওয়া-দাওয়ার পর মা ও ভোলানাথ শুইলেন, আমরা তাঁহাদের প্রণাম করিয়া বাড়ী চলিয়া গেলাম। ইহার পর হইতে মা নয়টা কি তিনটা ভাত বা যাহাই খাইতেন, আমি উপস্থিত থাকিলে আমিই খাওয়াইয়া দিতাম। তখন দিনে খাওয়ার সময় আমি আসিতাম না, রাত্রিতে রোজই আমি মাকে খাওয়াইয়া দিতাম, মা শুইলে চলিয়া যাইতাম। বাড়ী ফিরিতে রাত্রি প্রায়ই ১॥ টা, ২ টা, কি আরও বেশী হইয়া যাইত।

আরও এক ঘটনা শুনিলাম। গত দীপান্বিতাতে (১৩৩২ সনের কার্ত্তিক মাসে) সকলের অনুরোধে এই শাহবাগেই মা কালীপূজা করিয়াছিলেন। মাকে কখনও ফুল বেলপাতা দিয়া সাধারণের মত পূজা করিতে কেহ দেখে নাই,—তাঁহার দীক্ষাদিও সাধারণ ভাবে হয় নাই, অলৌকিক ভাবেই আপনা আপনি হইয়া গিয়াছে।

দীপান্বিতা কালী-পূজার ইতিহাস—কার্ত্তিক, ১৩৩২।

মা পূজা করিতে বসিয়াছেন, একটী প্রকাণ্ড পাঁঠা উৎসর্গ করিতে আনা হইল। মা পাঁঠাটী কোলে নিয়া প্রথমে অনেকক্ষণ কাঁদিলেন, পরে উহাকে উৎসর্গ করিলেন। তাহার পর পাঁঠাটী কেমন নিস্তেজ হইয়া নিজে নিজেই বলির স্থানে গিয়া দাঁড়াইল। মা নিজে প্রতিমার সম্মুখে উপুড় হইয়া টান হইয়া শুইয়া খড়্গ নিজের কাঁধের উপর রাখিলেন (ইহাতে

অনেকেই মা কি করিয়া বসেন বলিয়া ভয় পাইলেন) এবং বলি পূর্ব্বে পাঁঠা যেরূপ কাতর শব্দে ডাকে সেইভাবে তিনবার ডাক দিলেন। অনেকক্ষণ পর বলি হইলে দেখা গেল এক ফোঁটা রক্ত বাহির হয় নাই। একটু রক্ত বাহির করা দরকার, কারণ পূজায় রক্ত চাই, ভোলানাথ টিপিয়া টিপিয়া অনেক চেষ্টায় এক ফোঁটা রক্ত বাহির করিয়াছিলেন।

ভাবাবস্থায় মা নানা প্রকার অবস্থার মধ্য দিয়া চলিতেন। অনেক সময়ে এমন হইত—মা হাঁটিতেছেন, কথা বলিতেছেন অথচ খুবই অন্যমনস্ক। যদিও হাতের কাজ সব ঠিক ঠিক করিতেন, তথাপি বেশী সময়ই ঐরূপ অন্যমনস্ক ভাবটা থাকিত।

মার ভাবাবস্থার স্থিতি।

দাঁড়াইয়া আছেন, মনে হইত যেন কোথায় চলিয়া গিয়াছেন। মার এই ভাব দেখিয়া ভোলানাথের ভগিনীপতি কালীপ্রসন্ন কুশারী মহাশয় বলিতেন,—"দেখুন, আপনি কথা বলিতে বলিতে কোথায় চলিয়া যান বলিতে পারেন? পরিষ্কার বুঝা যায় আপনি এখানে ছিলেন না। কি রকম ভাব হয়, বলুন ত?" মা একটু মৃদু হাসিয়া বলিতেন,—"যে চিনি না খাইয়াছে তাহাকে কি ঠিক ঠিক বুঝান যায় চিনি কেমন মিষ্টি?" মা তখন কথা বেশী বলিতেন না, প্রায়ই ভাবে ডুবুডুবু থাকিতেন। কোন কোন সময় বেশ একটু চট্‌পটে দেখা যাইত,—কখনও কখনও কথা খুব বলিতেন। কিন্তু আমরা চুপ করিলেই মা স্থির হইয়া যাইতেন। সর্ব্বদা কথা বলিয়া বলিয়া কথা বলাইয়া রাখিতে হইত।

হাসিয়া বলিতেন,—"মেশিন আর কি? তোমরা যতটুকু চালাইয়া নেও চলে, আবার বন্ধ হইয়া যায়।" বেশী সময়ই পড়িয়া থাকিতেন। কখনও খাইতে বসিয়াছেন, হয়ত থালার মধ্যেই ঢলিয়া পড়িলেন—একেবারে আড়ষ্ট হইয়া গেলেন। পায়খানায় যাওয়ার কথাও মনে করাইয়া দিতে হইত। আবার হয়ত ভুলিয়া গিয়াছেন কিসের জন্য আসিয়াছেন, সেইখানেই স্থির ভাবে বসিয়া পড়িয়াছেন। আমি অনেক সময়ই সঙ্গে সঙ্গে থাকিতাম, অবস্থার দিকে লক্ষ্য রাখিতাম। তাই বহুক্ষণেও না ফিরিলে ভিতরে চলিয়া যাইতাম। দেখিতাম বেশ বসিয়া আছেন। ধাক্কা দিয়া ডাকিলে চম্‌কিয়া মৃদু হাসিয়া উঠিতেন ও বলিতেন—"ভুলিয়াই গিয়াছিলাম।" তার পর আমি উঠাইয়া আনিতাম। সর্ব্বদাই শরীরের জন্য একটা ভয় থাকিত। দিন দিনই এই অবস্থা বাড়িতে লাগিল। ভোলানাথ একা একা কতই বা দেখিবেন। তাই আমি বেশী সময় এখানেই কাটাইতে লাগিলাম। কোন কোন দিন বলিতেন,—"দেখ, আমার আগুন ও জলের ভেদজ্ঞান যেন ঠিক থাকিতেছে না,—তোমরা দেখিয়া রাখিতে পারিলে শরীর থাকিবে, নতুবা নষ্ট হইয়া যাইবে।" সত্যই এক একদিন জলের মধ্যে পড়িয়া যাইতেন। আবার কখনও কখনও এমন হইত, হয়ত বসিয়া আছেন চট্ করিয়া উঠিয়া শাহবাগানটার ভিতরে ভিতরে চারিদিক ঘুরিয়া আসিলেন। মধ্যে মধ্যে যেন কাহারও সহিত কথা বলিতেন বলিয়া মনে হইত। আমরা সঙ্গে থাকিলে শুনিতাম কি যেন কাহাকেও বলিতেছেন।

কোন কোন দিন ভোগের সময় মোটেই কিছু মুখে নিয়ে চাহিতেন না—আবার কোন কোন দিন এমন অন্যমনস্ক, যাহা মুখে দিতেছি খাইয়া ফেলিতেছেন, অন্য দিকে চাহিয়া আছেন আর খাইব না এ কথা আর বলিতেছেন না। আমরা সুবিধা পাইয়া হয় ত দিয়াই যাইতেছি; দুই তিন জনের হয় ত খাইয়াছেন, তবুও কিছু বলিতেছেন না, মুখে নিতেছেন শেষে আমরা ভয় পাইয়া খাওয়ান বন্ধ করিয়া দিলে তখ খেয়াল হয়, চমক ভাঙ্গিবার মত চাহিয়া বলেন, "কি, আ দিবে না? তোমাদের খাওয়ান শেষ হইল?" কাহারা খাওয়াইলাম, কি খাইলেন, যেন মোটেই খেয়ালে আসে নাই একদিন এই অবস্থায় খাইতেছেন, আমিও খেয়াল না করি ইলিশ মাছের মাথা মুখে দিয়াছি, মনে করিয়াছি চিবাই ফেলিয়া দিবেন। কিছুক্ষণ পর রুইমাছের মাথাও দিয়া চিবাইয়া ফেলিলেন কিনা সে খেয়াল করি নাই। কা অনেক সময় ঠিক ঠিক ভাবেই চিবাইয়া ফেলিতে দেখিয়াছি একটু পরে খাওয়াইতে যাইতেছি, দেখিয়া বাবা হঠাৎ বলি উঠিলেন, "কাঁটা চিবাইয়া ফেলিয়াছেন ত?" চাহিয়া দে কিছুই ফেলেন নাই, এই ভয়ঙ্কর কাঁটা খাইয়া ফেলিয়াছে মাও চমক ভাঙ্গার মত চাহিয়া বলিলেন, "আমি কি জানি খাইতে বলিতেছ, খাইয়া যাইতেছি। যখন গ্রহণ করি তখ সবই গ্রহণ। মধ্যে মধ্যে ত্যাগ করিতে হইবে, তা ত বল নাই আমি যে সব সময় কি ফেলিতে হইবে কি করিতে হই

বুঝিয়া উঠি না। স্বাদের কোন পার্থক্য বুঝি না, সবই একরকম লাগিতেছে,—আমি কি করিব?" নিজে খেয়াল করিয়া কাঁটা ফেলিয়া দিই নাই ভাবিয়া খুবই অনুতপ্ত হইলাম। ভাবিলাম সেবা করিবার আমরা অধিকারীই নই। শরীরের অবস্থাও এমন চলিত যে আমরা সর্ব্বদাই আশঙ্কায় থাকিতাম যে আজ না জানি শাহবাগে গিয়া কি অবস্থা দেখি। স্বাভাবিক অবস্থা দেখিলে নিশ্চিন্ত হইতাম।

শুনিলাম বাজিতপুর থাকিতেই—মা নাকি একদিন আরব দেশের দুইটী ফকিরের সূক্ষ্মদেহ দেখিয়াছিলেন—একটী গুরু, দ্বিতীয়টী শিষ্য। মা বলিলেন, "এত পরিষ্কার দেখিয়াছি যে আঁকিতে জানিলে আমি আঁকিয়া দেখাইতে পারিতাম।" একদিন শাহবাগের কাছে শিখদের আখড়ায় গিয়া একটা ছবির মধ্যে একটী শ্বেত শ্মশ্রুধারী শুভ্র-কেশ সৌম্য-মূর্ত্তি বৃদ্ধের ছবি দেখিয়া মা বলিয়াছিলেন, "আরব-দেশের ফকিরের চেহারা কতকটা এই রকম দেখিয়াছিলাম।" তারপর শাহবাগে আসিয়া দুইটী কবর দেখিতে পান—শুনিলেন ইহা আরব দেশের দুইটী ফকিরের কবর, একটী গুরুর ও অপরটী শিষ্যের। শাহবাগেও মা একা একা ঘুরিতে ঘুরিতে আর একবার সেই ফকিরদের দেখিয়াছিলেন।

বাজিতপুরে আরব দেশের ফকিরের দর্শন।

মা বলিয়াছেন, "আরব দেশ কোথায় বা আরব নামে যে একটা দেশ আছে কিছুই আমি জানিতাম না, কিন্তু ঐ ভাবে ভিতর হইতেই সব প্রকাশ হইয়াছিল।"

একদিন দুপুরে বসিয়া আছি,—পূর্ব্বে যে আসন প্রভৃতি হইয়া যাইত সেই কথা উঠিয়াছে। বলিতেছেন "এই যে আসনাদি হইত আমি ইচ্ছা করিয়া কিছুই করিতে পারিতাম না, এমন কি হাত দিয়া ধরিয়াও কিছু করিতে পারিতাম না। শরীর বাঁকিয়া বাঁকিয়া আপনিই এক এক রকমের আসন হইয়া যাইতেছে দেখিতাম, এমন কি এক এক দিনে কত রকমের আসন হইয়া যাইত। একদিন হয়ত একটা আসন হইয়াছে পরে আবার যখন সেই আসনটা হইতে যাইতেছে, আমি ভাবিলাম জানিই ত কি রকম হইবে। হাত দিয়া ধরিয়া একটু ঠিক করিয়া দিতে গেলাম। তাতে পায়ে খট্ করিয়া উঠিল, চোট পাইলাম। এখনও সেই জায়গাটা কেমন কেমন লাগ্ছে"। আবার বলিতেছেন, "তখন ত জানিতাম না আসন আবার কি, কত রকমের আসন আছে, আসনের নামই বা কি—বাহির হইতে কিছুই শুনি নাই। কিন্তু এক এক রকম হইয়া যাইতেছে। আবার কি হইল তাহাও ভিতর হইতেই স্পষ্টই শুনিতেছি, বুঝিতেছি।" শরীরেরও এমন ভাবে ওলট-পালট হইয়া ক্রিয়া হইত যে মনে হইত শরীরে হাড় নাই শুধু মাংস, তাই এইভাবে ঘুরাইতে ফিরাইতে পারেন। কি ভাবে গোলাকার হইয়া যাইতেছেন, নিজের মাথা গিয়া উল্‌টিয়া একেবারে পিঠের মাঝখানে ঠেকিতেছে, হাত পা গুলি এমন ভাবে ঘুরিয়া যাইতেছে, দেখিলে অবাক্ হইতে হয়। মা বলিতেন, "দেখ, যেমন দরজায়

পূর্ব্বাবস্থার বিবরণ।

কবজায় তেল দেওয়া থাকিলে তাহা ঘুরাইতে ফিরাইতে একটুও বেগ পাইতে হয় না, আর মরিচা-ধরা কব্জা একটু নাড়াইতে গেলেই কষ্ট হয়, পারাও যায় না—এই শরীরের গ্রন্থিগুলি যেন তেমনই তেল দেওয়া, সব ধারেই আপনিই ঘুরিয়া যায়। আর ভোগের ভিতর জীবন যাপন করিয়া এক সময়ের জন্য আসন করিতে গেলে মহাকষ্ট, কিছুতেই হাত পা ঠিক করা যায় না, মনে হয় যেন মরিচা ধরিয়া গিয়াছে।" ছোট বেলার কথা বলিতে বলিতে বলিয়াছেন, "একবার আমাকে মা কোলে নিয়া কীর্ত্তন শুনিতে গিয়াছেন—আমার বয়স বোধ হয় তখন তিন বৎসর হইবে। কীর্ত্তন শুনিয়া এখন যেমন কেমন হইয়া যায় তখনও ঠিক তাহাই হইয়া যাইতেছিল। কিন্তু মা ভাবিতেছেন আমি ঘুমে ঢলিয়া পড়িয়া যাইতেছি, তাই আমাকে ধাক্কা দিয়া জাগাইতেছেন। কিন্তু তখন কিছু বলিতে পারি নাই। আর বলিলেই বা বোঝে কে? সময় বোধ হয় হইয়াছিল না। এখন সেই কথা তোমাদের বলিতে পারিতেছি।"

অনেক কথাই ধরা যাইত না। মায়ের শরীরের প্রকাশ মাত্রেই পূর্ণ-জ্ঞান ছিল, কিন্তু যখন যাহা দরকার, উপযুক্ত সময়েই ধীরে ধীরে সে সব প্রকাশ হইয়াছে ও হইতেছে। যখন বিবাহের পর ভাসুরের কাছে ছিলেন সেই বউ অবস্থার কথা বলিতেছেন, "দেখ শরীরটা একবার মেয়ে সাজিল, আবার বউ সাজিল, যখন যেটুকু কর্ত্তব্য সব শরীরের ভিতর দিয়া হইয়া গেল। আবার এই অবস্থা হইয়াছে। এর পর আবার কি

কি হয় কে জানে ? বধূ হইলাম, ভাসুর কখনও মুখ দেখে নাই, অথচ সব সেবা এই শরীর দিয়া হইয়া গিয়াছে। তি আমাকে খুব ভালবাসিতেন।"

ভাবাবস্থায় সিদ্ধেশ্বরীতে গৃহ নির্ম্মাণের আদেশ— ফাল্গুন, ১৩৩২।

একদিন ফাল্গুন মাসে কীর্ত্তনের সময় মার ভা হইয়াছে—কিছুক্ষণ পর কীর্ত্তন সমাপ্ত হইল, মা এক সুস্থ হইলেন ; তখনও আলুথালু বেশে বসিয়া আছেন। এর মধ্যে ভোলানাথে দিকে চাহিয়া বলিলেন, সিদ্ধেশ্বরী ঐ স্থানে যে একটা ঘরের কথা ব হইয়াছিল।" কথা তখনও পরিষ্কার হয় নাই—অমনি বা একটী ভক্তকে দিয়া জিজ্ঞাসা করাইলেন "কি রকম ঘ হইবে ?" মা বলিলেন, "আচ্ছা, কাল কথা হইবে।" পরদি বাবা নিজেই ঘরের কথা জিজ্ঞাসা করিলেন, মাও আবি ভাবে বসিয়া জবাব দিলেন, কত বড় ও কত উঁচু হই সব বলিলেন, কিন্তু যেন স্বাভাবিক অবস্থা নয়। বেদির উপ ঘর উঠাইবার কথা হইতেছিল। বলিলেন, "ঐ যে বাঁশ দি চিহ্ন করা আছে, তাহা যেন উঠান না হয়। তাহার বাহি দিয়াই বেড়া দেওয়া হইবে।" পাকা ঘর করিতে নিষে করিলেন, বলিলেন, "আমি মাটির ঘরেই থাকিব।" বেদি কথা জিজ্ঞাসা করা হইল, "তাহার উপর কি মাটি দেও হইবে ?" তাহার উত্তরে বলিলেন, "কাজ আরম্ভ হউক ত, প যাহা হয় হইবে, এখন কিছু বাহির হইতেছে না।" ভোল

নাথের কাছে বাবা নিবেদন করিলেন। ভোলানাথ গিয়া মাকে বলিলেন, "ঐ ঘর তুলিবার জন্য শশাঙ্কবাবু প্রস্তুত, তোমার অনুমতি চাহিতেছেন।" মা বলিলেন, "তুমি কর, যেই করুক হইলেই হইল।" বাবা সেই ঘর উঠাইতে আরম্ভ করিলেন, ঐ বেদি নিয়া ঐ স্থানে একটা জমি নেওয়া হইল। মা বলিলেন, "সাত দিনের মধ্যে ঘর উঠান চাই।" এর মধ্যে একদিন বেদির কথাও বলিলেন। চোখ বুজিয়া বুজিয়া বলিতেছেন, "বেদির উপর মাটি পড়িবে না। চারিদিক দিয়া ভিটা উঠিবে, ঐ জায়গাটা গর্ত্তের মতই থাকিবে।" বেদিটী চতুষ্কোণ ছিল। বোধ হয় বেদির মাপ চারিদিকেই সোয়া হাত পরিমাণ ছিল। সাত দিনের মধ্যেই খুব তাড়াতাড়ি করিয়া ঘর উঠান হইল। ১৩৩২ সনের ফাল্গুন মাসে প্রথম ঘর উঠিল। মা সাত দিনের দিন সেই ঘরে যাইয়া সকলকে কীর্ত্তন করিতে বলিলেন। তাহাই হইল। নির্দ্দিষ্ট দিনে মা ও ভোলানাথকে নিয়া সকলে সেই ঘরে গিয়া কীর্ত্তন করিলেন। সারারাত্রি কীর্ত্তন হইল, ভোরে মা শাহবাগে ফিরিলেন। মা ঐ ঘরে গিয়া ঐ গর্ত্তের মধ্যে বেদির উপরই বসিতেন। ঐ টুকুর মধ্যেই পা গুটাইয়া শুইয়াও থাকিতেন। বহুক্ষণ এই ভাবে কাটিত, ভক্তেরা চারিদিকে বসিতেন। ইহার পর হইতে মা মধ্যে মধ্যে ঐ ঘরে গিয়া দুই এক দিনও থাকিতেন। কোন কোন দিন কিছুক্ষণ থাকিয়া চলিয়া আসিতেন।

কয়েক দিন পর শুনিলাম ঐ ঘরে মা ৺বাসন্তী

পূজা করিতে বলিয়াছেন। অনেক দিন পূর্ব্বে ভোলানাথের নাকি বাসন্তী পূজা করিবার খুব ইচ্ছা হইয়াছিল, তাই মা এখন তাহা পূর্ণ করাইবেন। মহা আনন্দে ভক্তের

পূর্ব্বোক্ত গৃহে ৺বাসন্তী পূজার অনুষ্ঠান— চৈত্র, ১৩৩২।

পূজার আয়োজন করিতে লাগিলেন। ভোলানাথের আত্মীয়স্বজনদের খবর দেওয়া হইল। ইতিমধ্যে কলিকাতা হইতে আমার ছোট ভাই হরিদাস ঢাকায় আসিয়াছে। সে কলিকাতায় বি, এ, পড়িতেছিল। সে শুনিয়াছিল আমরা কোন এক মাতাজীর ভক্ত হইয়া পড়িয়াছি। এর মধ্যে মার আদেশে আমার চিঠি-পত্র লিখা বন্ধ হইয়াছিল। সে তাহাতে মহা দুঃখিত হইয়াছিল তাহার গর্ভধারিণী মা প্রায় দেড় বছর হইল মারা গিয়াছেন। আমাদের এই অবস্থা,—সে ঢাকায় আসিয়া মহা দুঃখ প্রকাশ করিতে লাগিল। আমরা কিছু বলিলাম না, কারণ ইহা বু বুঝাইবার জিনিষ নয়। একদিন ৺বাসন্তী পূজা উপলক্ষে মা নিজে গিয়া চট্টগ্রাম হইতে পিসিমাকে (কালীপ্রসন্ন কুশারী মহাশয়ের স্ত্রীকে) নিয়া আসিয়াছিলেন। এই পিসিমার চেহারা দেখিতে অনেকটা আমাদের গর্ভধারিণীর মত। মা তাঁহাকে নিয়া আমাদের টিকাটুলীর বাসায় বেড়াইতে গেলেন। মার কি উদ্দেশ্য মা-ই জানেন। হরিদাস ত মা আসিয়াছে শুনিয়াই অন্য ঘরে গিয়া বসিয়া রহিল। সে শুনিয়াছি আমরা বাসায় বেশী সময় থাকি না, এই মার কাছেই থাকি

কাজেই মার উপর তার খুব বিরক্তি-ভাব ছিল। মা, ভোলানাথ ও পিসিমা সব এক কোঠায় বসিয়াছিলেন। বাবা, হরিদাসকে ডাকিয়া মাকে প্রণাম করিতে বলিলেন। সে কি করে, বাবার কথায় আসিয়া মাকে প্রণাম করিল। মা মৃদু হাসিয়া পিসিমাকে বলিলেন, "এই দেখুন খুকুনীর ছোট ভাই।" পিসিমা স্বভাবতঃ খুব মিশুক ও ধর্ম্মপ্রাণ, ইনি হরিদাসকে দেখিয়াই হাত বাড়াইয়া কোলে নিলেন, হরিদাসও অনেকটা গর্ভধারিণীর মত চেহারা দেখিয়া ইঁহার কোলের কাছে বেশ বসিয়া পড়িল। মা দেখিয়া একটু হাসিলেন, কিন্তু কিছু বলিলেন না। কিছুক্ষণ পর তাঁহারা শাহবাগ ফিরিলেন, আমি ও বাবা সঙ্গে চলিলাম। দেখিলাম হরিদাসও গাড়ীর পা-দানের উপর দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া কিছুক্ষণ সঙ্গে সঙ্গে চলিল, পরে ফিরিয়া আসিল। ওখান হইতে ফিরিতে আমাদের অনেক রাত্রি হইয়া গেল। ফিরিয়া আসিয়া শুনি ভ্রাতাটী মুখে মাকে কিছু না বলিলেও তাঁহাকে দেখিয়া কেমন হইয়া গিয়াছে। বাসায় আত্মীয় স্ত্রীলোকেরা কয়েকজন ছিলেন। আমরা বাসায় আসিতেই তাঁহারা বলিলেন, "নন্দু (হরিদাসের ডাক নাম) এখনও ঘুমায় নাই, এতক্ষণ মার কথাই সব শুনিতেছিল"। উপরে যাওয়া মাত্রই সে বিছানা হইতে উঠিয়া আমাদের কাছে আসিল। দেখিলাম তার মুখের চেহারা ফিরিয়া গিয়াছে। হরিদাস খুব চাপা প্রকৃতির ছেলে, কিন্তু আজ কেমন হইয়া গিয়াছে। বলিতেছে, "এ

সাধারণ মা নয়, আমি দেখিয়াই যেন কেমন হইয়া গিয়াছি। মনে হইতেছে এখনই আবার যাই। মার সব কথা বল শুনি।" পরদিন আমাদের বাসায় মার ভোগের কথা ছিল। নন্দু বলিল, "আমিই মাকে আনিতে যাইব।" ওর এই ভাব দেখিয়া আমাদের মহা আনন্দ, বসিয়া বসিয়া মার গল্প শুনাইতে শুনাইতে রাত্রি প্রায় ভোর হইল। ভোর হইতেই সে উঠিয়া মুখ ধুইয়া গাড়ী নিয়া মাকে আনিতে চলিয়া গেল। তার পর হইতে সে মার কাছে বেশী সময় থাকিতে লাগিল। মার আদেশে কাজ-কর্ম্মও কিছু কিছু করিতে লাগিল। পড়াশুনা প্রায় বন্ধ। মার পিছনে পিছনেই ঘুরিত। এই ঘটনাটি লিখিবার উদ্দেশ্য এই যে মার অদ্ভুত আকর্ষণ শক্তি প্রথম হইতেই প্রকাশ পাইয়াছিল এবং এক এক জনের ভিতর বিশিষ্ট ভাবে ক্রিয়া করিতেছিল। অনাথের কথা লিখিয়াছি। নন্দুর অবস্থাও দেখিলাম। আজকালকার শিক্ষিত অল্প বয়সের ছেলেদেরও কি ভাবে মত পরিবর্ত্তন হইয়া গেল। নন্দু ত বিরক্তি-ভাব নিয়া এবং আমরা তথায় যাই বলিয়া মহা দুঃখিত হইয়াই আসিয়াছিল। কিন্তু একবার দেখিয়াই এই অবস্থা।

দিদিমা ও দাদামহাশয় আসিয়াছেন। দিদিমাটী অতি শান্ত মানুষ, রাগ বলিয়া কোন জিনিষই বোধ হয় তাঁর মধ্যে নাই। দাদামহাশয় খুব গান করিতে পারেন। বৃদ্ধকে নিয়া সকলেই গান শুনিতেছেন। ভোলানাথের বড় ভগিনী

পতি সীতানাথ কুশারী মহাশয় আসিয়াছেন, তাঁর স্ত্রী, পুত্র, পুত্রবধূ ও একটী শিশু নাত্‌নী আসিয়াছে। শাহবাগে খুব আনন্দ চলিতেছে। রাজসাহীর প্রোফেসর শ্রীযুক্ত অটলবিহারী ভট্টাচার্য্য সস্ত্রীক আসিয়াছেন। ইনি গত গরমের ছুটীতে ঢাকায় প্রাণগোপালবাবুর বাসায় আসিয়া মাকে প্রথম দেখিয়া ও পূজা করিয়া গিয়াছেন, পরে পূজার ছুটীতেও আসিয়াছিলেন। এখন স্ত্রীকে নিয়া আসিয়াছেন। ইহার সন্তানাদি নাই। লোকটী খুবই সরল ও ভক্তপ্রাণ। চেহারা দেখিলেই মনে হয় ভিতর সাদা। গল্প শুনিলাম ইনিও নাকি একদিন মার পায়ে ফুল দিয়া ফেলিয়াছিলেন। শিশুকাল হইতেই ইনি মাছ-মাংস খান না। মার গৃহস্থালী জীবনের যে লক্ষ্মীব্রতের ঘট ছিল মা তাহা অটলদাদার বউকে দিয়াছিলেন। আরও অনেক আত্মীয় এবং ভক্তেরা সব আসিয়াছেন। পূজার আয়োজন খুব সমারোহের সহিতই হইতেছে। এই যে সিদ্ধেশ্বরীতে মার বেদির উপর ঘর হইল ইহার নীচে খুব বড় উইয়ের ভিটি ছিল। ঘর হওয়ার পরও ঘরের ভিতর উই মাটি উঠাইয়া স্তূপাকার করিত। মার আদেশে বাসন্তী-মূর্ত্তি গড়াইবার সময় এই উইয়ের মাটি তাহাতে মিলাইয়া দেওয়া হইল। আমরা সিদ্ধেশ্বরীর ঘরে মা ও ভোলানাথকে নিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "মূর্ত্তির মাপ কি হইবে?" মা ভোলানাথকে একটা কাঠী দিয়া নিজ শরীরের মাপ নিতে বলিলেন। তাই হইল। মার শরীরের মাপেই বাসন্তী

প্রতিমা তৈয়ার করান হইল। পূজা করিবার জন্য বিক্রমপুর হইতে পুরোহিত আসিলেন। চণ্ডীপাঠেরও ব্যবস্থা করা হইল। এদিকে ভোগেরও যোগাড় হইতেছে। শ্রীযুক্ত যোগেশ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় ভাঁড়ার ঘরে রহিলেন। মথুর বসু লোকজন খাটাইতেছেন। কথা হইয়াছে তিন দিনের মধ্যে একদিন মার পূর্ব্ব নিয়মে শুধু মুগডাল, আলু সিদ্ধ ও নারিকেল ভাজার ভোগ হইবে। যত লোক এই তিন দিন উপস্থিত হইবে তাহাদিগকে প্রসাদ দিতে হইবে কিন্তু একবার যাহা পাক হইয়া ভোগ হইয়া যাইবে আর তাহা রান্না হইতে পারিবে না, ইহাই মার আদেশ। এই নিয়মে জিনিষের কে আন্দাজ করিবে? পিসিমারা মাকে বলিলেন, "তুমিই তোমার জিনিষের আন্দাজ করিয়া দিয়া যাও—একবারের বেশী পাক হইতে পারিবে না, অথচ যত লোক আসিবে প্রসাদ দিতে হইবে।" তাই হইল। পিসিমারা ও রাজেন্দ্রকুমারীর স্ত্রী প্রভৃতি ভোগ পাক করিবেন। ষষ্ঠীর দিন হইতে সকলে সিদ্ধেশ্বরী চলিয়া গেলেন। সেইখানে সম্প্রতি কয়েকখানা নূতন বাড়ী উঠিয়াছে, জঙ্গল এখন অনেকটা পরিষ্কার হইয়া গিয়াছে,—সেই সব বাসাতেই ভক্তদের থাকিবার স্থান করা হইল। পুরুষেরা ৺ কালীমায়ের মন্দিরের বারান্দায় থাকিতেন। তখন কালীমন্দিরের বারান্দা ইত্যাদি ভাঙ্গা-ভাঙ্গা ছিল, পরে মন্দিরের অনেক পরিবর্ত্তন হইয়াছে। মা যখন সাতদিন মন্দিরের ছোট কুঠরীতে ছিলেন তখন কুঠরী

টীর বাহিরের দিকে কোন দরজা ছিল না, এখন দরজা হইয়া ঘর পরিষ্কার হইয়াছে। ষষ্ঠীর দিন অধিবাস ইত্যাদি হইয়া গেল। সপ্তমী পূজা আরম্ভ হইল। মা অতি প্রত্যুষেই একবার যাইয়া কালীবাড়ীর পুষ্করিণীতে স্নান করিয়া আসিলেন ও ভাঁড়ার ঘরের দিকে যাইয়া কি কি পরিমাণ পাক হইবে তাহা বলিয়া দিলেন। পরে প্রতিমার সম্মুখে ঐ বেদির উপর গহ্বরের মধ্যে বসিয়া রহিলেন—সারা দিনরাত আর উঠিলেন না। একটু সামান্য দুধ সন্ধ্যার পূর্ব্বে কি পরে খাইলেন। পুরোহিত পূজা করিবার পূর্ব্বে ভোলানাথ মাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি বীজমন্ত্রে পূজা হইবে ?" মা একটু চুপ করিয়া থাকিয়া বলিলেন, "বীজ যেন কিছু উচ্চারণ করে না, পূজা সব ঠিক মতই করিবে। যেখানে বীজের উচ্চারণ দরকার হইবে, সেখানে প্রতিবারই যেন একটু চুপ করিয়া থাকিয়া পূজা করিয়া যায়।" মার সব কাজই অসাধারণ। তিনি যাহা বলিয়া দিলেন তাহাই হইল। মা পুরোহিতের অতি নিকটেই গহ্বরে বসিয়া আছেন,—ঘোমটায় মুখ ঢাকা, হাতে সর্ব্বদাই প্রায় কোন প্রকারের মুদ্রা থাকিত, এখনও তাই আছে। পূজা হইয়া গেল, ভোগও হইয়া গেল,—সকলে প্রসাদ পাইল। রাত্রিতে মা ঐ গহ্বরের মধ্যেই কখনও বসিয়া থাকিতেন, কখনও পা গুটাইয়া শুইয়া থাকিতেন। এই গহ্বরের মাপ যজ্ঞ কুণ্ডের মাপ। মা তাহাতে বেশ শুইয়া থাকিতেন। সঙ্কুচিত হইবার ক্রিয়া শরীরে না হইয়া গেলে ঐ গহ্বরে কখনও শুইয়া থাকা সম্ভব নয়।

বিশেষতঃ মার শরীর তখন বেশ লম্বা ও মোটা ছিল। ঐ ঘরে একধারে ভোলানাথ শুইলেন। আমিও মার গহ্বরে কাছে শুইয়া থাকিতাম। আর কেহ ঐ ঘরে থাকিতেন না। পরদি আবার সব জিনিষেরই ভোগ হইবে। মথুর বসু চাকরদে দিয়া রাত্রির মধ্যেই সব পরিষ্কার করিয়া ভোগের বন্দোব করিতেছেন। কীর্ত্তন মধ্যে মধ্যে চলিতেছে। পরদিন মহাষ্টমী আজও পূজাদি হইয়া গিয়াছে, ভোগ আনিতে একটু দে হইতেছে, মা কাঁদিয়াই আকুল। এই হাসি-কন্নার অর্থ আম কিছু বুঝিতাম না। কখনও কাঁদিয়া আকুল হইতেছেন, কখন হাসিতে হাসিতে সমাধিস্থ হইয়া পড়িতেছেন। কখনও অট্ট হাসি হাসিতেছেন। ভোগ তাড়াতাড়ি নিয়া আসিলা ভোগ হইয়া গেল, সকলে প্রসাদ পাইতে বসিলে যত লোক উপস্থিত হইতেছে সকলেই প্রসাদ পাইতেছে এই ভাবে বেলা প্রায় শেষ হইয়া আসিল। রান্নাঘরে জিনিষও প্রায় শেষ। বড় বড় বাসন সব খালি করিয়া বা করিয়া দেওয়া হইতেছে—চিন্তাহরণ সমাদ্দার (পুলিশ স ইন্‌স্‌পেক্টর) রান্নার সব জিনিষ তুলিয়া দিতেছিলেন, নিজেদের কয়েকজনের মত জিনিষ আছে। তাহা রা তিনি সব বাসন বাহির করিয়া দিয়াছেন। সন্ধ্যার একটু পূ একদল স্ত্রীলোক ও পুরুষ প্রতিমা দর্শন করিতে আসিয়া কিন্তু প্রসাদ বিশেষ কিছু নাই। "একবারের বেশী পাক হই পারিবে না" এই কথা কাহারও মনে নাই,—ভোলানাথ ও সক

ব্যস্ত হইয়া ভাত বসাইয়া দিতে বলিলেন, তখনি চারি হাঁড়ি ভাত বসাইয়া দেওয়া হইল। মা গহ্বরে স্থিরভাবে প্রতিমার দিকে মুখ করিয়া বসিয়া আছেন। আমি গিয়া মাকে বলিলাম, "মা, প্রসাদ বিশেষ কিছু নাই, অনেক লোক আসিয়াছে।" মা মুখ না ফিরাইয়াই বলিলেন, "যাহা আছে তাহাই দিয়া দিতে বল, পরে তোমাদের যাহা হয় হইবে, আর যেন পাক না হয়"। তখন মনে হইল পাক করা নিষেধ ছিল। আমি গিয়া বলাতে চিন্তাহরণবাবু যে সব বাসন বাহিরে রাখিয়াছিলেন তাহাতে হাত দিয়া কিছু কিছু পাইলেন। যাহা ছিল সব মিলাইয়া তখনই ঐ দলকে খাওয়াইতে বসাইয়া ঐ সব দিয়াই খাওয়াইয়া দেওয়া হইল। আশ্চর্য্যের বিষয় তাঁহারাও পেট ভরিয়া খাইয়া গেলেন অথচ আমাদের সকলের জন্যই রহিল। ঐ চারি হাঁড়ি ভাত নামাইয়া রাখা হইল, একটুও খরচ হইল না। পরদিন তাহা বিলাইয়া দেওয়া হইল।

সপ্তমীর দিন সন্ধ্যার পরই ভয়ানক ঝড় উঠিল—ঘর পড়িয়া যাইবার উপক্রম হইল। রান্নার ছাপড়া কোথায় উড়িয়া পড়িয়া গিয়াছে। মা ঝড়ের সঙ্গে সঙ্গেই উঠিয়া দাঁড়াইয়া দুলিতেছেন ও মহা আনন্দে হাসিতেছেন। হাতে তালি দিতেছেন। এদিকে ক্রমশঃই ঝড়ের বেগ বাড়িতে লাগিল। ভোলানাথ মহা ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন, তাঁরও মনে মনে বেশ জানা ছিল মা ইচ্ছামত সব করিতে পারেন। তাই মাকে বলিলেন, "এ আবার কি আরম্ভ হইল, প্রতিমার যেন কিছু

৯

না হয়।" মহা ব্যস্ত হইয়া এই কথা বলিলেন। মা বাতাসে
বেগের সঙ্গে সঙ্গে যেন মাতিয়া উঠিলেন। অনেকেই আসি
পূজার ঘরে দাঁড়াইয়াছেন, ঘর ভরিয়া গিয়াছে, আমরা তখ
নাম-সংকীর্ত্তন আরম্ভ করিলাম। মা তখন কীর্ত্তনের সঙ্গ
মধ্যে মধ্যে অতি মধুরস্বরে "হরিবোল" করিতেন তাই তখ
"হরিবোল" বলিয়াই কীর্ত্তন হইত। পরে জ্যোতিষদাদা "মা
"মা" কীর্ত্তন আরম্ভ করাইয়াছেন। শেষে শুনিলাম মাও নাকি
একদিন রাত্রিতে নিজে নিজেই "মা" "মা" কীর্ত্তন করি
ছিলেন, কিন্তু জ্যোতিষদাদা তাহা জানিতেন না। তিনি
"মাতৃনামই হউক," এই ভাবিয়া ঐ প্রকার কীর্ত্তন আর
করিয়াছিলেন। ঝড়ের বেগের সঙ্গে সঙ্গে কীর্ত্তনও খুব জো
চলিতে লাগিল। বাবা শুধু হাত জোড় করিয়া মার দি
চাহিয়া "মা" "মা" বলিয়া ডাকিতেন। তিনি কীর্ত্তনের স
যোগ দিতেন না, চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতেন, মার ভ
হইলেই হাত জোড় করিয়া শুধু "মা" "মা" বলিয়া আস্তে আ
ডাকিতেন। আজও তাই করিতেছেন। এর মধ্যে মা এ
ঝড়-বৃষ্টির মধ্যেই বাহির হইয়া পড়িলেন, সঙ্গে সঙ্গে সক
বাহির হইয়া পড়িল, মা নানা জায়গা ঘুরিয়া ঘুরিয়া শে
কালীমায়ের মন্দিরে গিয়া ঢুকিলেন। সেখানে কিছু
থাকিয়া বাহির হইলেন। এবার গিয়া পাশেই রাজমোহনবা
বাড়ীতে একটা ছোট ঘরে ঢুকিয়া দরজা বন্ধ করিয়া দিলে
সেই বাড়ীতে মেয়েদের থাকিবার জায়গা হইয়াছিল।

পূজা উপলক্ষে ভোলানাথের বড় ভাই রেবতীবাবুর স্ত্রী, তাঁহার মেয়ে লাবণ্য ও তাঁহার জামাতা প্রভৃতি সকলেই আসিয়াছিলেন। এই মেয়ের জন্মের সময় আঁতুর-ঘরে মা গিয়াছিলেন। মেয়েটী খুবই সাদা-সিধা রকমের। মা ঘরে ঢুকিতেই বাবা পূজার ঘরের দিকে চলিয়া যান, গিয়া দেখেন সেই ঘরের কাছেই কাদামাটীর মধ্যে লাবণ্য লুটাপুটি খাইতেছে, সমস্ত শরীর কাদায় ঢাকিয়া গিয়াছে, শুধু "হরিবোল" এই শব্দ শুনা যাইতেছে। বাবা গিয়া তাঁকে উঠাইলেন,—তাঁর প্রসন্ন মূর্ত্তি, কোন খেয়াল নাই, শুধু হাসি-হাসি মুখে "হরিবোল" বলিতেছে। এই অবস্থা সকলে গিয়া দেখিল। ভোলানাথ দৌড়িয়া গিয়া মাকে ডাকিয়া নিয়া আসিলেন। কাদা পরিষ্কার করিয়া ধোয়াইয়া দিয়া কাপড় ছাড়াইয়া মেয়েটীকে মা রাজমোহনবাবুর বাড়ীতেই নিয়া যাইতে বলিলেন। মা-ও সেখানে গেলেন। মেয়েটীর অপূর্ব্ব অবস্থা। বাহ্যজ্ঞান রহিত, শুধু নামের রসেই যেন ডুবিয়া গিয়াছে। অবস্থা দেখিয়া তাহার মাতা ও স্বামী মহা ব্যস্ত। তাহার মাতা মাকে গিয়া ধরিলেন, "শীঘ্রই এই ভাব কমাইয়া দেও, এই রকম হইয়া কি করিয়া গৃহস্থালী চলিবে?" মেয়েকে বলিতেছেন, "আর আমি তোমাকে ঢাকার খুড়ীমার কাছে আসিতে দিতেছি না, এখানে আসিয়াই এই অবস্থা হইল"। ভয়ানক রাগ করিতেছেন। মেয়েটী ঐ আবিষ্ট-ভাবেই মার দিকে চাহিয়া বলিতেছেন, "দেখুন ত খুড়ীমা আমি কি পাগল হইয়াছি নাকি। মা এমন করিতেছেন কেন? কি

মধুর নাম, আপনিই ত' শিখাইয়াছেন, ঐ নাম ছাড়া আর কি
আছে" ? মা যখন ভাবাবস্থায় গহ্বরের মধ্যে উঠিয়া দাঁড়া
তখনই মেয়েটি "খুড়িমার কি হইল" বলিয়া মাকে গিয়া জড়াই
ধরিয়াছিল, মাকে স্পর্শ করিয়াই সে কেমন হইয়া পড়ে, তাহা
পর সকলে ঘর ছাড়িয়া মার সঙ্গে চলিয়া যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে
মেয়েটিও ভাবাবস্থায় ঘর হইতে গড়াইয়া গড়াইয়া নীচে পড়ি
যায়। কীর্ত্তনাদির গোলমালে কেহ তাহা লক্ষ্য করে নাই
মা মেয়েটীকে নিয়া একান্তে একটী ঘরে বসিলেন, আমি
সেই ঘরে ছিলাম। মা আমাকে বলিলেন, "দেখ, এ
এর যে অবস্থা এই অবস্থা অনেক সাধনায়ও মিলে না। কি
কি করিব? এর মা প্রভৃতি কেহ অবস্থা বুঝিতেছে ন
আমি কি করব?" এই বলিয়া মেয়েটির শরীরের উপর এ
কি ক্রিয়া করিতে লাগিলেন, মেয়েটী কিছুক্ষণ স্বাভা
অবস্থায় আসিতেছে আবার কেমন হইয়া যাইতেছে।
বলিলেন, "দেখ, যেমন বড় আগুনে একধারে জল ঢালি
অপর ধারে জ্বলিয়া উঠে, এ-ও তাই হইতেছে।" ধ
ধীরে মেয়েটী অপেক্ষাকৃত সুস্থ হইল, কিন্তু প্রায় তিন দি
পর্য্যন্ত সে এই অলৌকিকভাবে বিভোর ছিল। নবমী পূ
দিন আলু-সিদ্ধ, মুগের ডাল ও নারিকেল ভাজার ভো
হইল। মেয়েটী পূজার কাছে গিয়া বসিয়া একদৃষ্টিতে প্রতি
মুখের দিকে চাহিয়া চাহিয়া একটু একটু হাসিতে হাসি
আমাকে বলিল, "দিদি, দেখুন, প্রতিমার মুখ ঠিক কাকী

মুখের মত দেখাইতেছে।" মা আমাকেও বলিয়াছিলেন, "সর্ব্বদা লাবণ্যের সঙ্গে সঙ্গে থাকিও ও এইভাবের কথা বলিলেই বাধা দিও।" ভ্রাতৃবধূ ও জামাতার কথায় ভোলানাথও মাকে ধরিয়াছিলেন, "যাহাতে লাবণ্যের এই ভাব না থাকে তাই করিয়া দাও।" তাই মা বলিতেছেন, "আমার কি? উহার আত্মীয়েরা এই ভাব ভাঙ্গিতে বলিতেছে, তাই হউক। যাহা হইবার হইবে।" মেয়েটীর কথার উত্তরে আমি বলিলাম, "কাকীমার কি দশ হাত নাকি? কি বলিতেছ ও সব।" মেয়েটী বলিল, "সত্যি কথাই বলিতেছি। দশ হাত কি সকলে দেখিতে পারে? মানুষের সঙ্গে মিলিয়া থাকিবার জন্য দশ হাত লুকাইয়া দুই হাত দেখাইতেছেন।" এই বলিয়া প্রতিমার দিকে ও মার দিকে পুনঃ পুনঃ চাহিতে লাগিল। মার এই অবস্থা হইবার পর এই মেয়েটী আর মাকে দেখেও নাই। আজ আবিষ্ট অবস্থায়ই এই সব কথা বলিতেছিল। নবমী পূজা নিয়ম মত হইয়া গেল। দশমীর দিন সিদ্ধেশ্বরীর বাড়ীর কাছে একটী পুষ্করিণীর মধ্যে প্রতিমা বিসর্জ্জন করা হইল। এই পূজার পরেও কয়েকদিন সকলেই সিদ্ধেশ্বরীতে ছিলেন। পূজার কয়েকদিন পরেই মার সহোদর ভ্রাতা মাখনের (যদুনাথ ভট্টাচার্য্য) উপনয়ন এই স্থানেই হইল। আর এক কথা—অষ্টমী পূজার দিন পিসিমা (কালীপ্রসন্ন কুশারীর স্ত্রী) ১০৮টী জবা ও ১০৮টী পদ্মফুল দিয়া মার পা পূজা করেন। মা গহ্বরের মধ্যেই বসিয়াছিলেন, উনি উপরে বসিয়া পূজা করিয়াছেন। ভ্রাতৃবধূর প্রতি আজ তাঁহার দেবী-ভাব

আসিয়াছে, তাই ঐ ভাবে পূজা করিতে পারিলেন। দশ
দিন রাত্রিতে মাকে পিসিমা ভাত খাওয়াইয়া দিলেন। কয়ে
দিন পরে সকলে শাহবাগে চলিয়া গেলেন।

মার প্রতি সীতানাথ কুশারী মহাশয়ের দেবীভাব।

শাহবাগে একদিন কীর্ত্তন হইতেছে। আত্মীয়েরা তখ
শাহবাগেই আছেন। বৃদ্ধ সীতানাথ কুশারী মহাশয়ও কী
করিতেছেন। মার ভাব হইয়াছে, গড়াগ
দিতেছেন, হঠাৎ মার হাত বৃদ্ধের প
লাগিয়া গেল। এই বৃদ্ধই ভোলানাথ
বিবাহ করাইয়া আনিয়াছেন। ইনি খুব ধর্ম্মভীরু লোক ছিল
ও মাকে দেবীর মত শ্রদ্ধা করিতেন। কীর্ত্তনাদির পর কুশ
মহাশয় বলিলেন, "আমি পায়ের ধূলা না নিয়া খাইব ন
আমার পায়ে মায়ের হাত লাগিয়াছে"। ইনি ভোলানাথে
সর্ব্বজ্যেষ্ঠ ভগিনীপতি। মা একেই ত কাহাকেও পায়ে হ
দিতে দেন না, তার মধ্যে এই বৃদ্ধকে দিতে কিছুতে স্বীক
করিতেছেন না। কিন্তু বৃদ্ধ বলিতে লাগিলেন, "আমি বি
করাইয়া আপনাকে আনিয়াছি, কিন্তু আজ আমার কাছে আপ
রমণীর (অর্থাৎ ভোলানাথের) স্ত্রী নন্। আমি জানি আপ
দেবী, আমি পায়ের ধূলা না নিয়া জলগ্রহণ করিব না
অগত্যা, মা তাঁহাকে পায়ের ধূলা দিলেন। সেই উপল
সকলেই পায়ের ধূলা লইয়া ধন্য হইল।

আত্মীয়েরা সকলে বিদায় নিবেন। সীতানাথ কুশ
মহাশয়ের একমাত্র পুত্র মঙ্গলদাদার বধূটীর সন্তান বাঁচে না, এ

সন্তান বড় হইলে দ্বিতীয় সন্তান গর্ভে আসিতেই পূর্ব্বটী মারা যায়, এই ভাবে দুইটী সন্তান মারা গিয়াছে। এবার একটী মেয়ে কোলে নিয়া আসিয়াছেন, বয়স প্রায় দুই বৎসর হইবে। বধূটীর আবার গর্ভাবস্থা। মার কাছে কাঁদিতেছেন, "এবার হয়ত এই মেয়েটীও মারা যাইবে"। শেষে সকলে মিলিয়া পরামর্শ করিয়া এই শিশু-মেয়েটীকে মার পায়ে দিয়া গেলেন। মেয়েটীর নাম মরণী। সেই অবধি মরণী মার কাছেই থাকে। মটরী পিসিমাই উহাকে লালন-পালন করিতে লাগিলেন। ভোলানাথ এই মেয়েটীকে খুবই স্নেহ করেন। মা কোথাও বাহির হইয়া গেলে এ কখনও সঙ্গে সঙ্গে যায়, কখনও মটরী পিসিমার কাছেই থাকে। সর্ব্বদা হরিসংকীর্ত্তন শুনিতে শুনিতে মেয়েটীও সুন্দর নাম গান করিত। মা মরণীকে আর তাহার পিত্রালয় যাইতে দেন নাই। ঘটনাচক্রে এর পর মরণীর মার যে সন্তান জন্মিল সেইটী মারা গেল। পরে আরও দুইটী সন্তান হইয়া জীবিত আছে।

মরণীকে আশ্রয় দান।

সকলেই চলিয়া গিয়াছেন। শাহবাগে দিন দিনই আনন্দ স্রোত বাড়িতেছে ও মার নানা অবস্থার প্রকাশ হইতেছে। মাকে দর্শন করিতে অনেকেই আসিতেছেন। এখন অন্যান্য বাসায় গিয়াও কীর্ত্তন হয়। মা যান, ভাব খুব হয়। সকলেই দর্শন করিতেছে। জ্যোতিষ দাদা একবার দর্শন করিয়া প্রায় এক বৎসর আর আসেন নাই। তিনি একখানা বই লিখিয়া-ছিলেন, পরে একদিন সেই বইখানা মাকে পড়িয়া শুনাইবার

জন্য একজনকে পাঠাইয়া দেন। মা বলিলেন, "যে বই লিখিয়াছে তাহাকে পাঠাইয়া দিও।" এই আহ্বানে জ্যোতিষ দাদা আবার আসিয়াছেন। এবার মা তাঁহার সহিত বেশ কথাবার্ত্তা বলিলেন। তিনি দেখিলেন মার বধূত্ব গিয়া মাতৃত্ব ফুটিতেছে। ইহার পর হইতে তিনি প্রায়ই আসিতেন। ভিড়ের মধ্যে বড় থাকিতেন না, কিন্তু সর্ব্বদাই মার খবর নিতেন। মার চিন্তায় তিনি এত মগ্ন থাকিতেন যে কখনও কখনও বাসায় বসিয়াও তিনি পরিষ্কার ভাবে মা কি কাপড় পরিয়া আছেন তাহা পর্য্যন্ত দেখিতে পাইতেন। ইনি প্রায়ই একান্তে আসিয়া মার সঙ্গে অনেকক্ষণ কাটাইয়া যাইতেন। ইনি মার একজন বিশেষ কৃপার পাত্র। মার ভাবও ইনি খুব ধরিতে পারিতেন। নিরঞ্জনবাবু জ্যোতিষ দাদার বিশেষ বন্ধু ছিলেন। ইহারা দুই জনেই চট্টগ্রামের লোক। নিরঞ্জনবাবুর বাসায় মাকে নিয়া কীর্ত্তনাদি হইল। টিকাটুলীর বাসায় অনেক সময়ই কীর্ত্তন হইত। মা যাইতেন; কোন কোন সময় রাত্রিতে থাকিয়া ভোরে চলিয়া আসিতেন। মা রাত্রিতে বড় শুইতেন না, আমাদেরও মার কাছে থাকিলে সেই অবস্থাই হইত। সারা রাত্রি মার সঙ্গে জাগিয়াই কাটাইতাম। অনেক রাত্রি এই ভাবেই গিয়াছে। মার খাওয়ার নানা রকম নিয়ম হইতে লাগিল। কয়েক দিন পরে বলিলেন, "আমাকে যে খাওয়াইয়া দিবে তাহাকে রাত্রিতে ফল খাইয়া থাকিতে হইবে।" তাহাই হইল। সেই হইতে আমি একবেলা খাই।

চিন্তাহরণবাবুর স্ত্রী কি স্বপ্ন দেখিয়াছেন—তাঁহারা দীক্ষা নিবেন, তাই মা ও ভোলানাথকে নিলেন। তখন পর্য্যন্ত ভোলানাথ কাহাকেও দীক্ষা দেন নাই, মা ত দীক্ষা দিতেনই না। কিন্তু তাঁহাদের দীক্ষা কি প্রকারে হইল জানা যায় নাই, কাহারও কথা অন্য কাহারও কাছে প্রকাশ করা হইত না। সেই বাসা হইতেই, ভোলানাথ খুব পেটের অসুখ নিয়া আসিয়াছেন। মা-ই ময়লা পরিষ্কার ও অন্যান্য সেবাদি করিতেছেন। পরদিন রাত্রিতে মা একটু শশা খাওয়াইয়া দিলেন। তাহার পর হইতেই ধীরে ধীরে ভাল হইতে লাগিলেন।

ভোলানাথের অসুখ

মা একদিন বসিয়া পূর্ব্বকথা বলিতেছেন, কথায় কথায় দিদিমাকে বলিতেছেন, "মা, আমার জন্মের তের দিনের দিন অমুকে আমাকে দেখিতে আসিয়াছিল না?" দিদিমার হয়ত সেই কথা মনেই ছিল না, পরে মার কথা শুনিয়া মনে পড়িয়া গেল। এই ভাবের সব কথায় বুঝা যাইত মার সব সময়ই পূর্ণজ্ঞান ছিল। ছোটবেলা হইতেই সমাধির মত হইত। বহুদূরে কীর্ত্তন হইতেছে—মা হয়ত ঘরে শুইয়া আছেন, বলিতেছেন, "এই শরীরের একটা অস্বাভাবিক অবস্থা হইয়া গিয়াছে, কিন্তু ঘর অন্ধকার—বাবা মা কেহ দেখিতে পায় নাই। আর আমারও কেমন একটা ভাব ভিতরে থাকিত, যেন কেহ না দেখে। তাই বোধ হয় গুপ্তভাবেই থাকিত।" মার শরীরের প্রকাশের

মার জন্ম ও বাল্য-জীবনের কথা

গল্প শুনিলাম। দাদা মহাশয়ের মা কস্‌বার বিখ্যাত কালীবাড়ীতে যাইয়া বিপিনের একটী যেন ছেলে হয় এই প্রার্থনা দেবী নিকট জানাইতে গিয়া প্রার্থনা করিয়া বসিলেন, "একটী মেয়ে হয়"। বৃদ্ধার এই প্রার্থনার কিছুদিন পরেই মার শরীর প্রকাশ হয়। ছোট বেলা হইতেই মা খুব হাসি-খুসি ছিলেন তাঁহার যে স্বাভাবিক আকর্ষণী শক্তি আজ এত প্রকাশ পাইয়াছে সেই শক্তির প্রভাবে সকলেই মাকে নিয়া আদর করিত। যদি মা গরীবের ঘরেই জন্ম নিয়াছেন, কিন্তু পিতা মাতার য কষ্ট বড় বোঝেন নাই। অনেক পরে আরও দুইটী বো ও ভাইটী জন্মগ্রহণ করে। তার মধ্যেও বড় বোন্‌টী প্র সতর বৎসরের সময় মারা গিয়াছে। তার গল্পও মার কা শুনিয়াছি—সেই বোন্‌টী মৃত্যুর সময় পর্য্যন্ত "দিদি," "দি (মাকে) বলিয়া ডাকিয়া মরিয়াছে। তার জীবনের ঘটনা যাহা শুনিয়াছি তাহাতে একটু বিশেষত্ব ছিল।

আর এক ঘটনা শুনিলাম—আমরা মার কাছে আসিবার দি পূর্ব্বে (বড় দিনের সময়) পিসিমা (কালীপ্রসন্ন বাবুর স্ত্রী) শাহবা

পিসিমার মিষ্টান্ন-ভোগ।

আসিয়াছিলেন। তিনি আসিয়া দেখেন কিছুই খান না। তিনি একদিন মিষ্টান্ন দে দিয়া মাকে খাওয়াইবেন ইচ্ছা করিলেন ভোলানাথকে গিয়া ধরিলেন, কারণ ভোলানাথ কোন ক বলিলে মা তাহা যথাশক্তি রক্ষা করেন। ভোলানাথ জানি মা যাহা করেন ভালর জন্যই। মা ইচ্ছা করিয়া কিছু করেন

তাহা তিনি জানিতেন, তাই মার নিয়মের বিরুদ্ধে বেশী অনুরোধ করিতেন না। আজ তিনি পিসিমার কথায় মাকে খাইবার জন্য অনুরোধ করিলেন। মা বলিলেন, "উপস্থিত মত যাহা হইয়া যায়।" আধ মণ দুধের মিষ্টান্ন পাক হইয়া ছিল। আরও ২।৪ জন নিমন্ত্রিত ছিলেন। তাহারা কিছু কিছু লইয়া ছিলেন। ভোগ হইয়া গেলে মা পিসিমাকে বলিলেন, "কই, মিষ্টান্ন খাওয়াইবেন না?" পিসিমা একটা পাত্রে করিয়া মিষ্টান্ন দিয়াছেন, মা তাহা খাইয়া ফেলিয়া আরও চাহিতেছেন। তিনি আরও খানিকটা আনিয়া দিলেন। এই রূপে ধীরে ধীরে সব মিষ্টান্ন খাইয়া আরও খাইতে চাহিলেন। শাহবাগ সহর হইতে কিছু দূরে; কাজেই লোক পাঠাইয়া পুনরায় দুধ আনাইতে দেরী হইতে লাগিল। দুধ আসিলেই পাক চড়াইয়া দিলেন। কিন্তু দেরী দেখিয়া মার কি কান্না। চাউল সিদ্ধ না হইতেই মার কাছে সব ঢালিয়া দিলেন, মা তাই খাইলেন। মা এই ভাবে প্রায় আধ মণ দুধের মিষ্টান্ন খাইয়া ফেলিলেন, দেখিয়া পিসিমা ভয় পাইয়া গেলেন। তিনি খুব ভক্তিমতী ছিলেন, বুঝিলেন এ ত স্বাভাবিক লোকের খাওয়া নয়। তখন তিনি হাঁড়ি চাঁচিয়া কি মন্ত্র পড়িয়া একটু মিষ্টান্ন মার মাথায় দিয়া দিলেন। তার পর মা আর একটুও খাইতে পারিলেন না সমস্ত শরীর কেমন হইয়া পড়িল। পিসিমা মার মাথায় যে মিষ্টান্ন দিয়াছিলেন তাঁহার মাথায় কাপড়ের সেই জায়গাটা জ্বলিয়া যাওয়ার মত রং হইয়া গিয়াছিল আমরা তাহা দেখিয়াছি।

কোন মন্দিরে বা অন্য কোন স্থানে কখনও মাকে প্রণাম করিতে দেখি নাই। তাঁহার মুখে শুনিয়াছি যে, গত যোল বৎসর হইতে তাঁহার প্রণাম করা বন্ধ হইয়াছে। এই প্রসঙ্গে তিনি বলিয়াছেন যে, গত ১৩২৮ সনের ফাল্গুন মাসে তাঁহার ছোট ভগিনী সুরবালা ও হেমাঙ্গিনীর বিবাহের শুভ রাত্রির দিন দিদিমা ও দাদামহাশয় মেয়ে-জামাই লইয়া ঢাকেশ্বরীর বাড়ী পূজা দিতে গিয়াছিলেন, মাও সঙ্গে ছিলেন। মা মন্দিরে গিয়া ঢাকেশ্বরীর মূর্ত্তির দিকে চাহিয়া পদ্মাসনে স্থির ভাবে বসিয়া পড়িলেন। সে অবস্থায় প্রথমে একটা কান্নার ভাব ও তাহার পর হাসির ভাব প্রকাশ পাইল। পরে সাষ্টাঙ্গ পঞ্চাঙ্গ প্রভৃতি দুই তিন রকমের প্রণাম আপনা আপনি হইয়া গেল। সে প্রণাম হইয়া যাইবার পর কিছুক্ষণ পর্য্যন্ত মা শরীর উঠাইতে পারিতেছিলেন না। খানিকক্ষণ পর ধীরে ধীরে উঠিয়া বাড়ী ফিরিয়া গেলেন। পথে সকলকে বলিয়া দিলেন, "এ সব কথা কাহাকেও বলিও না।" ভোলানাথও সঙ্গে ছিলেন, মার মামাত ভাই নিশিবাবুও সঙ্গে ছিলেন। ইনি পণ্ডিত, মাকে ঐ ভাবে প্রণামাদি করিতে দেখিয়া আশ্চর্য্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুই এই সব কাহার কাছে শিখিয়াছিস?" মা বলিলেন, "কাহারও কাছে শিখি নাই, আপনা আপনি হইয়া যাইতেছে।" মার বাজিতপুরে যখন সাধনার খেলা আরম্ভ হয় সেই সময় সঙ্গে প্রণামও বন্ধ হইয়া যায়। প্রথম প্রথম নাকি মোটে

প্রণাম বন্ধ হওয়া।

প্রণাম করিতে পারিতেন না। পরে দেখিয়াছি ঘটনা চক্রে কখনও কখনও ভোলানাথ, দাদামহাশয় ও দিদিমাকে প্রণাম করিয়াছেন। তাহাও কদাচিৎ হইয়া গিয়াছে। ভোলানাথও মাকে প্রণাম করিতেন, তাঁহাদের কি ভাব তাঁহারাই জানেন। এই প্রণামের প্রসঙ্গে মা আরও একটী ঘটনা বলিলেন। ভোলানাথ বাজিতপুর থাকিবার সময় একবার তিনি, দাদামহাশয়, দিদিমা ও মা সকলে একত্র হইয়া কস্‌বার কালীবাড়ী যান। সেখানে অন্যান্য সকলের মত মাও প্রণাম ও প্রদক্ষিণাদি করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহার পরেই মার মুখে ও চোখে একটা অসাধারণ ভাবের উদয় হইল। এই ঘটনার বর্ণনা-প্রসঙ্গে মা বলিলেন, "কেমন হইত জান? যে দেবতার নিকট প্রণাম করিতে যাইতাম তাঁহার সঙ্গে যেন একটা একত্বভাব হইয়া যাইত এবং সঙ্গে সঙ্গে শরীরের কেমন একটা অস্বাভাবিক পরিবর্ত্তন আসিয়া পড়িত।" আরও বলিলেন, "ছোটবেলায় আমাকে ঠাকুর ঘরের কাজ করিতে দিত। মা বলিয়া দিতেন, 'সাবধান, ঠাকুর যেন ছোঁয়া না যায়।' কিন্তু কি আশ্চর্য্য, যে কোন প্রকারেই হউক ঠাকুরকে ছোঁয়া হইয়া যাইত। আমি ত কিছু ইচ্ছা করিয়া করি না, বিশেষতঃ মার নিষেধ ছিল, কিন্তু কি করিব? ঐরূপ হইয়া যাইত। পরক্ষণেই মীমাংসা আসিত—আমি ত কিছু ইচ্ছা করিয়া করি না। আরও আশ্চর্য্যের বিষয় বাহিরে আসিয়া এ সব কথা কাহাকেও বলিতে খেয়ালই হইত না।" আমি বলিলাম, "কি করিয়া মনে থাকিবে? যাহা আবশ্যক নয় তাহা ত তোমার

শরীর দিয়া হইবে না। বলিলে হয়ত ঠাকুরের অভিষেক আবার করিতে হইত, কিন্তু তাহার ত প্রয়োজন ছিল না।”

দিন দিনই খাওয়ার নিয়মের পরিবর্ত্তন হইতেছে। কয়েকদিন হয়ত স্বাভাবিকভাবে খাইলেন, আবার ছয়মাস হয়ত মুখে অন্ন দিলেনই না, আমাদের বলিয়া দিলেন—“কেহ আমার মুখে অন্ন দিও না, তাহা হইলে তোমাদেরই ক্ষতি হইবে।” ছয় মাস পরে ভোলানাথ খাইতে বসিয়াছেন, তখন গিয়া খাইতে বসিলেন, মটরী পিসিমাকে বলিলেন, “নিয়া আসেন ত সব ভাত।” তিনি যাহা পাক করিয়াছিলেন সব ভাতই নিয়া আসিলেন। সেদিন তরকারী বিশেষ কিছু ছিল না। বলিলেন, “গাঁদাল পাতা বাটিয়া আন”। তাই আনা হইল, তাহা দিয়াই ৭।৮ জনের ভাত খাইয়া ফেলিলেন। সেদিন যাহা দেওয়া হইল তাহাই খাইলেন। আবার কয়েকদিন নিয়ম হইল—বলিলেন, “বাগানের গাছের যে ফল মাটিতে পড়িয়া থাকিবে তাহাই খাইয়া থাকিব, অন্য কিছু দিও না”। বাগানে বিশেষ কিছু ফল ছিল না—আমগাছ, লিচুগাছই বেশী। আমের দিন নয়। বলিতে গেলে কিছুই খাইতেন না। আবার কয়েকদিন হইতে আমাকে বলিতেছিলেন, “এক নিশ্বাসে যাহা খাওয়াইতে পারিবে, সারা দিন-রাত্রিতে তাহাই আমার আহার”। আর জল পর্য্যন্ত খাওয়া নাই। কাজেই এ

খাওয়ার নানা প্রকার নিয়ম।

নিশ্বাসে জল পর্য্যন্ত খাওয়াইতে হইত। দেখিলেন ইহাতেও মনের মত বোধ হয় হইল না। শেষে বলিলেন, "দূর্ব্বা যে ভাবে দুই তিন আঙ্গুল দিয়া তুলিতে হয়, সেইভাবে এক নিশ্বাসে দুই তিন আঙ্গুলে যাহা উঠে তাহাই খাওয়াইবে।" মোট কথা না খাওয়াই উদ্দেশ্য। এই ভাবেই দিন কাটিত। ভাত ত খাইতেনই না, কিন্তু দুধ ফল কিছুর বন্দোবস্তও রাখিতে দিতেন না। কিছু বন্দোবস্ত রাখিলেই তাহা ভাঙ্গিয়া দিতেন। একবার মা কিছুই খান না বলিয়া জ্যোতিষ দাদা মটরী পিসিমাদের বলিয়া দিলেন, "আমি ময়দা ও ঘি পাঠাইয়া দিব, রোজ মাকে ২।৪ খানা লুচি ভাজিয়া খাওয়াইয়া দিবেন।" ময়দা ও ঘি তাঁহারা সরাইয়া রাখিতেন। মাকে না দেখাইয়া জ্যোতিষ দাদার লোক ঘি ও ময়দা দিয়া যাইত। মা দেখিলেই ত একদিনেই সকলকে বিলাইয়া শেষ করিয়া দিবেন। কয়েকদিন মা ঠিকভাবে এই সেবা গ্রহণ করিলেন, শেষে একদিন মা বলিলেন, "যত ময়দা-ঘি ঘরে আছে লুচি ভাজিয়া নিয়া এস।" এদিকে জ্যোতিষ দাদাকেও ডাকিয়া পাঠাইলেন। তিনি আসিলে তাঁহাকে বলিলেন, "দেখি কত লুচি খাওয়াইতে পার।" এই বলিয়া যত লুচি ভাজা হইয়াছিল (৬০।৭০ খানা) সব মা খাইয়া ফেলিলেন। হাসিয়া বলিলেন, "আরও থাকিলে আরও খাইতাম। কিন্তু আমি এই ভাবে খাইলে কয়দিন খাওয়াইতে পারিবে"? এই বলিয়া হাসিতে লাগিলেন। বলিলেন,

"আমি রোজ ঠিকভাবে খাইতে আরম্ভ করিলে তোমাদে কাহারও টাকায় কুলাইবে না। তার চেয়ে বলিতেছি আ হইতে আর ঘি-ময়দা পাঠাইও না। এইভাবে বন্দোব করিয়া আমরা খাওয়া চলিবে না।" সেই সময় হইতে অনে দিন পর্য্যন্ত লুচি খাইতেন না। এইরূপ অনেক সময় দেখিয়াছি কিছুই খাইতেছেন না, একজন আসিয়া অনুরোধ করি খাওয়াইতে বসাইয়াছে, মা গম্ভীরভাবে খাইতে বসিলে সেইরূপ অন্যমনস্ক ভাব। আমি হয়ত খাওয়াইতেছি, কিন্তু তাহা সেদিন হইতেছে না, বলিতেছেন "দেরী হইয়া যায়। আর একজনকে ডাক"। দুইজনে খাওয়াইয়া দিতেছি, তাও পারিয়া উঠিতেছি না, খাইয়াই যাইতেছেন, স্থিরভাবে বসি খাইতেছেন। এই অবস্থা দেখিয়া যে খাইতে বলিয়াছিল সে পাইয়া যাইত, শেষে খাওয়ান বন্ধ করিয়া দেওয়া হইত। অ মা বলিতেন, "আর দিবে না? একবার বল 'খাও', আব খাইতে আরম্ভ করিলে দিবে না। আমি কি করি বল তো ভোলানাথও অনেক সময় পীড়াপীড়ি করিয়া খাওয়াইয়া এ অবস্থা দেখিয়া ভয় পাইয়া খাওয়ান বন্ধ করিয়া দিয়াছে এইজন্যই মাকে এ বিষয়ে বেশী অনুরোধ করিতেন না অনেক সময় আবার ইহাও দেখা গিয়াছে, মা নি ইচ্ছা করিয়া অসম্ভব রকমে খাইলে, কিছুই হইত না কিন্তু অপর কেহ পীড়াপীড়ি করিয়া খাওয়াইলে খাইতে বটে, কিন্তু অল্প সময়ের মধ্যেই এমন একটা অসুখ হই

পড়িত যে, যাহারা খাওয়াইয়াছে তাহারা অপ্রস্তুত হইত, আর কখনও পীড়াপীড়ি করিতে সাহস করিত না। আবার কিছু সময় পরে আপনিই অসুখ ভাল হইত। কিন্তু সকলের চমক লাগিয়া যাইত। কয়েকদিন আবার এমন দেখিয়াছি—বলিয়া দিয়াছেন, "রোজই আমার মুখে দুই একটা হইলেও ভাত দিও"। কিন্তু হয়ত ঘটনা-চক্রে সেদিন খাওয়াই হয় নাই, রাত্রিতে সিদ্ধেশ্বরী গিয়াছেন, সেখানেই থাকিবেন, খাওয়ার বন্দোবস্ত সেখানে কিছুই নাই। কেহ করিতে ব্যস্তও হইত না। মার গতি-বিধির ঠিক ছিল না—তাই বন্দোবস্ত করা সম্ভব হইত না। রাত্রিতে সিদ্ধেশ্বরীতে বলিলেন, "আজ ত ভাত মুখে দেওয়া হয় নাই।" তখনই কাহারও নিকট দুই একটা চাউল চাহিয়া আনাইয়া পাটশলা জ্বালাইয়াতার মধ্যে দিয়া পোড়াইয়া চাউল দুইটী মুখে দিয়া দিতে বলিতেন। এইরূপ একদিন আমি সিদ্ধেশ্বরীতে করিয়াছি। এইরূপ অদ্ভুত ভাবেও নিয়ম রক্ষা করিতেন। মা যে রোজই খাইতে বসিবেন এই নিয়মই ছিল না,—শুইয়া আছেন, কেহ প্রসাদ না লইলে খাইবেন না। আমরা মুখে একটা কিছু ছোঁয়াইয়া আনিতাম। এই হইল আহার। পড়িয়া থাকিবার ভাবটাই ছিল খুব বেশী। কথাও অনেক সময় জড়াইয়া আসিত।

মধ্যে মধ্যে হঠাৎ মৌনী হইয়া যাইতেন। আমাদের তখন মহা দুঃখ হইত। প্রথম প্রথম মৌনী হইয়া ভোলানাথের সঙ্গে

তুই একটী কথা বলিতেন, শেষে আর তাহাও বলিতেন না। ইসারা-ইঙ্গিত কিছুই নাই। একেবারে কো ভাবই চোখে-মুখে প্রকাশ পাইত না। পূর্বে তিন বৎসর মৌনের কথা বলিতেন, "শু

কথা বলার নিয়ম

ভোলানাথের সহিত অতি ধীরে তুই একটী কাজের ক হইয়া যাইত। আর কিছুই বাহির হইত না।" এ অবস্থায় ভোলানাথের সকলের ছোট ভাই যামিনীবাবু এক বাজিতপুর যান, তখন তাঁহার বয়স খুব বেশী নয়। গি দেখেন মা মৌনী, তাঁর খুবই কষ্ট হইল,—গর্ভধারিণীও জীবি নাই, ভ্রাতৃবধূর কাছে গিয়াছেন, কিন্তু তিনিও কথা বলিবে না। অতি দুঃখের সহিত তিনি একদিন বলিয়াছিলেন, "বৌ আমার সঙ্গেও কথা বলিবেন না ?" মা এই প্রসঙ্গে বলিতেছে "আমি ত ইচ্ছা করিয়া কিছুই করি না। তাহার এ কথার কিছুক্ষণ পর নিজের আঙ্গুল দিয়াই যেখানে বসিয়া তার চারিদিকে মাটির মধ্যে কুণ্ডলী হইয়া গেল, প ভিতর হইতে ঠেলিয়া যেন কি বাহির হইতে লাগিল। এ পরে এখন যেরূপ স্তোত্র ও মন্ত্রাদি হয় এইরূপ বাহি হইল, তার পর তাহার সহিত কথা বলিতে পারিলাম। হইতেই কোন সময়-অসময় ছিল না। হয়ত পুকুরে ক করিতে গিয়াছি, সেইখানেই এইরূপে কুণ্ডলী হইয়া যাই কথা বলিতে পারিতাম, আর আপনিই কথা বন্ধ হইয়া যাই কুণ্ডলী মুছিয়া উঠিয়া পড়িতাম। এইরূপ কত অবস্থাই গিয়াছে, ইয়ত্তা নাই।" দেখিতাম যিনি আসিয়া যে ভা

ভাবাবস্থায় শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী

কথাই বলিতেন, মা অমনিই তাহা ধরিতে পারিতেন। কোন উচ্চ অবস্থার সাধনার কথা উঠিলেও, মা তাঁহার সাধারণ ভাষায় সব বুঝাইয়া দিতে পারিতেন। কোন ভাবই যেন তাঁহার অজানা নাই। আমি যখন বলিয়াছি, "মা, বাজিতপুরে এক ঘরে বসিয়া একা-একা এত অবস্থা হইয়া কি লাভ হইল? কেহ ত দেখিতেও পাইল না—কি লাভ হইল?" মা বলিতেন, "তোদের দরকার ছিল, তাই এই ভাবে হইয়া গিয়াছে। যে সাধনার ক্রিয়াগুলি একান্ত ভাবে হওয়া দরকার তাহা ত এইরূপই হইবে। আবার দেখ, তোরা যখন যেটা জিজ্ঞাসা করিস তখনই বলা হয় এই শরীরের মধ্যেই এইরূপ কিন্তু হইয়াছে ও এই ভাবে হয়। এই কথা গুলিতে তোদের কতকটা ভালভাবে বুঝতে সুবিধা হয় না কি?" মার এই কথায় আমারও মনে হইত ঠিকই ত এই সব মার শরীরে হইয়া গিয়াছে শুনিলে আমাদের যেন কতকটা প্রত্যক্ষ জাগ্রত বলিয়া মনে হয়। চৈতন্য দেবের লীলায় পড়িয়াছিলাম "আপনি আচরি ধর্ম্ম অপরে শিখায়।" মা বলিতেছেন, "দেখ, তাই সবই দরকার।" কত বিপরীত ঘটনার মধ্য দিয়া মাকে চলিতে দেখিয়াছি, কিন্তু কখনও ব্যস্ত হইতে বা অসন্তুষ্ট হইতে দেখি নাই। সব অবস্থাতেই ধীর, স্থীর, শান্তভাব, সবটাতেই আনন্দ। যাঁহারা মাকে তেমন ভক্তি-শ্রদ্ধা করিতেন না, তাঁহারাও এই কথা স্বীকার করিয়াছেন যে, কখনও মাকে চঞ্চল বা আনন্দশূন্য অবস্থায় দেখেন নাই।

তৃতীয় অধ্যায়।

মার বৈদ্যনাথ-ধাম যাত্রা—
বৈশাখ, ১৩৩৩।

ইতিমধ্যে প্রাণগোপালবাবু মাকে দেওঘর যাইবার জন্য অনুরোধ করিয়া পত্র লিখিলেন। তিনি পেন্সন নিয়া দেওঘরে গুরুর কাছে আছেন। তাঁহার পরিবারও সেখানেই বাসা ভাড়া করিয়া আছেন, প্রাণগোপালবাবু গুরুর আশ্রমেই থাকেন। তাঁহার গুরু বালানন্দ স্বামীজী একজন মহাপুরুষ। তিনি পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করায় মা আমাদের নিয়া ১৩৩৩ সনের বৈশাখ কি জ্যৈষ্ঠমাসে দেওঘর রওনা হইলেন। সঙ্গে ভোলানাথ, বাবা, অটলদাদা, নন্দু, অটলদাদার স্ত্রী ও আমি গেলাম। মা আর কখনও কলিকাতায় যান নাই, এই প্রথম। আমরা গিয়া প্রমথবাবুর বাসায় উঠিলাম। তিনি তখন সপরিবারে কলিকাতায় ছিলেন। দুই এক দিন তথায় থাকিয়া আমরা দেওঘর রওনা হইয়া গেলাম। দেওঘর গিয়া প্রাণগোপালবাবুর বাসায় উঠিয়াছি। ছোট ছেলেটীকে নিয়া প্রাণগোপালবাবুর স্ত্রী বাসায় থাকেন। অতি সুন্দর পরিবার। সকাল বেলা প্রাণগোপালবাবু মাকে গুরুর আশ্রমে নিয়া গেলেন। আমরাও সঙ্গেই গিয়াছি। শিষ্যদের মুখে শুনিলাম

স্বামীজীর বয়স প্রায় এক শত বৎসর। সিদ্ধপুরুষ বলিয়াই পরিচিত। খুব বড় আশ্রম ; দুইটী মন্দির আছে ও ব্রহ্মচারীরা কয়েকজন আছেন। স্বামীজী একটু দূরে একটী মন্দিরে থাকেন। মন্দিরটীর নাম "ধ্যান-মন্দির"। প্রাণগোপালবাবু মাকে ধ্যান-মন্দিরে নিয়া গেলেন। সেখানে স্বামীজীর সহিত মার সাক্ষাৎ হইল। মাকে দেখিয়া স্বামীজী খুবই আনন্দিত হইলেন। তিনি কথায় কথায় মাকে বলিলেন, "মা, একবার সূক্ষ্মভাবে দর্শন দিয়াছিলে, আজ স্থূল শরীরে দর্শন দিতে আসিয়াছ।" রোজই মা প্রাতে ও বৈকালে আশ্রমে যাইতেন। আমরাও সঙ্গে যাইতাম। একদিন স্বামীজীর সহিত মার কথা হইতেছে—মা বলিতেছেন, "এক ছাড়া কিছুই নাই"। স্বামীজী বলিতেছেন, "দুই, তিনও তাঁহার মায়া।" মা কিছুতেই দুই স্বীকার করিতেছেন না। অনেকক্ষণ কথার পর স্বামীজী মার কথাই স্বীকার করিলেন। মা হাসিয়া উঠিলেন। স্বামীজী মাকে কোলের কাছে বসাইয়া লিচু খাওয়াইয়া দিলেন। পরদিন আশ্রমে মাকে খাওয়াইলেন, মাকে এক ছড়া রুদ্রাক্ষ-মালা ও একখানি রক্তবস্ত্র দিলেন। সেখানে কীর্ত্তনে মার খুব ভাব হইল। বৃদ্ধাঙ্গুলীর উপর দাঁড়াইয়া বহুক্ষণ ভাবে নাচিতেছিলেন। মার অবস্থা দেখিয়া স্বামীজী মুগ্ধ হইয়া চাহিয়াছিলেন। মা ঐ ভাব-অবস্থায়ই স্বামীজীর মাথায় হাত দিলেন। পরে ঐ অবস্থায়ই স্বামীজীর হাত ধরিয়া ধ্যানমন্দিরে গেলেন। সেখানে গিয়া গোপনে কিছু কথা হইল। মার কথায় স্বামীজী কিছুদিন পর নিজ

সাধনার স্থানে (তপোবন) গিয়া কিছুদিন ছিলেন। দেওঘরেও এই ভাবাবস্থার কথায় মা বলিয়াছেন, "আমি যেন কোথায় থাকিয়া দেখি শরীরটার এইভাবে ক্রীড়া হইতেছে।" আমরা প্রায় সাতদিন তথায় ছিলাম। সেখানে রাজসাহী কলেজের প্রফেসর গিরিজাশঙ্কর ভট্টাচার্য্য মহাশয়ও যাইয়া মাকে দর্শন করেন ও মার সঙ্গে সঙ্গেই কলিকাতা আসেন। একদিন মার কাছে কি এক কথা বলিয়া গিরিজাবাবু খুব কাঁদিতেছেন, ছেলেমানুষের মত মাথা গুঁজিয়া কাঁদিতেছেন। মা উঠিয়া চলিয়া আসিলেন। এদিক ওদিক ঘুরিতেছেন, এই ভদ্রলোক যে কাঁদিতেছেন সেদিকে ভ্রূক্ষেপও নাই। আমরা বলিলাম, "তোমাকে কি বলিব ? ঐ ভদ্রলোক এভাবে কাঁদিতেছেন আর তোমার ভ্রূক্ষেপও নাই—ওদিকেই যাইতেছ না।" মা হাসিয়া বলিলেন, "কি করিব, আমি ত নিজে ইচ্ছা করিয়া কিছু করিতে পারি না। এক এক সময় শত কাঁদিলেও সেদিকে খেয়ালই হয় না, আবার এক এক সময় কিছু না বলিলেও হয়ত তার কাছে বসিয়া থাকি, শরীরটায় যেমন হইয়া যায়, বিচার করিয়া ত কিছু করিতে পারি না।" এই ভাবটা আরও অনেক সময়ই দেখিয়াছি। দেওঘরে একদিন প্রাণগোপাল-বাবুর বাসায় মার এমন অবস্থা হইয়াছিল যে, জীবনের আশা আমরা ছাড়িয়া দিয়াছিলাম। সেদিন কীর্ত্তনে নয়, এমনি বসিয়া থাকিতে থাকিতে সমস্ত শরীর কালো হইয়া গিয়াছিল। বাবা নাড়ীর গতি দেখিয়া ভয় পাইতেছিলেন। আমরা শুধু নাম

করিতাম, ভোলানাথও খুব নাম করিতেন, ইহাই আমাদের একমাত্র সম্বল ছিল। মাও অনেক সময় বলিয়াছেন, "এই অবস্থায় শরীরে ফিরিবার খেয়াল না হইলেই সব শেষ হইয়া যাইতে পারে, কিন্তু হয়ত ফিরিবার থাকে, তাই তোমাদের এই ব্যাকুলতায় আবার ফিরাইয়া আনে।" কতদিন মার একটা অবস্থা গিয়াছে—রাত্রিতে শুইয়া আছেন, হঠাৎ অতি অস্পষ্ট ভাষায় দরজা জানালা বন্ধ করিয়া দিতে বলিতেছেন। আমি অতি কষ্টে সেই ভাষা বুঝিয়া দরজা-জানালা বন্ধ করিয়া দিলাম। আবার হয়ত পূর্ব্বেই বলিয়া রাখিতেন, "এই অবস্থা হইলে আমার শরীরে যে কোন স্থানে হাত দিয়া রাখিও ও মনে মনে নাম করিও।" আমি তাহাই করিতাম। পায় হাত দিয়া বসিয়া নাম করিতাম—অনেক রাত্রি এ ভাবে কাটিয়াছে। এ অবস্থার কথাও বলিয়াছেন, "তোমরা যে ধরিয়া নাম কর তাহাতেই যেন শরীরে ফিরিবার খেয়ালটা জাগে।" ইহাও বলিতেন, "হয়ত ফিরিয়া আসিবার দরকার আছে, তাই তোমাদের এই সব বলিয়া দিতে পারিতেছি।" এই অবস্থায় কি করিতে হইবে তাহা ভোলানাথকেও অনেক সময় বলিয়া রাখিতেন। তিনি সেই সব চেষ্টা করিতেন, কিন্তু এক এক সময় এমন অবস্থা দাঁড়াইত যে, কিছুতেই কিছু হইত না। আমরা একমাত্র সম্বল নাম করিয়া যাইতাম। কিছুদিন শরীরের অবস্থা এমন হইল,—হয়ত কিছু আহার করিয়া আসিয়া বিশ্রাম করিতেছেন, শ্বাসের গতি ভয়ানক দ্রুত হইয়া উঠিল, শরীরও

সঙ্গে সঙ্গে কেমন হইয়া যাইতে লাগিল। এই প্রকার যত রকমের অবস্থাই হইত, মা কখনও জ্ঞানহারা হইতেন না—ইহা মা নিজমুখে বলিয়াছেন ও আমরাও দেখিয়াছি। শ্বাসের এইরূপ অস্বাভাবিক গতিতে শরীর শক্ত হইয়া যাইত, আমি শরীর ঘসিয়া দিতাম, কিন্তু আমার এত জোরে ঘসিয়া দেওয়া সত্ত্বেও মা নাকি একটুও বুঝিতে পারিতেন না। শেষে ভোলানাথ নিজে এবং অন্যান্য যুবক-ভক্তেরা প্রাণপণে পা-হাত ঘসিয়া দিত। মা বলিতেন, অতি সামান্যই তিনি টের পাইতেন। অথচ যাঁহারা দিতেন, তাঁহারা ঘামিয়া উঠিতেন কয়েকমাস পর্য্যন্ত এই অবস্থাটা ছিল। শেষে যখন মা রমনার নূতন আশ্রম হইতে উৎসবের পর পিতাকে নিয়া নানাস্থানে ঘুরিতে বাহির হইয়া গেলেন, বাহির হইবার কিছু পূর্ব্বে মাঠে বসিয়া বলিতেছিলেন, "কতদিন পূর্ব্ব হইতেই এই ভাবে বাহির হইবার জন্য ভোলানাথের অনুমতি চাহিতেছিলাম, কিন্তু তিনি রাজি হন নাই, তাই বাহির হই নাই। কিন্তু আমার শরীরে যে ঐরূপ হইয়া যাইত ইহাই তাহার কারণ।" অনেক সময়ই ইহা দেখিয়াছি যে, কোন একটা বিষয়ে ভোলানাথ বাধা দেওয়ায় তাহা করিতেন না বটে, কিন্তু শরীর এমন হইয়া যাইত যে সকলেই ভয় পাইয়া যাইতেন। এইজন্য ভোলানাথ সাধারণতঃ কোনটাতে বেশী বাধা দিতেন না। ভোলানাথের কোন কারণে খুব রাগ হইলেও মার শরীর ঐরূপ হইয়া যাইতে দেখিয়াছি, মৃত্যুর লক্ষণ সব প্রকাশ পাইত। এই ভাবে ধীরে

ধীরে ভোলানাথের রাগও কমিয়া গিয়াছিল। প্রথম হইতে সব অবস্থাই ত তিনি দেখিতেছেন—এই শরীর রক্ষার জন্য তাঁহাকে অনেক সহ্য করিতে হইয়াছে, সন্দেহ নাই।

আমরা দেওঘর হইতে ফিরিয়া কলিকাতায় স্নুরেন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের বাড়ীতে আসিলাম। তিনি ইতিপূর্ব্বে মাকে দেখেন নাই। প্রথম প্রথম তিনিও অতিথি-সেবার ভাবেই মার সেবা করিতেছিলেন। একদিন সারারাত্রি ছাদের উপর বসিয়া মার সহিত তাঁহার কি কথা-বার্ত্তা হইল। তার পর হইতেই তিনি মাকে "মা" বলিয়া ডাকিলেন ও মাকে ভক্তি ও শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিতে লাগিলেন। তাঁহার বৃদ্ধা মাতাও মাকে ইষ্টদেবীর মূর্ত্তিতে দেখিয়াছিলেন। ইহার পর হইতেই এই পরিবার মার খুব অনুরক্ত হইয়া পড়ে। মা কলিকাতায় আসিলে স্নুরেন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের বাড়ীতেই উঠিতেন। ভক্তদের নিয়া কীর্ত্তনাদি এই বাসাতেই বেশী হইত। বেশী সময়ই মা এই বাসাতেই কাটাইতেন। তাঁহার বৃদ্ধা মাতা নিজের ইষ্টমূর্ত্তিতে দেখিলেও মাকে সন্তানের মতই যত্ন করিতেন। মার জন্য তিনি পাগল হইয়া যাইতেন। কলিকাতা হইতে প্রাণগোপালবাবুর ভগিনী খুব পীড়াপীড়ি করিয়া মাকে তাঁহার বাড়ী 'শিব-নিবাস' নিয়া গেলেন। সেখানে গিয়া তিনি কত যত্ন করিলেন বলিতে পারি না। প্রাণগোপালবাবুর ও তাঁহার সকল আত্মীয়বর্গের চরিত্রে আমরা মুগ্ধ হইয়াছি।

ফিরিবার পথে কলিকাতায়

এমন পরিবার বড় দেখা যায় না—সকলেই সরল, নম্র, মিষ্টভাষী ও ধর্ম্মভীরু। 'শিব-নিবাস' হইতে ফিরিয়া কলিকাতায় প্রমথবাবুর বাসায় গেলাম, সেখানে অনেকে মাকে দর্শন করিতে আসিলেন। প্রমথবাবুর পরিচিত বন্ধু-বান্ধব অনেকেই আসিয়া মাকে দর্শন করিলেন। রেবতী সেন (গোঁসাইজীর চিরকুমার শিষ্য) নবতরু হালদার প্রভৃতি অনেকেই প্রথমবাবুর বাসাতে মাকে প্রথম দেখেন। এখন তাঁহারা মার খুবই কৃপার পাত্র। কলিকাতা হইতে ঢাকা রওনা হওয়ার দিন বাবা গাড়ী আনিয়া সব জিনিষ-পত্র উঠাইলেন, কিন্তু প্রমথবাবু মাকে কিছুতেই আসিতে দিলেন না। মুখে বিশেষ কিছু বলিলেন না, কিন্তু এক ঘরের কোণে গিয়া ধ্যানে বসিলেন। মা বিদায় নিতে যাওয়ামাত্রই পায়ের কাছে অসাড় হইয়া পড়িয়া গেলেন, মা আর নড়িতে পারিলেন না, স্থিরভাবে সেই খানেই দাঁড়াইয়া রহিলেন। এদিকে গাড়ীর সময় চলিয়া গেল। খুব বৃষ্টি আরম্ভ হইল, মা সকলকে কীর্ত্তন করিতে অনুমতি করায় সকলে বৃষ্টিতে দাঁড়াইয়া কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। মাও বৃষ্টিতে দাঁড়াইয়া রহিলেন। বহুক্ষণ কীর্ত্তন হইল, রাত্রিও অনেক হইল। মার সঙ্গে দিবার জন্য সকলেই কিছু কিছু খাদ্যদ্রব্য নিয়া আসিয়াছিলেন, তাহা দিয়াই লুট দেওয়া হইল; সকলেরই ভিজা কাপড়। মাকে অনেকেই কাপড় দিয়াছেন—সব কাপড়ই বিলাইয়া দেওয়া হইল। সকলে কাপড় ছাড়িয়া মাকে প্রণাম করিয়া বিদায় নিলেন।

পরদিন রাত্রিতে আমরা মাকে নিয়া ঢাকা রওনা হইলাম। অটল দাদা বোধ হয় কলিকাতা হইতেই বিদায় নিয়াছিলেন। প্রথমে অটলদাদা আসিলেই মা আমাকে দেখাইয়া তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, "তোমার ভগিনী দেখ, তুইজনেরই অনেকটা ভাবে মিলিবে।" আরও একদিন এই ভাবেই কি কি বলিয়াছিলেন।

ঢাকায় প্রত্যাগমন

মা শাহবাগেই আছেন। মধ্যে মধ্যে সিদ্ধেশ্বরী যান। একদিন রাত্রিতে সিদ্ধেশ্বরী যাইবেন। সকলেই সেইদিন সিদ্ধেশ্বরী গেলেন। প্রথম প্রথম নিয়ম হইয়াছিল প্রতিদিন কীর্ত্তন হইতে না পারিলেও সোমবার ও বৃহস্পতিবার বিশেষ ভাবে কীর্ত্তন হওয়া চাই, তাই হইত। সপ্তাহের মধ্যে ঐ তুইদিন সকলেই মিলিতেন ও খুব কীর্ত্তন হইত। অন্যান্য দিন সামান্য একটু একটু কীর্ত্তন হইত। খুব লোকের ভিড় হইতে থাকায় বাগান নষ্ট হইবার ভয়ে কর্ত্তৃপক্ষ সকলের বাগানে যাওয়া বন্ধ করিয়া দিলেন। তখন এক এক দিন এক এক বাসায় কীর্ত্তন করিতে মা আদেশ দিলেন, সোম ও বৃহস্পতিবার সিদ্ধেশ্বরীতে কীর্ত্তন হইবে বলিয়া দিলেন। সম্ভবতঃ সেইদিন সোমবার কি বৃহস্পতিবার হইবে। মা সিদ্ধেশ্বরীতে গিয়াছেন, তখনও সিদ্ধেশ্বরীর রাস্তা খুবই খারাপ ছিল, সকলেই খুব কষ্ট করিয়া সিদ্ধেশ্বরী যাইতেন। অথবা মা-ই সকলকে টানিয়া নিয়া যাইতেন। মা সিদ্ধেশ্বরীতে গিয়া গহ্বরের ভিতর বসিয়া

সিদ্ধেশ্বরীর কথা।

আছেন, ভোলানাথ উপরে বসিয়াছেন। ভক্তেরা সকলেই উপস্থিত। জ্যোতিষ দাদা ভিড়ে বড় থাকিতেন না, কিন্তু আজ তিনিও আছেন। কখনও কখনও ভক্তদের মধ্যে নানা কথা নিয়া গণ্ডগোল হয়, মা কোন্ বাড়ীতে গেলেন, না গেলেন সেই বিষয় নিয়াও দুঃখ প্রকাশ করা হয়। মা এখন ঘোমটা অনেক কমাইয়াছেন—সন্তানদের সহিত বসিয়া বেশ কথাবার্ত্তা বলেন। আজ যেন তাঁহার মূর্ত্তি আরও উজ্জ্বল, কথায় সঙ্কোচের ভাব বা জড়তা মোটেই নাই। মধুর দৃষ্টিতে সকলের দিকে চাহিয়া বলিতেছেন, "এখানে আসিয়াছ—সকলে দ্বেষ হিংসা ভুলিয়া যাইবার চেষ্টা কর। হিংসা-নিন্দাই যদি করিতে হয় তবে এখানে আসিয়া লাভ কি ? আর, আমি ত যে যখন যেখানে নিতেছে সেইখানেই যাইতেছি। পূর্ব্বে হাঁটিয়াই যেখানে হয় যাইতাম, এখন দিন দিনই শরীরটা কেমন হইয়া যাইতেছে, হাঁটিতে সব সময় পারি না। তোমরা গাড়ী করিয়া যেখানে হয় নিয়া যাও। ইহার মধ্যে দুঃখের ত কিছুই নাই।" পরে একটু দৃঢ়ভাবে বলিতেছেন, "আজ যেন ভাবটা কেমন হইয়া যাইতেছে। আমি ত তোমাদের মেয়ে, তবে তোমরা 'মা' বলিয়া ডাক। যদি সত্যই তাই মনে কর তবে আমি যখনই যেখানে থাকি, জানিও তখনকার জন্য সেই বাড়ী আমারই, কাজেই তোমাদের সকলেরই। ইহা ঠিক ভাবে মনে রাখিও।" কিছুক্ষণ পর আবার বলিতেছেন,—বধূত্বের সঙ্কোচ তখন কোথায় চলিয়া গিয়াছে— দৃঢ়স্বরে বলিতেছেন, "যে যে এখানে আস সকলকেই তৈয়ার হইতে হইবে। এখন পর্য্যন্ত ত কিছুই না, শুধু মাটিতে

কোদাল পড়িয়াছে মাত্র। কত সহিতে হইবে, কত ঝড় উঠিবে, সেই বাতাসে যাহারা যাইবার চলিয়া যাইবে, যাহারা থাকিবার তাহারা থাকিবে"। দৃঢ়ভাবে এই কথা বলিয়া চুপ করিলেন। মা হাসিয়া হাসিয়া বলিলেন বটে, কিন্তু সকলেরই প্রাণে মার এই দৃঢ়স্বর আঘাত করিল। সকলেই নীরবে বসিয়া রহিলেন, কিছুক্ষণ পর অন্যান্য কথাবার্ত্তা হইল, কিছুক্ষণ কীর্ত্তনও হইল। অনেকেই মাকে সাংসারিক উন্নতি-অবনতির বিষয় জিজ্ঞাসা করেন, আজও করিতেছেন। মেয়েরাই প্রশ্ন করিতেছেন। মা বলিলেন, "দেখ সকলেই প্রায় সাংসারিক বিষয়েই আমাকে প্রশ্ন করে, আমি সে সম্বন্ধে কিছুই বড় বলি না। কিন্তু আজ বলিতেছি আমি যখন আসিয়া এইখানে বসিব তখন যে কোন বিষয়ে যে যাহা প্রশ্ন করিবে, আমি উত্তর দিব। অপর সময় আর কিছু বলিব না। কিন্তু আমি কখন আসিব তাহা বলিতে পারি না।" এই কথা বলা মাত্রই স্ত্রীলোকেরা অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সাংসারিক বিষয়ে প্রশ্ন করিতে লাগিলেন, মাও হাসিয়া হাসিয়া প্রত্যেকটীর জবাব দিলেন। আশ্চর্যের বিষয়, কেহ একটা ভাল কথা জিজ্ঞাসা করিল না। পুরুষেরা প্রায় কেহই কোন প্রশ্ন করিলেন না। আমার তখন মাকে পাইয়া এমন অবস্থা হইল যেন প্রশ্ন করিবার কিছুই নাই। স্ত্রীলোকেরা কয়েকজন মাত্র প্রশ্ন করিলেন। সকলে এই সাধারণ প্রশ্নে বিরক্ত হইয়া আবার কীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন।

মা হাসিয়া হাসিয়া আমাকে বলিলেন,—"এই গহ্বরে আসিয়া বসিতে পার ?" আমিও নির্ভয়ে উত্তর দিলাম, "খুব পারি, তুমি বলিলেই।" মা মাটি হইতে কয়েকটী ফুল লইয়া আমার গায়ে ফেলিতে লাগিলেন ও হাসিয়া বলিতে লাগিলেন, "আমি পূজা করিতেছি, এ মেয়েটা বড় শক্ত।" আমি ভূমিতে লুটাইয়া প্রণাম করিলাম। মার কাছে আপন-পর নাই, মা সকলকেই পূজা করেন আবার নিজের পায়েও পূজা করেন। ইহা তাঁহার একটা লীলা মাত্র। কিছুক্ষণ পর কীর্ত্তন খুব জমিয়া উঠিল, মা উঠিয়া ঐ গহ্বরের ভিতরেই দাঁড়াইলেন। আজ অতি অদ্ভুত অদ্ভুত ভাব হইতে লাগিল। প্রতি মুহূর্ত্তেই পরিবর্ত্তন হইয়া যাইতেছে। অনেকে কীর্ত্তন করিতেছে— অনেকে হয়ত কিছু কিছু বুঝিয়া হাত জোড় করিয়া আছেন। আজ আমিও কেমন যেন হইয়া পড়িলাম, উচ্চৈঃস্বরে দেবীর স্তব পড়িতে লাগিলাম। হাত জোড় করিয়া হাঁটু গাড়িয়া মার গহ্বরের নিকটেই বসিয়া আছি। চোখ বুজিয়াছিলাম দেখি নাই সহসা মার হাত আমার হাতে লাগিল। আমি চমকিয়া চাহিয়া দেখি মা হাসিতে হাসিতে আমাকে হাত ধরিয়া তুলিতেছেন। মার হাত খুব ঠাণ্ডা, যেন বরফের মত। খানিকক্ষণ পরে মা এলোকেশে আলুথালু বেশে বাহির হইয়া পড়িলেন, অন্ধকার রাত্রি, অতি দ্রুত চলিয়া যাইতে লাগিলেন। মা কখনও কখনও স্বাভাবিক ভাবেও এত দ্রুত চলিতেন যে, কেহ সঙ্গে যাইতে পারিত না। আমি প্রায়ই দৌড়াইয়া সঙ্গে

থাকিতাম। মা গিয়া কালীমায়ের মন্দিরে প্রবেশ করিলেন। (সেদিন মা সকলকে নিয়া ওখানে আসিবেন বলিয়া মন্দির খোলা রাখিতে বলা হইয়াছিল।) মন্দিরে ঢুকিয়াই কালী-মূর্ত্তি প্রদক্ষিণ করিয়া দরজার সম্মুখে সটান ভাবে শুইয়া পড়িলেন। আমি ও ভোলানাথ শরীরে হাত বুলাইতেছি, অন্যান্য সকলে মন্দিরের দরজায় দাঁড়াইয়া আছেন। অনেকক্ষণ পরে অস্পষ্ট ভাষায় অতি মৃদুস্বরে মা বলিতেছেন, "সকলকে বলিয়া দাও আজ যাহা দেখিল তাহা যেন কেহ মুখে উচ্চারণ না করে।" অতি কষ্টে আমি এ কথা বুঝিয়া সকলকে বলিয়া দিলাম। অনেকক্ষণ কাটিল, মাকে উঠাইয়া তাঁহার আসনের ঘরে নিয়া আসা হইল। রাত্রি প্রায় প্রভাত হইয়া আসিল। অনেকেই বিদায় নিলেন। ভোলানাথ মাকে অনেক কষ্টে উঠাইলেন—শরীর যেন অবশ, আরও কিছুক্ষণ কাটিল, মা পরে উঠিয়া দাঁড়াইয়া এত দ্রুত হাঁটিতে লাগিলেন যে, সঙ্গে কেহ যাইতে পারে না, একেবারে শাহবাগে আসিয়া শুইয়া পড়িলেন।

আমরা যখন দেওঘরে ছিলাম সেই সময় আমার ছোট বোন বেলুও দেওঘর যায়। মার দর্শনও তাহার সেই সময়েই হয়। তাহার পর আমরা যখন ঢাকায় আসি বেলুও তখন ঢাকায়ই ছিল, কাজেই সেও তখন আমাদের মত মাতৃসঙ্গের খুবই সুযোগ পাইয়াছে। বিভিন্ন সময়েতে তার জীবনেও মার করুণার অনেক নিদর্শন সে পাইয়াছে।

বেলুর প্রতি মায়ের অজস্র কৃপা।

বেলুর প্রথম সন্তান ২ বৎসরের শিশু ছেলেটি ভয়ানক রক্ত আমাশয়ে মরণাপন্ন অবস্থায় পড়িয়া ছিল। একটু ভালর দিকে যাওয়ার পর একদিন বেলু ছেলেটিকে নিয়াই মার দর্শনে সিদ্ধেশ্বরীতে আসে। আমি ও বাবা তখন সিদ্ধেশ্বরীতে মার কাছেই থাকিতাম। মা ছেলেটির চেহারা দেখিয়াই বলিয়া উঠিলেন— "এই রকম হইয়া গিয়াছে! এইখানেই বসাইয়া দে।" ঠিক সেই সময়েই একজন গরীব স্ত্রীলোক ভক্ত নিজের হাতে চিঁড়া করিয়া এবং গাছের পাকা কাঁঠাল মায়ের ভোগের জন্য নিয়া আসিয়াছেন। গরীব মানুষ তাঁহার প্রাণের শ্রদ্ধার সহিত এই জিনিষ মার জন্য নিয়া আসিয়াছেন। মা তখনই মহা আনন্দের সহিত সেই জিনিষ গ্রহণ করিলেন। গরীব মহিলাটি তো নিজেকে ধন্য মনে করিলেন। মা তাহা হইতে কিছু কিছু গ্রহণ করিতে করিতেই মহা আগ্রহসহকারে থালাখানা শিশুটির কাছে ঠেলিয়া দিতে বলিলেন। আমিও থালাখানা শিশুটির কাছে ঠেলিয়া দিলাম। শিশুটি চুপ করিয়া বসিয়াছিল। কিন্তু অপ্রত্যাশিত ভাবে খাবার জিনিষ সামনে দেখিয়া মহা আনন্দ। মার দিকে চাহিল। চাহিতেই মা বলিলেন —"খাও, খাও।" আর বেলুকে বলিলেন—"যতটা পারে খাইতে দে, তুই বাধা দিস না।" মার প্রতি বিশ্বাস ছিল বলিয়াই বেলু কিছু বাধা দিল না এবং কিছু ক্ষতি হইবে না এ ভাবটাও আছে। তখন পর্য্যন্ত অসুস্থ ছেলেকে কঠিন রোগের পর জলীয় জিনিষ ছাড়া কিছুই খাইতে

দেওয়া হয় না। তাই স্বাভাবিক ক্রমে তাহার মনে একটু ভীতির ভাব জাগিয়াছিল। মুখে কিছুই বলে নাই। ইতিমধ্যে মা-ই যেন আবার বাবার মুখে বলাইলেন—বাবা তখনই বেলুকে বলিলেন—"দে, তুই কিন্তু ভয় পাস না। মনে দ্বিধাও আনিস না।" বেলুর মনে যেটুকু ভয়ের সঞ্চার হইয়াছিল বাবার এই কথায় তাহাও কাটিয়া গেল। ঘরে অনেকেই উপস্থিত ছিলেন। শিশুটি খুব আনন্দে হাত ভরিয়া যতটা পারিল কাঁঠাল ও চিঁড়া খাইল। মাও বসিয়া রহিলেন। সকলেই বেশ আনন্দের সহিত মার এই খেলা দেখিলেন।

তাহার পরে বেলু যখন মাকে প্রণাম করিয়া বাড়ী যাওয়ার জন্য তৈয়ার হইল তখন মা বেলুকে বলিয়া দিলেন, "শুধু জল ছাড়া আর কিছুই ছেলেকে খাইতে দিস না।" বলা বাহুল্য পরদিন হইতেই আশ্চর্য্য ভাবে ছেলেটির পেটের আর বিশেষ কোন অসুখই রহিল না। বেলুও পরদিনই গিয়া মার কাছে এই কথা নিবেদন করিয়া আসিল। মা শুনিয়া একটু হাসিলেন। ভাবটা এই রকম যে, ইহা যেন অতি স্বাভাবিক ঘটনা।

ইহার কিছু দিন আগেই আর একবারও বেলুর একটা অসুখ হয়। ঔষধ ইত্যাদি এবং নানা চিকিৎসায় ভাল না হওয়ায় মাকে গিয়া জানায়। করুণাময়ী মা নিজের খেয়ালে উহাকে কিছু একটা করিতে বলিয়া দেন। বেলু তাহাই করিতে থাকে। রোগও একদম সারিয়া গেল। কিন্তু কিছুদিন পর ঘটনাচক্রে বেলু ২।৩ দিন মা যাহা বলিয়াছিলেন তাহা করিতে

ভুলিয়া যায়। আশ্চর্য্য এই যে, আবার সঙ্গে সঙ্গে অসুখটা আরম্ভ হয়। তাহার পর হইতে আবার যথারীতি মার আদেশ পালন করিয়া সম্পূর্ণ ভাবে রোগমুক্ত হয়। এইরকম ছোট বড় অনেক ঘটনায় বেলু মার কৃপা অনুভব করিয়াছে এবং এখনও করিতেছে।

এমনই ভাবে এক এক দিন এক একটা লীলা করিতেছেন। একদিন দুপুরবেলা টিকাটুলী হইতে বাগানে আসিয়াছি—দেখি মা নাই, অনেক খুঁজিতে খুঁজিতে দেখি মা একটী ছোট গাছের ডালে উঠিয়া বসিয়া বসিয়া হাসিতেছেন, পরে নামিয়া আসিলেন। রায়বাহাদুরের বাড়ী হইতেও মেয়েরা সর্ব্বদাই আসিতেন। রায়বাহাদুরও মাকে খুবই শ্রদ্ধা করিতেন। তিনি বাগানে সকলের আসা নিষেধ করিয়াছিলেন। অল্পদিনের মধ্যেই এই নিয়ম ভাঙ্গিয়া দিলেন ও এজন্য মার কাছে খুব লজ্জিত হইলেন।

বাগানে লোক আসার নিষেধ প্রত্যাহার।

একদিন শাহবাগে সন্ধ্যায় কীর্ত্তন হইতেছে, মার শুইবার ঘরেই কীর্ত্তন হইতেছে, মার ভাবাবস্থা, হঠাৎ মা বাবার পায়ের ধূলা নিতে উদ্যত হইয়াছেন, বাবা ত 'মা, মা,' বলিয়া পিছাইয়া গেলেন। শেষে সকলেরই পায়ের কাছে যাইতেছেন, ধূলা নিবেন, সকলেই চমকিয়া সরিয়া যাইতেছেন, মা শিশুর মত কাঁদিয়া আকুল, বলিতেছেন, "পায়ের ধুলা না

একদিনের ঘটনা—কীর্ত্তনে সকলের পায়ের ধূলা নেওয়ার চেষ্টা।

দিলে আমি থাকিব না।" শেষে ভোলানাথ গিয়া অনেক বলিয়া শান্ত করিলেন, এবং বলিলেন, "তোমাকে কে পায়ের ধূলা দিবে? তুমি নিজেই নিজের পায়ের ধূলা নেও।" তখন মা নিজেই নিজের পায়ের ধূলা নিলেন ও শান্ত হইলেন। আমি পাশের ঘরে দাঁড়াইয়া ভাবিতেছিলাম—মা যখন পায়ের ধূলা না নিলে থাকিবেন না বলিতেছেন, তখন যা থাকে কপালে, আমার কাছে আসিলে আমি বাধা দিব না, মা যাহা করিবেন তাহাতে মঙ্গলই হইবে। কিন্তু দেখিলাম আমার দিকে আসিতে আসিতে আসিলেন না। সেইদিন আরও কয়েকজন স্ত্রীলোক উপস্থিত ছিলেন। শান্ত হইয়া মা আসিয়া স্ত্রীলোকদের মধ্যে বসিলেন। মা বলিলেন, "আজ কেহ পায়ের ধূলা দিল না, কিন্তু যদি আজ পায়ের ধূলা দিত, আমিও তবে সকলকে পায়ের ধূলা দিতাম।" আমি বলিলাম, "মা, তুমি ত সকলের কাছে আস নাই, তোমাকে বাধা দিত না এমন লোক এখানে ছিল। মা হাসিয়া বলিলেন, "তা আমি জানিতাম, তাই এইদিকে আসিতে পারিলাম না।" এইভাবে লীলা করিতেছেন।

ব্যারাম পীড়ার জন্য কত লোক যে ঔষধ নিতে ও বাক্য নিতে আসিত, তার অন্ত নাই, কিন্তু মা সে বিষয়ে প্রায় নীরব।

অন্যের রোগ আরোগ্য করার ইতিহাস :—

কখনও যে ২।১টা ঘটনা হইয়া যায় সে ভিন্ন কথা। দুই একটী রোগী ভাল হইল। কোন কোন রোগীর কাছে হয়ত নিয়া গিয়াছে, মা তার গায়ে হাত বুলাইয়া দিতেছেন। যেন ঝাড়িয়া

দিতেছেন, সে হয়ত ভাল হইয়া গেল। মা বলিতেন, "আমি যে নিজে ইচ্ছা করিয়া এইরূপ করিতাম তাহা নহে, হাত আপনা-আপনি উঠিয়া যাইত। ঐ ভাবে ক্রিয়া হইয়া যাইত। আবার কখনও কখনও শত অনুরোধেও হাত নড়িত না।"

একদিন শাহবাগে অতুল দত্ত মহাশয়ের স্ত্রী (বিভু ঠাকুরতা মহাশয়ের ভগিনী) আসিয়া মাকে নিজ বাসায় নিয়া যাইবার জন্য খুব অনুরোধ করিতে লাগিল। মা এদিক-ওদিক ঘুরিতেছেন, ঐ কথায় কানও দিতেছেন না। শেষে ভোলানাথকে গিয়া ধরিলেন—তাঁহার ছেলেটীর খুব অসুখ, মাকে একবার দেখাইতে নিয়া যাইবেন। ভোলানাথ পরের দুঃখে খুব গলিয়া যান। তিনি গিয়া মাকে ধরিলেন, যাইতে হইবে। মা ঘরে গিয়া ভোলানাথকে বলিতেছেন, "গিয়া কি হইবে? এ ছেলে বাঁচিবে না।" জ্যোতিষ দাদা তখন সেখানে উপস্থিত ছিলেন, তিনি বলিলেন, "তবে না যাওয়াই ভাল, গেলে শুধু মার একটা বদনাম হইবে। আর না হয়ত তাহাদের আত্মীয় কাহারও কাছে 'মা এই কথা বলিয়াছেন' ইহা বলিয়া আসাই দরকার।" ভক্তের প্রাণ, পাছে মাকে কেহ ভুল বোঝে, এই ভাবিয়া এই সব কথা বলিলেন। কিন্তু কিছুই করা হইল না, কারণ এই কথা পূর্ব্বে বলা চলে না। মা ও ভোলানাথ সেই বাড়ীতে গেলেন; ছেলেটী এম-এ, কি "ল", পড়িতেছিল মনে নাই, যক্ষ্মার মত হইয়াছে। মা দেখিয়া

(ক) অতুল দত্তের ছেলের কথা।

চলিয়া আসিলেন। মা অনেক জায়গাই এরূপ স্থলে যাইতে চাহিতেন না, কিন্তু ভোলানাথ পীড়াপীড়ি করিলে যাইতেন, বলিতেন, "বেশ ত, বোধ হয় দরকার আছে তাই যাওয়া হইতেছে। বাঁচা কি মরা আমার কাছে সমান কথা। হয়ত যে মরিবে তার কাছেও যাওয়া দরকার ছিল।" এই বলিয়া পরে আর বড় আপত্তি করিতেন না। কিন্তু ভোলানাথকে এবং আমাদের সকলকেই বিশেষ করিয়া বলিয়া দিয়াছেন, "কাহাকেও ভাল করিতে হইবে বলিয়া অনুরোধ করিও না। বলিতে পার কাহার খারাপ করিতে হইবে? সকলকেই যদি বাঁচাইতে হয় তবে কাহারও মৃত্যু হইবে না? একি একটা কথা? সকলেই যার যার কর্ম্মফল ভোগ করিতেছে ও করিবে; তাহাতে বাধা দেওয়া ঠিক নয়। জোর করিলে বিপরীত ফল হয়।" এদিকে দেখিয়া আসিবার পর একদিন অতুলবাবুর স্ত্রী আসিয়া মাকে ধরিয়াছেন, "মা একটা ব্যবস্থা করিয়া দিতেই হইবে।" মা বলিলেন, "নিয়ম বলিয়া দিলেও রাখিতে পারিবে না" তিনি বলিতেছেন, "মা তুমি বলিয়া দাও, নিশ্চয়ই পারিব।" তখন মা বলিয়া দিলেন, "এতদিনের (বোধ হয় আঠার দিন) মধ্যে ছেলেকে বিছানা ছাড়িতে দিও না।" এই আদেশ নিয়া তিনি চলিয়া গেলেন। ছেলেটী ক্রমে ক্রমে ভাল হইতে লাগিল, হঠাৎ একদিন অবস্থা আবার খারাপ হইয়া পড়িল। ছেলের মা শাহবাগে মার কাছে আসিয়া উপস্থিত।

আসিতেই মা বলিলেন, "বিছানা কেন ছাড়িতে দিয়াছ? সোমবার বিছানা ছাড়িয়াছে।" তিনি বলিলেন "না মা, ইহা কখনই হয় নাই।" কিছুদিন পর ছেলেটি মারা গেল মৃতদেহ ঘরে রাখিয়াই অতুলবাবুর স্ত্রী শাহবাগে দৌড়িয়া আসিলেন। এদিকে কিছু পূর্ব্ব হইতেই মা বসিয়া ছিলেন, হঠাৎ মুড়ি দিয়া শুইয়া পড়িলেন। আধঘণ্টার মধ্যেই ছেলের মা আসিয়া পাগলের মত উপস্থিত। তাঁহার বিশ্বাস, নিয়ম ভঙ্গ হয় নাই, মা যখন বলিয়াছেন এই নিয়ম কর, তখন ছেলে মরিতে পারে না। উন্মাদ অবস্থা কিছুক্ষণ পর সকলে তাঁহাকে ধরিয়া নিয়া গেল। সেই হইতে মার প্রতি তাঁহার বড়ই অবিশ্বাস আসিল। কারণ মার নিয়ম পালন করা সত্ত্বেও ছেলে মরিল, ইহাই তাঁহার অবিশ্বাসের কারণ। কিছুদিন পর কোন ঘটনায় তাঁহার স্পষ্টভাবেই মনে পড়িল, মা ঠিকই বলিয়াছেন, ঐ নির্দিষ্ট দিনের মধ্যে ছেলে ভাল হইয়া বিছানা ছাড়িয়া বারান্দায় আসিয়া কথাবার্ত্তা বলিয়াছিল। তখন তিনি আবার মার কাছে আসেন ও এই কথা জানাইয়া খুব অনুতপ্ত হইয়া কাঁদিতে থাকেন। মাও তাঁহাকে এই বলিয়া সান্ত্বনা দিলেন, "দেখ, যাহা হইবার তাহা হইবেই,—পূর্ব্বেই আমি বলিয়াছিলাম এ ছেলে বাঁচিবে না, তোমাকেও বলিয়াছিলাম নিয়ম বলিলে রাখিতে পারিবে না। এইজন্যই বলি আমাকে পীড়াপীড়ি করিলে কোন ফল হইবে না, আবার যখন হইবার আপনিই হইয়া যায়।"

এইরূপ নানা কথা বলিয়া তাঁহাকে সান্ত্বনা দেন। তিনি এখন মার কাছে সুবিধা পাইলেই আসেন; মার প্রতি তাঁহার খুবই বিশ্বাস; ইহার পর হইতে ভোলানাথও আর বেশী অনুরোধ করিতেন না। আবার যখন ভাল হইবার হয় তখন মা নিজেই গিয়া সেখানে উপস্থিত হইয়া একটা কিছু করেন—সে ভাল হইয়া যায়।

(খ) গুরুবন্ধুর ছেলের কথা।

একবার আমাদের টীকাটুলীর বাসায় মা ভোগে বসিয়াছেন—গুরুবন্ধু ভট্টাচার্য্য মহাশয় পাশের বাড়ীতেই ছিলেন। তাঁহার স্ত্রী মার কাছে আসা-যাওয়া করিতেন। তাঁহার ছেলের কালাজ্বর হইয়াছে, তিনি মার কাছে তাহার জন্য অনেক কাঁদিলেন ও প্রার্থনা জানাইলেন। ভোলানাথ মার প্রসাদ নিয়া যাইতে বলিলেন, তিনি তদনুসারে প্রসাদ নিয়া ছেলেটিকে খাওয়াইলেন, কিছুদিন পরই ছেলেটী ভাল হইল। তারপর হইতে তাঁহারা খুব আসা-যাওয়া করিতেন, একদিন মাকে নিজ বাড়ীতে ভোগ দিলেন। কিন্তু কিছুদিন পর তাঁহাদের এই ভাব চলিয়া গেল, মার কাছে আসা যাওয়া বন্ধ হইল। আমরা মাকে বলিলাম। মা বলিলেন, "সবই ভাল, কেহ আমার নিন্দা করিলেও চটিও না। যার যতদিন দেনা-পাওনা থাকে তার ততদিন আসা-যাওয়া হয়। কাহারও কোন দোষ নাই। আর নিন্দা,—জানিও অঙ্গের ভূষণ, এই পথে আসিলে নিন্দাকে অঙ্গের ভূষণ করিয়া নিতে হয়। যেমন সধবার হাতের লোহা সৌভাগ্যের পরিচয় দেয়, তেমনই জানিও এই পথেও নিন্দা খুব সাহায্য করে। এই

পথে আসিলে নিন্দা অনিবার্য্য। কাজেই বলিতেছি, নিন্দাতে ভয় করিও না বা চটিও না।” মা ত বলেন, কিন্তু আমরা তাহা রাখিতে পারি কই ?

আর একটী ঘটনা হইয়াছিল। আমাদেরই একটী আত্মীয়া তাঁহার একটি রুগ্ন ছেলে নিয়া আমাদের টিকাটুলীর বাসাতে আসেন, ছেলেটির কালাজ্বরে শোচনীয় অবস্থা। তিনি মার কথা শুনিয়াছেন। বাবা তাঁহাকে বলিলেন, “আমার বাড়ীতে তুই রকমের চিকিৎসা আছে—যদি ডাক্তারী চিকিৎসা করাও সেই ব্যবস্থা করিতেছি, আর বিশ্বাস থাকে ত মার কাছে ফেলিয়া দাও, বাঁচিবার হইলে তাহাতেই বাঁচিবে।” তুই একদিন বিবেচনা করিয়া তিনি মার প্রসাদ খাওয়াইয়াই রাখিবেন স্থির করিলেন। মা ভোগে টিকাটুলীর বাসায় আসিয়াছেন। মার খাওয়া হইয়া গিয়াছে, আত্মীয়াটী গিয়া ছেলের জন্য প্রসাদ চাহিতেছেন। মা চুপ করিয়াই আছেন। ভোলানাথ উঠিয়া গেলেন। হঠাৎ মা উঠিয়া যাইবার সময় এক গ্রাস ভাত নিয়া ছেলের মার হাতে দিয়াই উঠিয়া পড়িলেন। এই ভাবে প্রসাদ পাইয়া তিনি খুব শ্রদ্ধার সহিত ছেলেটীকে খাওয়াইলেন। আশ্চর্য্যের বিষয়—ছেলেটী ধীরে ধীরে ভাল হইয়া গেল। কয়েক বছর পর ছেলেটী আবার অসুস্থ হইয়া পড়ায় তাঁহারা ঢাকায় আসেন, কিন্তু তখন মা ঢাকায় ছিলেন না। ছেলেটীর চিকিৎসা চলিতে লাগিল। তাঁহারা বড়

(গ) একটি কালাজ্বরে রুগ্ন ছেলের কথা।

গরীব। ঢাকাতে আমাদের বাসাতেই আছেন। কিছুদিন পর মা ঢাকায় আসিয়াছেন। আমারা শাহবাগে মাকে ছেলেটীর কথা বলামাত্রই তিনি বলিলেন, "বাড়ী পাঠাইয়া দেও, এই ছেলে বাঁচিবে না। যদি বাঁচে, ভগবানের বিশেষ অনুগ্রহ।" আমরা বলিলাম, "গরীব মানুষ, এখানেই চিকিৎসা হউক দেশে গিয়া কি করিবে।" কিছুদিন চিকিৎসার পর তাহার শরীর বেশ সারিয়া উঠিল, আমরা ভাবিলাম বুঝি বা ভগবানের বিশেষ অনুগ্রহে বাঁচিয়া গেল। কিন্তু হঠাৎ একদিন স্কুল হইতে আসিয়া তাহার দাস্ত-বমি হইতে লাগিল ও পরদিন বেলা নয়টার মধ্যেই সে মারা গেল। মা তখন ঢাকায় ছিলেন না।

(ঘ) যক্ষ্মারোগীর কথা।

আর একদিন একটী ঘটনা হইল। একটী যক্ষ্মা-রোগীকে গ্রাম হইতে তাঁহার আত্মীয়-স্বজন মার নাম শুনিয়া শাহবাগে নিয়া আসিয়াছে। মার কাছে আত্মীয়েরা প্রার্থনা জানাইতেছে, শাহবাগ হইতে রোগীকে ভাল না করিয়া তাহারা কিছুতেই যাইবে না। নাচ-ঘরের নিকটে যে দুইটী গোল ঘর ছিল তাহার একটীতে মা তখন শুইতেন; দ্বিতীয়টীতে তাহাদিগকে থাকিতে দেওয়া হইল। কয়েকদিন পর একদিন নাচ-ঘরে কীর্ত্তন হইতেছে—মার খুব ভাবাবস্থা হইয়াছে। ঐ অবস্থায় কাপড় ঠিক থাকিত না বলিয়া কাপড়ের আঁচল কোমরে বেশ করিয়া জড়াইয়া দিতাম, মাথায় কাপড় থাকিত না, চোখ-মুখের ত ঐ রকম জ্যোতিঃ, কি সুন্দর দেখাইত, ভাষায় প্রকাশ করা অসম্ভব!

যতক্ষণ পর্য্যন্ত ঐ ভাব থাকিত, কাপড়ও ঐ ভাবেই থাকিত। কীর্ত্তনের মধ্যে শরীরের নানারকম ক্রিয়া হইতেছে। কিছুক্ষণ পর ভাবের মধ্যেই সাধারণের অবোধ্য ভাষায় মধুর স্তোত্রাদি হইল। পরে মা স্থিরভাবে বসিয়া বলিলেন, "ওকে (অর্থাৎ ঐ যক্ষ্মারোগীকে) এখানে নিয়া এস।" রোগীর সঙ্গে পাঁচ সাত জন লোক ছিল, তাহারা ধরাধরি করিয়া তাহাকে কীর্ত্তনের মধ্যে নিয়া আসিল। কীর্ত্তন তখন থামিয়াছে, মা যেন একটু ব্যাকুলভাবে বলিলেন—"এখানে ওকে গড়াগড়ি দিতে বল।" কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, লোকটী নিজে শুইতে পারিতেছিল না, সঙ্গের লোকগুলি যে ধরিয়া শোয়াইয়া দিবে তাহাও করিতেছিল না, কেমন যেন সকলে থমকিয়া গেল। মা তুই তিনবার বলিলেন। রোগীটী নিজে শুইতে চেষ্টা করিল, কিন্তু পারিল না। মা চুপ করিলেন। পরে বলিলেন, "দেখিলে, বলিলেও হয় না, সকলে মিলিয়াও ত' শোয়াইয়া দিতে পারিত। কিন্তু তাহা হইল না, যাহা হইবার তাহা হইবেই।" পরে মা তাহাদিগকে বাড়ী চলিয়া যাইতে বলিলেন তাহারা রওনা হইয়া গেল, রাস্তায়ই লোকটী মারা গেল।

যোগেশ রায়ের ঘটনা

একদিন কীর্ত্তনে একটী বিশেষ ঘটনা হইল। টিকাটুলীর নৃপেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের সঙ্গে যোগেশচন্দ্র রায় নামে একটী ভদ্রলোক মধ্যে মধ্যে শাহবাগে আসিতেন। শুনিলাম তিনি ঢাকাতেই চাকুরী করেন ও বিবাহাদি করেন নাই। তিনি

মাতৃবিষয়ক ভাল ভাল গান করিতেন। শাহবাগে কীর্ত্তনে বড় যোগ দিতেন না, একধারে চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতেন। অনেক সময় একা একা শ্যামা-সঙ্গীত, কি অপর কোন গান করিতেন। একদিন কীর্ত্তন হইতেছে, মার খুব ভাবাবস্থা, সমস্ত নাচ-ঘরটা ঘুরিতেছেন—কখনও উগ্রমূর্ত্তি, কখনও অতি শান্ত আনন্দময় মূর্ত্তি, নানা রকমের ক্রিয়া ও আসনাদি হইতেছে। মা ঘুরিতে ঘুরিতে হঠাৎ যোগেশবাবুর কাঁধের উপর উঠিয়া দাঁড়াইলেন, তিনি স্বাভাবিক ভাবেই চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন। একটু পরেই মা নামিয়া পড়িলেন ও ঘুরিতে ঘুরিতে অন্যদিকে চলিয়া গেলেন। সকলেই যোগেশবাবুর ভাগ্যের প্রশংসা করিতে লাগিলেন। তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করা হইল, মা কাঁধের উপর উঠিয়া দাঁড়াইলে তাঁহার কেমন মনে হইয়াছিল ? তিনি বলিলেন, ছোট্ট একটি মেয়ে উঠিলে যেমন বোধ হয় সেই রকম লাগিতেছিল। তখন পর্য্যন্ত মার ঘোম্‌টা ভাল করিয়া উঠে নাই,—কথা বলিবার সময় বেশ বড় ঘোম্‌টা দিয়াই কথা বলিতেন। কয়েকদিন পর আমরা শুনিলাম যোগেশবাবু সন্ন্যাসী হইয়া বাহির হইয়া গিয়াছেন। মাকে আসিয়া বলিলাম। মা বলিলেন, "গিয়াছে, আবার আসিবে।" কিছুই বুঝিলাম না। এক বৎসর পর যোগেশদাদা ফিরিয়া আসিলেন। তখন সব ঘটনা শুনিলাম। ঘটনা এই—একদিন তিনি শাহবাগে আসিয়াছেন, মা তখনও অপরিচিত পুরুষদের সহিত খুব বেশী কথা বলিতেন না। ভোলানাথকে দিয়া মা

তাঁহাকে এই আদেশ করিয়াছিলেন, "এক বৎসর নিঃসম্বল হইয়া (অর্থাৎ নিজের সঙ্গে টাকা-পয়সা না নিয়া) নানাস্থানে ঘুরিয়া এস। যাইবার পূর্ব্বে গর্ভধারিণীর সহিত দেখা করিয়া মাথা মুড়াইয়া দাড়ি-গোঁফ কামাইয়া যাইবে, আর এই এক বৎসরের মধ্যে ক্ষৌরী হইবে না। এক বৎসর পর আসিয়া আবার আমার সহিত দেখা করিও। ছুটি নিয়া যাও এবং তোমার মাহিনা যাহাতে এখানে জমা হয় সেইরূপ বন্দোবস্ত করিয়া যাও।" এই আদেশ পাইয়া তিনি চলিয়া যান এবং মার নির্দ্দেশমত কাজ করিয়া পূর্ণ এক বৎসর পর আসিয়া শাহবাগে মার চরণপ্রান্তে পুনরায় উপস্থিত হন। সেদিন দেখিলাম, সে যোগেশবাবু আর নাই, তখন তাঁহার লম্বা চুল ও দাড়ি হইয়াছে। মা তাঁহাকে তাঁহার এই অবস্থার একটী ফটো রাখিয়া চুল দাড়ি কাটিয়া ফেলিতে বলিলেন এবং পূর্ব্বের চাকুরীতে যোগ দিতে আদেশ করিয়া বলিলেন, "এখন এই পর্য্যন্তই থাক, পরে যাহা হয় হইবে।" যোগেশবাবুকে যখন এক বৎসর ঘুরিতে আদেশ দিয়াছিলেন তখন তাঁহাকে বলিয়া দিয়াছিলেন, "যদি এই এক বৎসরের মধ্যে কোথাও আমার সহিত দেখাও হয়, কাছে আসিও না।" পরে ইনিই চাকুরী ছাড়িয়া রমনার আশ্রমে অন্নপূর্ণা-মন্দিরের পূজক হইয়া আশ্রমের ব্রহ্মচারী হইয়াছিলেন।

প্রায় প্রতিদিনই শাহবাগে কীর্ত্তন চলিতেছে। কখনও কীর্ত্তনের দল আসিয়া পালা গাহিয়া যাইতেছেন। মা নিত্য নূতন লীলা করিতেছেন। একদিন ভোগে বসিবার পূর্ব্বে বলিতেছেন

"খুকুনী, আমাকে কাপড় পরাইয়া দে ত।" এই বলিয়া হাত গুটাইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন, এবং মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিলেন। ভোলানাথ বলিলেন, "এই কি তুমি নিজে কাপড়ও পরা বন্ধ করিলে নাকি?" মা বলিলেন, "না, আজ ওকে বলিতেছি।" আমি মেয়েদের মত ঠিক করিয়া কাপড় পরিতে জানি না, তাই আমার মনে হইল মা তামাসা করিতেছেন। আমি অনেক ভাবিয়া-চিন্তিয়া পরাইয়া দিলাম, কিন্তু দেখিলাম উল্টা হইয়া গিয়াছে। মা হাসিয়া বলিলেন, "আজ এই উল্টাই পরিয়া থাকিব।" বাবা বলিলেন, "মা, ও না জানে খাওয়াইতে, না জানে কাপড় পরাইতে, ওর হাতেই তুমি সব ব্যবস্থা করিতেছ।" মা মৃদু-ভাবে বলিলেন, "যে নিজেরটা জানে না আমি তার নিকট হইতেই গ্রহণ করি।" এত মৃদুভাবে বলিলেন যে, আমি ছাড়া হয়ত আর কেহ শুনিল না, আমি গায়ের কাছে দাঁড়াইয়াছিলাম, তাই শুনিতে পাইলাম। মনে হইল আমাকে শুনাইবার জন্যই ঐ কথা বলিলেন। অনেক সময়ই বলিতেন, "তোমরা শুদ্ধ ও পবিত্রভাবে থাকিলেই আমি সুস্থ থাকিব, তোমাদের শুদ্ধভাবই আমার পুষ্টিসাধন করিবে। বাহিরের খাওয়ায় কিছু হইবে না।" এই কথাতেও আশ্চর্য্য হইতাম। ভাবিতাম, "সকলের শুদ্ধ ভাবই আমার শরীরের পুষ্টিসাধন করিবে, কে এ কথা বলিতে পারে?"

কাশী হইতে জিতেন্দ্রচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয় আসিয়া মাকে দেখিলেন—কীর্ত্তনে মার ভাবাবস্থা দেখিয়া অবাক্

হইলেন। কয়েকদিন পর—বোধ হয় ৺পূজার ছুটীতে—শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয় আসিয়া মাকে দর্শন করিলেন,—তিনি পূর্ব্বেই বাবার পত্রে মার খবর জানিয়াছিলেন। তিনিও মাকে দেখিয়াই মুগ্ধ হইলেন। তিনি রোজই শাহবাগে যাইয়া অনেক সময়ই মার কাছে থাকিতেন।

ভক্তগণের আগমন।

দিনে মা অনেক সময়ই পড়িয়া থাকিতেন, রাত্রি হইলেই যেন গা ঝাড়া দিয়া উঠিতেন। অনেক সময়ই রাত্রিতে বড় শুইতেন না। আমরা থাকিলে আমাদের সঙ্গে কথা বলিয়া আপন মনে ঘুরিয়া ঘুরিয়া, রাত্রিটা কাটাইয়া দিতেন। কেহ না থাকিলেও হাঁটিয়া হাঁটিয়া অথবা বসিয়া বসিয়া রাত্রি কাটাইতেন। রাত্রিতে অনেকটা পরিষ্কার ভাবে কথা বলিতেন। বীরেনদাদা, অটল-দাদা প্রভৃতি ত অনেক বড় বড় বিষয়ে প্রশ্ন করিতেন, মা সহজ ও সরল ভাষায় তাহা বুঝাইয়া দিতেন, তাঁহারা উত্তরে খুব সন্তুষ্ট হইতেন। কিন্তু কখনও কখনও কথা বড় হইত না, কারণ সকলে যে সব প্রশ্ন মনে মনে ঠিক করিয়া আসিতেন, মার কাছে আসিলেই সে সব ভুলিয়া যাইতেন। রাত্রিতেই কথা বলিবার সুবিধা হইত। মা তখনই বেশ পরিষ্কার ভাষায় সব বলিতেন। মনে থাকে না বলিয়া কতকগুলি প্রশ্ন একদিন জিতেনদাদা রাত্রিতে গিয়া মাকে জিজ্ঞাসা করিলেন। মা তাঁহার স্বাভাবিক ভাষায় সব মীমাংসা করিয়া দিলেন।

নানাবিধ প্রশ্ন ও তাহার মীমাংসা।

রাত্রিতে বীরেনদাদা, অটলদাদা ও আমরা কয়েকজন মাকে নিয়া বসিয়াছি, মা আসন করিয়া বসিয়া আছেন, কত সুন্দর সুন্দর কথা বলিতেছেন। সকলে মুগ্ধ হইয়া শুনিতেছি। একদিন বীরেনদাদা বলিলেন, "আচ্ছা মা, এই যে সব নিত্য নূতন নূতন লোক আসিতেছে, ইহাদিগকে দেখিয়া তোমার কি মনে হয় ?" মা হাসিয়া অমনই জবাব দিলেন, "কেহই নূতন নয়, সকলকেই অতি পরিচিত বলিয়া মনে হয়।" আবার একদিন জিজ্ঞাসা করা হইল, "সকলের মনের ভাবই কি সব সময় তোমার চোখে ভাসে ?" মা বলিলেন, "না, সব সময় সকলেরটা ভাসে না, তবে যখন যেদিকে চোখ ফিরাই অমনিই পরিষ্কার দেখিতে পাই। যেমন 'ক, খ,' অক্ষরগুলি ত তোমরা সব জান, কিন্তু সব সময়ই কি সেইগুলি তোমাদের চোখে ভাসে ? কিন্তু যখনই যেগুলি মনে কর, অমনিই সেই-গুলি মনের মধ্যে ভাসিয়া উঠে—সেই রকম আর কি। ইহাও এক দিকের কথা। সব সময় সবটা দেখিয়াও না দেখার মত ব্যবহার চলিতে পারে। খেয়ালের মামলা আর কি।" আবার একদিন কথা উঠিল,—"অবতার ও সাধকে প্রভেদ কি ? সাধারণে কি করিয়া চিনিবে ?" মা কিছুক্ষণ স্থিরভাবে পড়িয়া রহিলেন। কথা বলিতে বলিতে কিছুক্ষণ চুপ করিলেই, হয় পড়িয়া থাকিতেন, নয়ত স্থিরভাবে বসিয়াই থাকিতেন। কখন কখন মার কথা বাহির হইত না। আজও কিছুক্ষণ পড়িয়া থাকিয়া উঠিয়া বসিলেন। বলিলেন, "তিনি ধরা না দিলে সাধারণের ধরিবার উপায় নাই।" আবার একটু পরে

বলিলেন, "যিনি সাধক, তিনি কোন একটা নিয়মে কি কতকগুলি নিয়মে নিজেকে আজীবন বাঁধিয়া রাখেন, কিন্তু যিনি অবতার, তিনি কোন নিয়মেরই অধীন হন না। যদিও ঠিকভাবে সবই তাঁহার ভিতর দিয়া হইয়া যায়, কিন্তু তিনি কোনটাতেই বদ্ধ থাকেন না। লক্ষ্য করিলে ইহা ধরা যায়। অবশ্য সাধারণের ধরা মুস্কিল।" এই বলিয়া কিছুক্ষণ পর কথায় কথায় নিজের অবস্থা বলিলেন, "এই শরীরটার ভিতর দিয়া কতই হইয়া যাইতেছে, কিন্তু কিছুই বেশীদিন থাকে না, কোন কোনটা অতি অল্প সময়ই স্থায়ী হয়। তোমাদের পড়া বই, পরীক্ষার পূর্ব্বে একবার পাতা উল্টাইয়া গেলেই কাজ হইয়া গেল।"

৺শারদীয়া পূজা (১৩৩৩)।

দুর্গাপূজা আসিল। বাবা এই তিনদিনই শাহবাগে মার পূজা দিবেন। সপ্তমীর দিন ভোরে গিয়া দেখি—মা ঘরে দরজা বন্ধ করিয়াছেন। ভোলানাথ বলিলেন, "দিনে বাহির হইবেন না, ঘরে কাহাকেও যাইতে নিষেধ করিয়াছেন। সন্ধ্যার পর বাহির হইবেন বলিয়াছেন।" সারাদিন মাকে দেখিব না, আমাদের ত ভয়ঙ্কর অবস্থা। কিন্তু উপায় কি? ভোলানাথের ঘরে যাইবার কথা আছে। তিনি পূজার সমস্ত জিনিষ পত্র নিয়া ঘরে গিয়া মাকে পূজা করিয়া আসিলেন। সন্ধ্যার পর মা দরজা খুলিলেন। সকলেই গিয়া মার কাছে বসিলাম। মাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "একি নিয়ম করিলে?" মা বলিলেন, "আমি ত কিছুই করি না, দেখিতেছি কয়েক

দিন সূর্য্যের মুখ দেখিতে দিবে না।" এই বলিয়া হাসিতে লাগিলেন। সারারাত্রি মার কাছে আমরা কয়েকজন বসিয়া আছি। ভোর হইতেই মা চোখ ঢাকিলেন, ভোলানাথকে বলিলেন, "উহাদিগকে (আমাদিগকে) বাহিরে যাইতে বল না, আমি চাহিতে পারিতেছি না।" আমরা বিষণ্ণবদনে উঠিয়া গেলাম। কি ভয়ঙ্কর নিয়ম হইল, কয়দিন থাকিবে কে জানে,—ভাবিয়া আমরা বড়ই ব্যস্ত হইলাম। কিন্তু উপায় কি? সপ্তমী, অষ্টমী, নবমী তিনদিনই মা এই ভাবে রহিলেন। ভোলানাথ এই তিনদিনই ঘরে গিয়া মার পূজা করিয়া আসিতেন। রাত্রিতে সকলের খাওয়া হইত। দশমীর দিন একটু বেলা হইতেই মা সকলের অজ্ঞাতসারে বাহির হইয়া পুকুরে গিয়া ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছেন তখন আমরা সকলে খবর পাইয়া দৌড়াইয়া গিয়া দেখি, মা মহানন্দে সাঁতার দিতেছেন। এই দেখিয়া বাবা ও ভোলানাথ এবং অন্যান্য অনেকেই পুকুরে নামিয়া পড়িলেন,—দশমীর স্নান হইতে লাগিল। মা কিছুতেই উঠিতেছেন না দেখিয়া ভোলানাথ পুনঃপুনঃ উঠিতে বলিতেছেন; কারণ আবার কি করিয়া বসেন ঠিক কি? মা বুক পর্য্যন্ত জলে নামিয়া আসন করিয়া বসিলেন, কিছুতেই উঠিবেন না। ভোলানাথ জোর করিয়া উঠাইতে চাহিতেছেন, কিন্তু পারিতেছেন না, মা কেমন ভাবস্থ হইয়া-পড়িলেন। দুই হাত বাড়াইয়া জলে ঝাঁপাইয়া পড়িতে চাহিতেছেন আর বলিতেছেন, "জলমাতা আমায় ডাকিতেছেন।"

১২

কিছুতেই উঠান যায় না, শেষে সকলে মিলিয়া উঠান হইল। কাপড় ছাড়াইয়া দেওয়া হইল। ইতিমধ্যে, মা জলে থাকিতে থাকিতে, বীরেনদাদাও বাসা হইতে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন —তিনি পুকুরে নামিয়া পড়িয়াছেন। মা ও আমরা সকলে উঠিয়া আসিয়াছি, তিনি জলে দাঁড়াইয়া সন্ধ্যা করিতেছেন। তিনি হঠাৎ একটা বিকট মূর্ত্তি দেখিয়া ভয়ে কাঁপিয়া উঠিলেন, কিন্তু সন্ধ্যা ত্যাগ করিলেন না। সন্ধ্যা-বন্দনাদি শেষ করিয়া যখন তিনি মাকে প্রণাম করিতে আসিলেন, মা তখন নাচ-ঘরটায় বসিয়া আছেন (সেইখানেই তখন কীর্ত্তনাদি হইত)। বীরেনদাদা মাকে প্রণাম করিতেই মা বলিলেন, "কি বাবা, ভয় পাইয়াছিলে?" বীরেনদাদা অবাক্ হইয়া গেলেন।

চতুর্থ অধ্যায়।

দেখিতে দেখিতে কালীপূজা আসিয়া পড়িল। সকলে মাকে এবারও কালীপূজা করিবার জন্য অনুরোধ করিতেছেন, কিন্তু মা রাজি হইতেছেন না। ভোলানাথকে বলিয়া দিয়াছেন, "তুমিও আর আমাকে এ সব কাজে অনুরোধ করিও না। আমি কোন কাজই করিয়া উঠিতে পারিতেছি না।" মা রাজি হইতেছেন না, তাই সকলে চুপ হইয়া গিয়াছেন। একদিন মা টীকাটুলীর বাসায় ভোগে যাইতেছেন। যখন লাট সাহেবের বাড়ীর নিকটে পুষ্করিণীর কাছে গাড়ী গিয়াছে, তখন মা দেখিলেন একটী চলন্ত কালীমূর্ত্তি—যেন শূন্যের মধ্য দিয়া ছুটিয়া আসিয়া মার কোলে ঝাঁপাইয়া পড়িতে উদ্যত। গলায় রক্তজবার মালা দুলিতেছে। নীচে মহাদেবের মূর্ত্তি নাই। মা তখন কিছু বলিলেন না (পরে মার মুখে এই ঘটনা শুনিয়াছি)। টিকাটুলীর বাসায় গিয়া ভোগে বসিয়াছেন, হঠাৎ মা হাত তুলিয়া অন্যমনস্ক হইলেন।* (পরে বলিয়াছেন আবারও ঐ মূর্ত্তি দেখিলেন)। আজ মার

৺কালীপূজার ইতিহাস (১৩৩৩)

---

*আমরা দেখিতাম যখন মার এইরূপ নানা ভাব হইত তখন কখনও এক একটা কথা অস্পষ্টভাবে বলিতেন, কখনও হয়ত শুইয়া থাকিতেন। গভীর রাত্রিতে হঠাৎ মা চীৎকার করিয়া কি একটা বলিতেন, আমরা কিছুই বুঝিতাম না। কখনও কখনও শব্দটা বুঝিতাম কিন্তু কেন বলিলেন কিছুই বুঝিতাম না। শরীরের গতিও এই রকম কত দেখিতাম—সবই সাধারণের দুর্ব্বোধ্য ছিল।

হাত তোলা দেখিয়া ভোলানাথ ও আমরা চাহিয়া রহিলাম। একটু পরেই হাত নামাইয়া নিলেন। কিছুই বলিলেন না। গাড়ীতেও বোধ হয় হাত তুলিয়াছিলেন। কয়েকদিন পর মা শাহবাগে রান্নাঘরে রান্না করিতেছেন, এদিকে মার শুইবার গোল-ঘরে ভূদেববাবু আসিয়া ভোলানাথকে মার কালীপূজা করিবার কথা বলিতেছেন। ভোলানাথ বলিয়া দিলেন, "তিনি পূজা করিতে রাজি হইতেছেন না।" এইসব কথাবার্ত্তার পর সন্ধ্যাবেলায় কীর্ত্তনে সকলে একত্র হইয়াছেন। সকলেই জানেন কালীপূজা হইবে না। অনেক রাত্রিতে আমরা বাসায় চলিয়া গেলাম। মা ও ভোলানাথ শুইয়াছেন। তখন মা ভোলানাথকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "দেখ, আজ ভুদেববাবু আসিয়া কিছু বলিয়াছেন নাকি?" মা যেখানে পাক করিতেছিলেন সেখান হইতে মার শুইবার ঘর অনেকটা দূরে। ভূদেববাবুর সহিত মার দেখা হয় নাই বা মা কাহারও মুখে শোনেনও নাই। মার মুখে এই কথা শুনিয়া ভোলানাথ বলিলেন, "ভূদেববাবু আসিয়া কালীপূজার কথা অনেক বলিল।" মা বলিলেন, "দেখ তুমি কেন কালীপূজা কর না?" এই কথায় ভোলানাথ বুঝিলেন মা কালীপূজা করিবেন। তিনি তখনই বাহির হইয়া উপস্থিত সকলকে মা কালীপূজা করিবেন খবর দিলেন। বাউলবাবু, সুরেনবাবু তখন পর্য্যন্ত শাহবাগে ছিলেন তাঁহাদের সঙ্গে ভোলানাথ কথা বলিতেছেন, এদিকে মা পড়িয়া থাকিতে থাকিতে সমাধিস্থ হইয়া পড়িয়াছেন।

কালীপূজার মাত্র একদিন বাকী, সেই রাত্রিতেই কালী প্রতিমার জন্য যাইতে হইবে। কত বড় মূৰ্ত্তি হইবে কথা উঠিল; ভোলানাথ গিয়া মাকে জিজ্ঞাসা করিলেন। মা ত অসাড় হইয়া পড়িয়া আছেন, কিছুই শব্দ করিতে পারিতেছেন না। ভোলানাথ অনেক করিয়া উঠাইলেন, কিন্তু মা চুপ করিয়াই আছেন। শেষে ভোলানাথের মনে হইল, মা যে সে দিন টিকাটুলী গিয়া দুইবার হাত উঠাইলেন তাহার অর্থ কি? তিনি মাকে উঠাইয়া বসাইয়া হাত উঠাইয়া মাপ নিয়া দেখিলেন সওয়া দুই হাত, তিনি বুঝিলেন ইহাই মূৰ্ত্তির মাপ। তাহাই বলিয়া দেওয়া হইল। শেষে মা ভোলানাথকে ও অপর সকলকে এই ঘটনা বলিলেন,—বলিলেন, "ভোলানাথ যাহা বুঝিয়াছিলেন তাহাই ঠিক। মূৰ্ত্তি কত বড় তাই হাত উঠাইয়া দেখাইয়াছিলাম।" মূৰ্ত্তির ব্যবস্থা করিতে গিয়া শুনা গেল শিল্পী একটী মূৰ্ত্তি তৈয়ারি করিয়া রাখিয়াছে, কিন্তু তখন পৰ্য্যন্ত উহা কেহ নেয় নাই। ভক্তেরা মূৰ্ত্তি মাপিয়া দেখিলেন ঠিক সওয়া দুই হাতই হইয়াছে। সকলেই আশ্চৰ্য্য হইলেন। ঐ মূৰ্ত্তিই আনা হইল; রং দেখিয়া মা বলিলেন, "ঠিক এই রংই দেখিয়াছিলাম।" কালীপূজার সব আয়োজন হইল। কলিকাতা হইতে সেই দিন বীরেনদাদা ও সুরেন্দ্রচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের মাতা, আশু ও তাহার মাতা সব আসিয়া উপস্থিত। কীৰ্ত্তনেরও সব বন্দোবস্ত হইয়াছে। আমরা কয়েকজন পূজার আয়োজন

করিতেছি। সন্ধ্যা হইয়া আসিল, মা স্থির ধীরভাবে বসিয়া আছেন। ভোলানাথ মাকে উঠাইয়া পুকুরে স্নান করাইতে নিয়া গেলেন। মা স্নান করিয়া নূতন কাপড় পরিয়া আসিলেন। গায়ের সেমিজটী পুকুরেই ফেলিয়া দিয়া আসিলেন। অনেক সময় দেখিয়াছি জলাশয়ের ভিতর সেমিজ ও কাপড় ফেলিয়া দিয়াছেন। অনেক সময় দেখিতাম সন্ধ্যাবেলা মা একেবারে স্থির পাথরের মূর্ত্তির মত বসিয়া থাকিতেন, চক্ষে পলক থাকিত না। আজ ত আরও একটু বেশী। কোন প্রকারে পুকুর হইতে হাঁটিয়া পূজার ঘরে গিয়া বসিলেন। সমস্ত প্রস্তুত, ভোলানাথ মাকে পূজা করিতে বলিতেছেন। ঘরে লোকারণ্য, একটুও জায়গা নাই—কীর্ত্তনের ঘরেও তাই। কীর্ত্তন হইতেছে। মা মাটিতে বসিয়াই পূজা আরম্ভ করিলেন। বাম হাতে পূজা করিতে লাগিলেন। একটু সময় পূজা করিয়াই একেবারে হঠাৎ উঠিয়া দাঁড়াইলেন, এবং ভোলানাথের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "আমি বসি, তুমি পূজা কর।" এই বলিয়াই অট্টহাসি হাসিয়া চক্ষের পলকে সকলের ভিতর দিয়া ঘুরিয়া একেবারে কালীমূর্ত্তির সহিত লাগিয়া গিয়া বসিয়া পড়িলেন। প্রথমতঃ ভোলানাথ এবং আমরা সকলেই বুঝিয়াছিলাম মা বুঝি সরিয়া বসিবেন। ভোলানাথকে কালীপূজা করিতে বলিতেছেন। ভোলানাথও বলিয়া উঠিয়াছিলেন, "আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি আমি পূজা করিতে

পারিব না।" কিন্তু কথা ফুরাইতে না ফুরাইতেই এই অবস্থা দেখিয়া সকলে অবাক্ হইয়া গেল। মুহূর্ত্তের মধ্যে মার গায়ের কাপড়ও পড়িয়া গেল। লোল-জিহ্বা বাহির করিলেন, বাবা 'মা' 'মা' বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে ডাকিয়া উঠিলেন। ভোলানাথ পূজার আসনে বসিয়া দুই হাত ভরিয়া অঞ্জলি দিতেছেন। মুহূর্ত্তের মধ্যেই জিহ্বা ভিতরে নিয়া গেলেন, এবং মাটিতে উপুর হইয়া পড়িয়া গেলেন। এতগুলি ঘটনা ঘটিতে অতি অল্প সময়ই লাগিয়াছিল। সকলে কিছু ভাবিবার বা বলিবার পূর্ব্বেই সব ঘটনা হইয়া গেল। বৃন্দাবনবাবু নামে একজন উকিল ছিলেন, তিনি পূজার ঘরেই ছিলেন। মা ঘুরিয়া যাইবার সময় তিনি নিকটে ছিলেন। একটা উত্তাপের মত তিনি অনুভব করিয়াছিলেন ও অজ্ঞান হইয়া পড়িয়াছিলেন। এদিকে মা উপুর হইয়া পড়িয়া বলিতেছেন, "সকলেই চোখ বন্ধ করিয়া থাক।" সকলেই চোখ বন্ধ করিলেন। মা সেই ভাবেই পড়িয়া থাকিয়াই বলিতেছেন, "মহাদেইয়া চোখ খুলিয়া আছে।" মহাদেইয়া বাগানের মালীর স্ত্রী, সে ঘরের বাহিরে কিছু দূরে গাছতলায় দাঁড়াইয়াছিল। মা কি করিয়া দেখিতেছেন কে জানে? তাহাকে বলায় সেও চোখ বন্ধ করিল। অনেকক্ষণ পর ভোলানাথের আদেশে সকলে চোখ খুলিয়া দেখি মা কালীপ্রতিমার কাছেই বসিয়া আছেন। কি সুন্দর আনন্দময়ী মূর্ত্তি, যেন রাজ-

রাজেশ্বরী! ফুলে সমস্ত শরীর ভরিয়া গিয়াছে। ভোলানাথ ফুল বিল্বপত্র দিয়া মাকে পূজা করিতেছেন। কিছুক্ষণ পর পূজা সমাধা হইয়া গেল, যজ্ঞ আরম্ভ হইবে। মা অতি অস্পষ্ট ভাষায় মৃদুভাবে বলিলেন, "আজিকার পূজায় যজ্ঞ অনাবশ্যক।" তারপর বলিলেন, "উহারা যোগাড় করিয়াছে, হউক।" যজ্ঞ হইল। বীরেনদাদা ভোলানাথকে বলিলেন, "আজ আমরা সকলেই মার পায়ে অঞ্জলি দিতে চাই।" তিনি অনুমতি দিলেন। অনেকেই সেদিন অঞ্জলি দিলেন। অনেকক্ষণ পর ভোলানাথ ও মা ভোগে বসিলেন। এই সব অবস্থা দেখিয়া মনে মনে স্থির করিলাম—আজ হইতে মাকে সর্ব্বদা এই ভাবেই দেখিব। কিন্তু উপায় কি? আবার যখন মা সাধারণ ভাবে কথাবার্ত্তা বলিতেন, হাসি-তামাসা করিতেন, তখনই এ সব ভুলিয়া যাইতাম। মার খাওয়া হইয়া গেলে সকলেই প্রসাদ পাইলেন। প্রায় সকলেই

৺কালীপূজার যজ্ঞ

মাকে প্রণাম করিয়া বিদায় নিয়াছেন। আমরা কয়েকজন আছি। অমাবস্যা-পূর্ণিমায় ভোগের দিন আমি শাহবাগেই থাকি। মা বসিয়াছেন, বাবা, বীরেনদাদা, অটলদাদা, নন্দু ও কমলাকান্ত প্রভৃতি নিকটে বসিয়া আছেন। ভোলানাথও বিশ্রাম করিতেছেন। হঠাৎ মা আমাকে বলিলেন, "একটা পাত্রে করিয়া যজ্ঞের আগুন কিছু উঠাইয়া আন ত।" তাই নিয়া

যজ্ঞাগ্নি-রক্ষা।

আসিলাম। মা আগুনের পাত্রটা নাচাইতে নাচাইতে বলিলেন, "দেখ কি? এই যজ্ঞের আগুন মহাযজ্ঞে লাগাইয়া দিব।" তার পর বলিলেন, "আচ্ছা, এই আগুন নিয়া কালীর ঘরে কে বসিতে পারে?" বীরেন দাদা বলিতেছেন, "না মা, আমি বসিতে পারিব না, আমার এখনও সংসারে কর্ত্তব্য-জ্ঞান আছে।" আবারও মা বলিলেন, "কে পারে?" বাবা বোধ হয় একটু ঝিমাইতে-ছিলেন। তিনি জাগিয়া এই কথার অর্থ ঠিকভাবে বুঝিলেন কি না জানি না। বলিলেন, "আমি পারি, ভয় কিসের?" কালীর ঘরে বসিয়া থাকিতে কাহারও ভয় হইবে কি না এই সব কথাবার্ত্তা তিনি ইতিপূর্ব্বে শুনিয়া-ছিলেন; তারপরে একটু তন্দ্রার মত আসিয়াছিল। মা এই কথা শুনিয়াই বলিলেন, "বেশ ত, ছেলেদের জিজ্ঞাসা কর।" ছেলেরা বলিল, "বেশ ত।" বীরেনদাদা বলিলেন, "বাবা পারেন, ভালই ত।" তখনই মা বাবার হাতে আগুনের পাত্র দিলেন, ও কালীর ঘরে গিয়া তাঁহাকে বসিতে বলিলেন। বাবা তখনই গিয়া বসিয়া পড়িলেন। আমাদের সকলকে চলিয়া যাইতে বলায় আমরা সকলেই চলিয়া গেলাম। পরে মা একটা কম্বল নিয়া নিজেই বাবাকে একটু বিশ্রাম করিবার জন্য বিছাইয়া দিয়া আসিলেন। সেই হইতে চার পাঁচ মাস বাবা ঐ ভাবে ঐ ঘরেই থাকিতেন। অগ্নিও রক্ষা করিতেন। দুপুরে একবার মেডিকেল স্কুলের

কাজে যাইতেন। বৈকালে ফিরিবার সময় বাসা হইয়া আসিতেন। আমি পরদিন একখানা কম্বল নিয়া ঐ ঘরে আসিয়া স্থান করিয়া নিলাম। কমলাকান্ত ঐ ঘরেই থাকিত। দিনরাত্রি অগ্নি-রক্ষা হইতে লাগিল। আমরাই কয়েকজন অগ্নি-রক্ষায় নিযুক্ত হইলাম। এদিকে পরদিন কালীপ্রতিমা বিসর্জ্জন হইবে, মেয়েরা সকলে বৈকালে আসিয়াছেন। নিরঞ্জনবাবুর স্ত্রী বলিলেন, "মা, প্রতিমাটী এত সুন্দর, বিসর্জ্জন দিতে আমার বড় কষ্ট হইতেছে।" মা অমনি বলিলেন,—"তোমার যখন কষ্ট হইতেছে তখন থাকুক, বিসর্জ্জন দিয়া কাজ নাই। আমরা কেহ ওকে ডাকিয়া আনি নাই; নিজেই আসিয়াছে, যতদিন থাকিবার থাকুক।" এইভাবে অপরের মুখ দিয়া বলাইয়া প্রতিমা রাখিয়া দিলেন।

প্রতিমা রক্ষা।

কালীকে প্রতিদিন রক্তজবার মালা দেওয়ার ভার নবাগত বিক্রমপুর নিবাসী কমলাকান্ত নামক ব্রহ্মচারীর উপর পড়িল। কমলাকান্ত মেট্রিক পাশ করিয়াছে, বিবাহাদি করে নাই। তাহার পিতামাতা কেহই নাই, সে মাতুলালয়ে প্রতিপালিত। মাঝে তাহার খুব অসুখ হইয়াছিল। মার কৃপায় আরোগ্যলাভ করিয়া মার চরণেই আছে। ছেলেটী খুব কষ্টসহিষ্ণু।

কমলাকান্ত।

(ক) একদিনের একটী ঘটনা মনে হইল—একদিন শাহবাগে গিয়া দেখি মা ভয়ানক কাশিতেছেন, কাশি প্রায় বন্ধই

হইতেছে না। তখন শীতের সময়, সন্ধ্যাবেলায় বাল্‌টিতে জল দিতে বলিলেন। শীতের মধ্যে সন্ধ্যার পরে ঠাণ্ডা জল দিয়া খুব স্নান করিলেন। ঘরে কিছু টক ছিল, খাওয়াইয়া দিতে বলিলেন, অনেকটা খাইলেন ও শুইয়া পড়িলেন। পরদিন আর কাশি ছিল না।

কয়েকটী ঘটনা।

(খ) দেওঘরে থাকিতেই নন্দুর হাতে কতকগুলি পাঁচড়া হয়, নিজের হাতে খাইতে পারিত না, আমি খাওয়াইয়া দিতাম। কলিকাতা আসিয়াছে পর একদিন তাহার হাতে খুব ব্যাথা, মা কোথায় বেড়াইতে গিয়াছেন। নন্দুর সেই দিন অভিমান হইল। সে মাকে গর্ভধারিণী মার মতই দেখিত ও সেই ভাবে ব্যবহার করিত। মার নিকট হইতেও সে সন্তানের মতই ব্যবহার পাইত। সে অভিমান করিয়া কিছু খাইল না, মা ফিরিয়া আসিয়া অনেক বলায় খাইল। করুণাময়ী মা ভক্তের জন্য কতই না কষ্ট করেন। আজ তিনি নিজেই নন্দুর ঘা ধোয়াইয়া দিলেন। সেই হইতে রোজই মা ঘা ধোয়াইয়া দিতেন, বলিয়াছিলেন, "সাত দিনের মধ্যে এই হাত দিয়া ভাত খাইতে পারিবে।" সাত দিনের দিন আমাদের বাসায় মার ভোগ হইবে। ভোগের পূর্ব্বদিন রাত্রি হইতেই নন্দুর পেটে একটা বেদনা হইয়া সারারাত বমি করিল। তার এই বেদনা আরও দুই একবার হইয়াছে। এক অবস্থায় চার পাঁচদিন শুধু বার্লি ও জল খাইয়া থাকিত। পরদিন মা আসিলেন, ভোগ হইল; বলিলেন, "নন্দুকে ডাকিয়া আন।" তাহার তখন ভয়নক বমির

ভাব, সে শয্যাগতই আছে। কিন্তু মার আদেশে ডাকিয়া আনা হইল। মা বলিলেন, "আজ তোমার নিজের হাতে খাওয়ার কথা ছিল—খাও, যা পার খাও" বলিয়া নিজে কাছে বসিয়া রহিলেন। আশ্চর্য্যের বিষয়, যে কিছুই মুখে দিতে পারিতেছিল না, সে ঘিভাত মাছ তরকারী সব খাইল। সে সেই দিনই সুস্থ হইয়া গেল, তাহার আপন হাতে খাওয়া সুরু হইল।

(গ) একবার এক ভদ্রলোক তাঁহার একটী অবশ মেয়েকে ডাক্তার গুরুপ্রসাদবাবুর পরামর্শে মাকে দেখাইতে নিয়া আসিলেন। ভোলানাথ মাকে কিছু বলিবার জন্য বিশেষ পীড়াপীড়ি করাতে মার মুখ হইতে হঠাৎ বাহির হইল, "বৃহস্পতি বারে যেন নিয়া আসে।" ভোলানাথ তাহাই বলিয়া দিলেন। তদনুসারে তাহারা বৃহস্পতিবারে আসিয়া উপস্থিত হইল। মা তখন ভোগে পান দিবার জন্য সুপারি কাটিতেছিলেন। ঐ মেয়েটীকে মার কাছে শোয়াইয়া দেওয়া হইল। মা এক টুকরা সুপারি মেয়েটীর দিকে মাটিতে ফেলিয়া দিয়া তাহাকে নিতে বলিলেন। মেয়েটী অতি কষ্টে তাহা নিল। মা ভোলানাথকে বলিলেন, "এখন ইহাদিগকে যাইতে বলিয়া দাও।" তাই হইল। পরদিন মেয়েটীর পিতা আসিয়া বলিল, "কি আশ্চর্য্য, আজ রাস্তায় একটা বাজনা যাইতেছিল। আমার রুগ্ন মেয়েটী শুইয়া ভাই বোনদের খেলা দেখিতেছিল। হঠাৎ বাজনা শুনিয়া সে নিজের অসুখের কথা বিস্মৃত হইয়া

ভাই-বোনদের সঙ্গে বাহিরে চলিয়া গেল। এখন সে বেশ হাঁটিতে পারে। মার অপার কৃপা!" ইহার পর একদিন মেয়েটীর পিতা শাহবাগে আসিয়া মার ভোগ দিয়া গেলেন।

(ঘ) আর একবার একটী ঘটনা হইয়াছিল। ঢাকা গেণ্ডারিয়াতে এক ভদ্রলোকের একটী ছেলের খুব অসুখ হওয়ায় তিনি শাহবাগে আসিলেন। শাহবাগে পৌঁছিবার কিছু পূর্ব্বেই মা বাহিরে বসিয়া ছিলেন, হঠাৎ উঠিয়া ঘোম্‌টা দিয়া ঘরের ভিতর চলিয়া গেলেন। আমরা ভাবিলাম, "কি হইল? কে আসিতেছে?" কিছুক্ষণ পর দেখি গেণ্ডারিয়া হইতে দুইটী ভদ্রলোক আসিয়া মাকে নিবার জন্য অনুরোধ করিতেছেন। রোগী মৃতপ্রায় হইয়া আছে, আজ তিনদিন হইতে অজ্ঞান। তখন বুঝিলাম পূর্ব্বেই মা এই খবর জানিতে পারিয়া উঠিয়া গিয়াছেন। ভোলানাথ গিয়া মাকে বলিলেন। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, মা এখন আর বেশী আপত্তি করিতেন না। সেই বাসায় গেলেন, যাওয়া মাত্রই দরজা দিয়া ঢুকিতেই রোগীর স্ত্রী আসিয়া পা ছুঁইয়া পায়ের ধূলা নিল, মা বাধা পাইয়া বসিয়া পড়িলেন। এইরূপ হইলে অনেক সময় বিপরীত ফল হইত। তার পর অনেকক্ষণ পরে মা উঠিয়া রোগীর চৌকির ধারে গিয়া বসিলেন। রোগী অজ্ঞান—জিহ্বা বাহির হইয়া আছে। তাহাকে ঠিক ভাবে শোয়ান হয় নাই। মা বলিলেন, "ঠিক করিয়া শোয়াইয়া দাও" এই বলিয়া নিজেই ধরিতে

গেলেন। কি কর্ম্মের ফের, তাঁহারা নূতন লোক—শুধু মার নাম শুনিয়া আসিয়াছেন। যেই মা ঠিক করিয়া শোয়াইতে যাইবেন অমনি আত্মীয়দের কেহ কেহ বলিয়া উঠিলেন, "নাড়িবেন না, ডাক্তার নিষেধ করিয়া গিয়াছেন।" মা অমনি হাত গুটাইয়া নিলেন। দুইবারই বাধা পাইলেন। কাহারও কিছুই দোষ নাই, তাঁহারাই বা কি করিয়া জানিবেন? মা বলেন, "যাহা হইবার তাহা এইভাবেই হইয়া যায়।" কিছুক্ষণ পর মা উঠিয়া আসিলেন। পরদিন আবার মাকে নিতে আসিল। মা যাওয়ার সময় বাবাকে ও আমাকে নিয়া গেলেন। রোগীর একই অবস্থা। মা গিয়া দরজার কাছে মাটিতে বসিয়া পড়িলেন। ভোলানাথের খুব দুঃখ হইতেছে। কিন্তু মা নিষেধ করিয়া দিয়াছেন, তাই মাকে কিছু অনুরোধ করিতে পারিতেছেন না। বাবাকে গিয়া বলিলেন, "আপনি গিয়া আপনার মাকে এই রোগীর জন্য একটু অনুরোধ করুন।" বাবা ভোলানাথের কথায় গিয়া মাকে হাত জোড় করিয়া যেই একটু কি বলিলেন অমনি মা বাবার দিকে এমন ভাবে চাহিয়া রহিলেন যে, বাবার আর কথা বাহির হইল না। কিছুক্ষণ পর আমরা চলিয়া আসিলাম। পরদিন বৈকালে শাহবাগে আবার সেখান হইতে লোক আসিয়াছে। মা আর গেলেন না, বলিয়া দিলেন, "আগামী কল্য সন্ধ্যার পূর্ব্বে আর আসিও না।" পরদিন বৈকালে মা শাহবাগে পূর্ব্বে যে ঘরে শুইতেন সেই ঘরে

বসিয়া আছেন, আমাকে বলিলেন, "রান্নাঘরে আগুন আছে, কিছু নিয়া এস ত।" আমি একটা পাত্রে করিয়া কিছু আগুন নিয়া আসিলাম। মা তাহার মধ্যে হাত দিতে উদ্যত হইতেই বাবা আমাকে ধমক দিয়া আগুন সরাইয়া নিয়া যাইতে বলিলেন। আমি কি করি, মাকে বলিলাম, "দুই জনের আদেশ পালন করিতেই আমি বাধ্য। তুমি বলিয়াছিলে, তাই আগুন আনিয়াছি। আবার বাবা নিষেধ করিতেছেন—তাই নিয়া গেলাম।" এই বলিয়া আমি আগুন সরাইয়া নিলাম। একটু পরে একটী ভদ্রলোক আসিলেন। মা তাঁহাকে বলিলেন, "তোমার কাছে দিয়াশলাই আছে? একটা কাঠি জ্বালাও ত। সে জানে না, একটা কাঠি জ্বালাইয়া মার কাছে নিতেই মা তাহার মধ্যে নিজের হাতের আঙ্গুল লাগাইয়া বসিয়া রহিলেন তাঁহাকে বলিলেন, "ঠিক ভাবে যতক্ষণ জ্বলে, ধরিয়া রাখ।" তিনি তাহাই করিলেন। যতক্ষণ কাঠিটা জ্বলিল, মা তাহার মধ্যে আঙ্গুলটা দিয়া স্থিরভাবে বসিয়া রহিলেন। সন্ধ্যার পরেই খবর পাইলাম—গেণ্ডারিয়ার রোগীটী মারা গিয়াছে, সেই দিনই বৈকালে তাহার সৎকার করা হইয়াছে। মা একটু হাসিয়া বলিলেন, "তাই ত একটু পূর্ব্বে আমার এই শরীরটাও একটু পোড়াইয়া নিলাম, সবই ত আমারই শরীর।" আমরা আশ্চর্য্য হইলাম।

কয়েকদিন পর মা একদিন টিকাটুলীর বাসায় কীর্ত্তনে গিয়াছেন, রাত্রিতেও সেইখানে থাকিবেন। আমার ভয়ানক

জ্বর হইল। কীর্ত্তন, ভোগ প্রভৃতি সব হইয়া গেল ভক্তেরা সকলে বিদায় নিয়াছেন। রাত্রিতে যে শুইতে হইবে—এ ভাব মার বড় ছিল না। ভোলানাথ শুইলেন। মা বলিতেছেন, "আমি কি করিব?" তিনি বলিলেন, "খুকুনীর জ্বর, সেই ঘরে একটু যাও না।" মা উঠিয়া আসিয়া আমি যে ঘরে শুইয়া আছি সেই ঘরে মাটিতে বসিলেন। মা মাটিতেই বসিতেন। আসন দেওয়ার নিয়ম আমাদেরও ছিল না, মা আসনে বসিতেনও না, অনেক পরে আসনের নিয়ম হইয়াছে। একটী আত্মীয়া বসিয়া আমাকে বাতাস করিতেছিলেন। কিন্তু রাত্রি অনেক হওয়ায় তিনি ঝিমাইতে লাগিলেন। মা বসিয়া বসিয়া ইহা দেখিতেছিলেন। কিছুক্ষণ পর মা তাঁহাকে উঠাইয়া দিলেন। ঘরে আর কেহ নাই, গভীর রাত্রি, সকলেই ঘুমাইয়াছে। নিকটেই বারান্দায় জল ছিল, মা নিজেই বাল্‌টি করিয়া জল আনিয়া বেশ করিয়া আমার মাথা ধোয়াইয়া দিলেন। পরে আঁচল দিয়া মাথা মুছাইয়া দিলেন। জলে মাথা ঠাণ্ডা হউক না হউক, মার এই করুণায় আমার অন্তর ভরিয়া উঠিল। পরে আমার বিছানায় বসিয়া এক হাতে বাতাস করিতে লাগিলেন ও অন্য হাত গায়ে বুলাইতে লাগিলেন। কয়েকদিন পূর্ব্বে মা একদিন বলিয়াছিলেন, "কেহ আমাকে বেশী ছুঁইও না।" আমি সর্ব্বদাই পিছে পিছে থাকিতাম, তাই এই আদেশে

জরাবস্থায় আমার গায়ে মায়ের হাত বুলান।

আমার ভয়ানক কষ্ট হইল। একদিন খুব দুঃখের সহিতই আমি মাকে বলিতেছিলাম, "এই প্রকার দূরে দূরে থাকা বড়ই কষ্টকর। আমার ইচ্ছা হয় আমার খুব অসুখ হউক, তখন ত তুমি গায়ে হাত দিবে। তখন ত তোমায় ছুঁইয়া থাকিতে পারিব।" এইরূপ কি কি বলিয়াছিলাম। এখন মা বলিতেছেন, "কি, এখন ত গায়ে হাত বুলাইতেছি ভাল লাগিতেছে ত?" আমার তখন জ্বরের ভয়ানক যন্ত্রণা। তবুও এই করুণায় কতই না আনন্দ পাইলাম। একটু হাসিয়া মাকে বলিলাম, "অনেক আরাম ও আনন্দ পাইতেছি"—বলিয়া মার পায়ে হাত দিলাম। ভোর হইতে না হইতেই মা উঠিয়া গেলেন ও মেজের উপর কাপড় মুড়ি দিয়া শুইয়া পড়িলেন। এই তাঁহার সাধারণতঃ শুইবার স্বভাব। শুধু মাটিতেই বেশী সময় পড়িয়া থাকিতেন,—শীত নাই, গ্রীষ্ম নাই, জল-কাদা কিছুই মানিতেন না, যেখানে সেখানে পড়িয়া থাকিতেন।

১৩৩৩ সনের ৺দুর্গাপূজার সময় চট্টগ্রামের শশিবাবু (শ্রীযুক্ত শশিভূষণ দাসগুপ্ত) শাহবাগে আসিয়াছিলেন—

মার ফোটোতে জ্যোতির উদ্ভাস—আশ্বিন ১৩৩৩।

ইচ্ছা, মাকে দর্শন করিবেন ও তাঁহার ফটো নিবেন। মা সেদিন সকাল হইতেই কোঠা ঘরে যাইয়া একান্তে শুইয়া ছিলেন। অটলদাদার বউকে বাহিরে বসাইয়া রাখিয়াছিলেন। তাঁহাকে বলিয়া দিয়াছিলেন, "কেহ যেন

ভিতরে আমার কাছে না যায়।” ইহার মধ্যে জ্যোতিষদাদা ও শশিবাবুকে সঙ্গে লইয়া ভোলানাথ ঐ স্থানে উপস্থিত হইলেন। মা তখন সমাধি অবস্থায় ছিলেন। দেহ হইতে চারিদিকে একটি দিব্য জ্যোতি বিকীর্ণ হইতেছিল। সমাধি হইতে ব্যুত্থিত হইবার পরেও কিছুক্ষণ পর্য্যন্ত ঐ জ্যোতিটী ছিল। তবে উহা তখন সঙ্কুচিত হইয়া ললাটে উজ্জ্বল বিন্দুর আকারে ভাসিতেছিল। একেবারে তিরোহিত হয় নাই। মাকে ধরিয়া নিয়া ছবি তোলার জন্য নির্দ্দিষ্ট স্থানে বসান হইল। তিনি তখনও আবিষ্ট অবস্থাতে ছিলেন—ভাল করিয়া চক্ষু উন্মীলিত করিতে পারেন নাই। শশিবাবু অনেকগুলি প্লেট ব্যবহার করিয়াছিলেন—কিন্তু সবগুলিই নষ্ট হইয়াছিল। শেষখানা ভাল উঠিয়াছিল। উহাতে দুইটী বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়। প্রথমতঃ মার ললাটে গোলাকার একটী জ্যোতির চিহ্ন উঠিল। দ্বিতীয়তঃ মার পিছনে জ্যোতিষবাবুর ছবি উঠিল, অথচ জ্যোতিষবাবু ফটো তোলার সময় মার পিছনে ছিলেন না।*

*মার মুখে শুনিয়াছি যে, ফটো তোলার সময় তাঁহার মনে জ্যোতিষবাবুর কথা জাগিয়াছিল। তাঁহার অন্তরস্থিত ঐ ভাব তীব্রতার জন্য পরিস্ফুট, ঘনীভূত ও সাকার হইয়া প্লেটে প্রতিবিম্বিত হইয়াছিল। তখন যে মা একটি বিশিষ্ট অবস্থায় ছিলেন তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। ইহার পূর্ব্বেও একবার ফটো উঠাইবার সময় ভাবাবস্থায় মার বাম হাত একেবারে উপরের দিকে উঠিয়া যায়। সেই ছবিতে কপালে

পূর্ব্বোক্ত কালীপূজার পরই আশুর (টিকাটুলীর রামকৃষ্ণ রোডের আশুতোষ বন্দ্যোপাধ্যায়ের) মা কি একটী স্বপ্ন দেখিয়া ঐ কালীর পূজা দেন। কয়েকদিন পর বীরেন-দাদাও এক স্বপ্ন দেখিলেন,—তিনিও কালীর পূজা দিবেন। সব আয়োজন হইয়াছে। বলিও হইবে। কিন্তু খাঁড়া ধার দিবার সময় বীরেনদাদার আঙ্গুল কাটিয়া গেল। খবর পাইয়াই মা বলিলেন, "বেশ হইয়াছে, আমিও ভাবিতেছিলাম, একটু রক্ত আবশ্যক। একটা বেল-পাতায় করিয়া একটু রক্ত রাখিয়া দাও।" তাহাই হইল। ভোলানাথ পূজা করিলেন। মা শুইয়াছিলেন। একজন একখানা লাল শাড়ী মাকে দিয়াছিল, তাহাই মাথার নীচে দিয়া মা নিকটেই মাটিতে শুইয়াছিলেন। পূজা হইয়া গেল। বলির সব বন্দোবস্ত হইয়াছে, ভোলানাথ বলি দিতে গিয়াছেন। যেই বলি দিবেন, অমনি মা হঠাৎ ধড়ফড় করিয়া উঠিয়া দৌড়িয়া গিয়া পাঁঠার গলায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িলেন। তাঁহার আলু-থালু বেশ, চক্ষু যেন ঝক্‌ঝক্ করিয়া জ্বলিতেছে। ভোলানাথের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "বলি দিতে পারিবে না।" সকলেই অবাক্, ভোলানাথ খাঁড়া নামাইয়া রাখিলেন। মা পাঁঠার গায়ে হাত বুলাইয়া দিলেন। মা কি করেন সকলেই দেখিতেছেন।

আশুর মার ও বীরেন দাদার কালীপূজা।

পূর্ণচন্দ্রাকৃতি চিহ্ন পড়িয়াছিল। বহু পূর্ব্বেও একবার ফটোতে সিন্দুরের ফোঁটার মধ্যে একটা জ্যোতির বিন্দুর মত উঠিয়াছিল।

তিনি আশুকে ডাকিলেন ও তাহাকে তাঁহার মাথার নীচে যে লাল শাড়ী ছিল, তাহা পরিয়া আসিতে বলিলেন। সে লাল শাড়ী পরিয়া আসিলে তাহার কপালে সিন্দুর দেওয়া হইল। পরে মা আশুর মাকে বলিলেন, "তুমি ছেলেকে ছাড়িয়া দিতে পারিবে?" তিনি রাজি হইলেন। বলিলেন, "তুমি বলিলে পারি।" তখন মা বলিলেন, "তোমার ত একার ছেলে নয়, ছেলের বাপ (যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়) ছাড়িবে কেন?" এই বলিয়া একটু হাসিয়া আশুকে বলিলেন, "পাঁঠাটী কোলে করিয়া আমার সঙ্গে চল।" বলিয়াই মা হাঁটিতে আরম্ভ করিলেন, সঙ্গে সঙ্গে আমরা অনেকেই আলো নিয়া চলিলাম, আশুও পাঁঠা কোলে নিয়া চলিল। বর্ত্তমান রমনার আশ্রমের পিছন দিকে মাঠের মধ্যে যে একটা ছোট গোল পুকুর আছে মা তাহার পাড়ে আসিয়া পাঁঠাটী ছাড়িয়া দিতে বলিলেন ও পাঁঠাটীর সমস্ত শরীরে নিজের চরণ উঠাইয়া বুলাইয়া দিলেন ও শাহবাগের দিকে ফিরিয়া চলিলেন। পাঁঠাটী মার পিছনে পিছনে চলিল। মা গিয়া যেখানে বসিলেন, পাঁঠাটীও সেখানেই তাঁহার নিকটেই বসিল। পূজাদি হইয়া গেল, সকলে প্রসাদ পাইয়া বিদায় লইলেন। পাঁঠাটী শাহবাগেই রহিয়া গেল। পরে এই পাঁঠাটী কীর্ত্তনের সময় মার কোলের কাছে বসিয়া থাকিত। রাত্রিতে মার চৌকির নীচে গিয়া শুইয়া থাকিত। প্রায় সময়ই সে মার পিছনে পিছনে থাকিত। একদিন খুব শীত পড়িয়াছে, মা একটী কম্বল

নিয়া পাঁঠাটীর গায়ে দিয়া উহাকে শোয়াইয়া দিলেন ও বলিলেন, "পূর্ব্বজন্মে ও কম্বলধারীই ছিল, এ জন্মেও কম্বল গায়ে পড়িল।" বীরেনদাদা অনেকবার জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "এই পাঁঠাটী কে ছিল?" কথায় কথায় মা একদিন বলিয়াছিলেন, "সন্ন্যাসী ছিল।" পরে মাঠে ঘাস খাইয়া পাঁঠাটী খুব পুষ্ট হইয়া উঠিল। একবার মা ঢাকার বাহিরে গেলে পাঁঠাটী প্রাচীর টপ্‌কাইয়া কোথায় চলিয়া গেল।

কালীর স্থান-পরিবর্ত্তন।

কিছুদিন পর মা কালীর মূর্ত্তি গোলঘর হইতে ছোট দালানের কোণের ঘরটীতে নিয়া যাইতে বলিলেন। ঐ দালানটীতে তিনি পূর্ব্বে থাকিতেন। মার আদেশে অতি প্রত্যুষে যোগেশ বাবু, সুরেনবাবু, বিনয়বাবু প্রভৃতি স্নান করিয়া মূর্ত্তি গোলঘর হইতে নিয়া গেলেন। সেই দিন রাত্রিতে ভয়ানক ঝড় হইয়া গোলঘরের দরজা ভাঙ্গিয়া কালীর প্রতিমা যেখানে বসান ছিল, সেইখানেই পড়িয়া যায়। তখন সকলেই বুঝিল— মা কেন প্রতিমা সরাইয়াছিলেন।

কীর্ত্তনে ধূপের কথা।

প্রথম প্রথম কীর্ত্তনে ধূপ দেওয়া হইত না। একদিন কীর্ত্তনের সময় খুব ধূপের গন্ধ বাহির হইল। কীর্ত্তনের পরও বাগানময় ধূপের গন্ধ সকলেই পাইলেন। তখন একজন প্রশ্ন করিল, "এত ধূপের গন্ধ কোথা হইতে আসিল? ধূপ ত জ্বালানই হয় নাই।" তখন জটু বলিল, "কেন, আমি ত কীর্ত্তনের

সময় দেখিয়াছি, খুকুনীদিদি কীর্ত্তনে ধূপ জ্বালাইয়া দিল।” কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে ধূপ জ্বালানই হয় নাই। সেই হইতে মা আদেশ দিলেন, “কীর্ত্তনে যেন রোজই ধূপ দেওয়া হয়।”

মার অবস্থা দেখিতাম—দিন দিনই যেন তাঁহার কাজ করা বন্ধ হইয়া আসিতেছে। রান্না করিতে হাত বাঁকিয়া যাইতে লাগিল। মা বলিতেন, “দেখ, সংসার আমরা ছাড়ি না, সংসারই আমাদের ছাড়িয়া দেয়।” গৃহকর্ম্ম, সেবা, কিছুই মা ইচ্ছা করিয়া ছাড়েন নাই। কিন্তু সব যেন মাকে ছাড়িয়া দিল। ভোলানাথের সেবা নিজ হাতেই সব করিতেন। অসমর্থ হইলেও ভোলানাথ বলিলে বাম হাত দিয়াও অনেক চেষ্টায় রান্না করিয়া দিয়াছেন।

মার অবস্থা-পরিবর্ত্তন।

একদিন আমাদের টিকাটুলীর বাসায় রাত্রিতে ভোগের পর ভোলানাথ খাটে শুইয়া মাকে বলিলেন, “পাটা টানিয়া দাও ত!” মা পায়ের নীচে বসিয়া পা টিপিতে লাগিলেন। কিন্তু হাত বাঁকিয়া যাইতে লাগিল, পারিতেছেন না। ভোলানাথ শুইয়াছিলেন, এই অবস্থা দেখেন নাই, তাই তিনি বলিলেন, “জোরে দাও না।” যেই বলা, অমনি মা শিশুর মত উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিয়া উঠিলেন, মা কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন, “আমি যে পারি না, তা তুমি বুঝ না।” অমনি ভোলানাথ উঠিয়া বসিয়া বলিলেন, “দরকার নাই।” কিন্তু কে শুনে? কাঁদিতে কাঁদিতে মা সমাধিস্থ হইয়া পড়িলেন। সারারাত্রি ঐ ভাবেই গেল, সকালেও অনেক

বেলায় মাকে উঠান হইল পরে শাহবাগে চলিয়া গেলেন। এইভাবে প্রত্যেক কাজই ছাড়িয়া যাইতে ছিল। কখনও হয়ত এক একটা করিয়া চেষ্টা করিতেছেন, কিন্তু তাহা হঠাৎ হইয়া যাইতেছিল, কাজকর্ম্ম করা প্রায় বন্ধ হইয়া আসিল। একদিন না খাইয়াও যিনি কত কাজ অক্লান্তভাবে করিয়া গিয়াছেন, আজ বহু কাজ করিবার থাকিলেও তাঁহার সেদিকে লক্ষ্যই নাই, করিতে গেলেও বিভ্রাট্ হয়। নয়টা ভাত খাইতেন, তারপর তিনটা ভাতও অনেকদিন খাইতেছেন। আশ্চর্য্যের বিষয়—তিনটা ভাতের বেশী একটু ভাতের কণা গলা পর্য্যন্ত গেলেও তাহা বাহির করিয়া ফেলিতেন, গিলিতেই পারিতেন না। ঐ যে তিনটা ভাত খাইবার কথা, বেশী আর খাইবেন না।

ঢাকা—পারুলদিয়া গমন।

কিছুদিন পর পারুলদিয়া রায়বাহাদুরের বাড়ী মাকে ও ভোলানাথকে নিলেন—সঙ্গে আমি গেলাম। পূর্ব্বের মত প্রায়ই আমার জ্বর হইত, কোন ঔষধ খাইতাম না। মা জল-ভাত, দই-ভাত যাহা খাইতে বলিতেন, তাই খাইতাম। জ্বর নিয়াই পারুলদিয়া গেলাম। আমি বড় শুইতাম না, মার সঙ্গে সঙ্গেই ঘুরিতাম। পারুলদিয়াতে মা আমাকে ও ভোলানাথকে বলিলেন, "চল আমরা পুকুরে স্নান করিয়া আসি।" জ্বরের মধ্যে মার সঙ্গে স্নান করিয়া আসিলাম। ২।৩ মাসের জ্বর স্নানের পর হইতেই বন্ধ হইল। গিয়া দেখি কালীপূজা হইবে, সকলে মাকে পূজা করিতে অনুরোধ করিতেছেন। মা রাজি হন নাই। পুরোহিত

ঠিক করার চেষ্টা হইল। কিন্তু কি ঘটনায় পুরোহিত পাওয়া গেল না। অগত্যা ভোলানাথের কথায় মা পূজা করিতে রাজি হইলেন। মা পূজা করিলেন, ভোলানাথও যজ্ঞাদি করিয়া সাহায্য করিলেন। এই বাড়ীর স্ত্রী-পুরুষ অনেকেই বিলাত-ফেরত, পূজার কোন কারবারই এই বাড়ীতে ছিল না। মায়ের সঙ্গ পাইয়াই এই পূজার আয়োজন।

ভোরে গিয়া বাবা পারুলদিয়া উপস্থিত। সেই দিনই আমরা ওখান হইতে রওনা হইয়া আসিলাম। মা নৌকায় আসিলেন, বাবাও সঙ্গেই ছিলেন। বাবা মাকে অনুরোধ করিলেন, "অতি নিকটেই আমাদের বাড়ী, একবার পিতৃপুরুষের ভিটা পবিত্র করিয়া যাও।" ভোলানাথ রাজি হইলেন, বাবা মাকে নিজ বাড়ীতে রাজদিয়া গ্রামে নিয়া গেলেন, সেখানে ভোগ হইল। ভোগের পরেই মা রওনা হইলেন। বাবাও ঢাকা চলিয়া গেলেন। ভোলানাথ, মা ও আমি সীতানাথ কুশারী মহাশয়ের বাড়ী (মরণীদের বাড়ী) গেলাম। রাজদিয়া হইতে অল্প দূরেই ভোলানাথের বাড়ী, আমরা সেখানেও গেলাম। বাড়ীতে তখন কেহ ছিলেন না। মা বাড়ীতে উঠিলেন না। ভোলানাথও আমরা দেখিয়া আসিলাম। কুশারী মহাশয় মাকে দেবীর মত শ্রদ্ধা করিতেন। মাকে পাইয়া তিনি কৃতার্থ বোধ করিলেন ও মার কাছে বসিয়া চণ্ডীপাঠ করিলেন। সেখানেও কি একটা পূজা হইল।

রাজদিয়া ও অন্যান্য গ্রামে ভ্রমণ।

পূজার পূর্ব্বেই আমরা ঢাকায় চলিয়া আসিলাম। রাজদিয়া হইতে মা একটী ভক্তের অনুরোধে আউটসাহী গ্রামেও গিয়াছিলেন।

কিছুদিন পর রায়বাহাদুরের মাতার শ্রাদ্ধোপলক্ষ্যে মাকে আবার পারুলদিয়া গ্রামে নেওয়া হইল। এবারও আমি, ভোলানাথ ও একটী মালী মার সঙ্গে গেলাম। রায়বাহাদুর নূতন ডাক্তারখানা ও ডাক্তারের বাসা তৈয়ার করিয়াছেন, সেই বাড়ীতেই মাকে থাকিতে দিলেন। আমাদের তিনজনের সেখানেই পাক হইত। রায়বাহাদুর মাকে বলিলেন, "আমাদের কুলগুরু নাই, আপনাদেরই আমি গুরু বলিয়া মনে করি। তাই মার কাজ করিতে বসিবার সময় আপনি সামনে বসিয়া থাকেন, ইহা আমার ইচ্ছা।" তাহাই হইল। কিন্তু মাতৃকার্য্য করিবার সময়ও রায়বাহাদুর পায়জামা ও সার্ট গায়ে দিয়া বসিলেন। একে বৃদ্ধ, দ্বিতীয়তঃ সর্ব্বদা উহা পরিয়া থাকার অভ্যাস। পুরোহিতও পায়জামা ছাড়িতে বলিতে সাহস পান নাই, ঐ ভাবেই কাজ করাইতেছিলেন। মা কিন্তু ইহা দেখিয়া পুরোহিতকে বলিলেন, "এই সব কাজের সময় কি জামা ইত্যাদি পরা থাকে?" পুরোহিত বলিলেন, "জামা পরা ত ঠিক নয়, কিন্তু উনি খালি গায়ে বসিতে পারিবেন না, তাই কিছু বলি নাই।" রায়বাহাদুরও বলিলেন,

পারুলদিয়াতে পুনর্গমন,—রায় বাহাদুরের মাতৃশ্রাদ্ধ— অগ্রহায়ণ, ১৩৩৩।

"আমার ঠাণ্ডা লাগিয়া যায়, সেই ভয়ে ছাড়ি নাই।" মা অমনিই বলিলেন, "এই সব শ্রাদ্ধের কাজে কিছু হয় না, সব খুলিয়া ফেলাই ভাল, কিছু হইবে না।" রায়বাহাদুর বলিলেন, "আপনি যাহা বলিবেন তাহাই করিব।" এই বলিয়া সব খুলিয়া কাপড় গায়ে দিয়াই বসিলেন। সন্ধ্যার পর সব কাজ সারিয়া গিয়া মাকে বলিলেন, "সারাদিন এই ভাবে খালি গায়ে আমি কখনও থাকি না, একটুতেই অসুখ হয়, কিন্তু আজ আপনার কথায় আমার কিছুই হয় নাই, বেশ আছি।" মার আদেশে সেই রাত্রিতে কীর্ত্তনের বন্দোবস্ত হইল। খুব কীর্ত্তনাদি হইল। ছোট ছোট মেয়েদের (রায়বাহাদুরের পৌত্রীদের মা বলিলেন, "তোমাদের ত শ্রাদ্ধের কিছু করিবার নাই, তোমরা আজ সমস্ত রাত্রি নাম রক্ষা কর।" কীর্ত্তনের পরই তাহারা নাম আরম্ভ করিবে স্থির হইল। ভ্রমরই সকলের বড়, সেও নাম করিবে। কীর্ত্তনে মার খুব ভাব হইল। তিনি প্রায় সমস্ত বাড়ীটাই প্রদক্ষিণ করিলেন। কি সুন্দর মূর্ত্তি, চুল এলাইয়া পড়িয়াছে, কোমরে কাপড় জড়ান, চক্ষুতে অপূর্ব্ব দৃষ্টি! যেখানে মিঠাই তৈয়ার হইতেছিল, সেখানে গিয়াও হালুইকরদের নাম করাইলেন। মুসলমানেরা একধারে দাঁড়াইয়াছিল। তাহাদের কাছে গিয়া আল্লার নামই করিলেন ও করাইলেন। রায়বাহাদুর ও তাঁর পুত্র-পৌত্রেরা সকলেই নাম করিতে লাগিলেন। এ বাড়ীতেও ইতিপূর্ব্বে কেহ "হরি"-নাম পর্য্যন্ত শোনে নাই। আজ সকলে আশ্চর্য্য হইয়া

যাইতেছে। মার আদেশে রায়বাহাদুর ধূপতি হাতে নিয়া কীর্ত্তনের চারিধারে প্রদক্ষিণ করিলেন। কি এক শক্তিতে যেন আজ তাঁহারা এই সব কাজ করিতে বাধ্য হইতেছেন। ইতিপূর্ব্বে ইঁহারা এ সব কিছুই মানিতেন না। কীর্ত্তনে নাম বন্ধ হইতে না হইতেই মা আমার মুখ চাপিয়া ধরিয়া কানের কাছে শুধু বলিলেন—"নাম" আর বেশী কথা বলিতে পারিলেন না; তখন ও প্রকৃতিস্থ হন নাই। আমি বুঝিলাম, মা আমাকে মৌনী হইয়া নাম করিতে বলিলেন। তাই করিতে লাগিলাম। কীর্ত্তন বন্ধ হইল।

আমরা মাকে লইয়া তাঁহার থাকিবার জন্য নির্দ্দিষ্ট স্থানে গেলাম। সকলেই সঙ্গে সঙ্গে গিয়া পৌঁছাইয়া দিয়া আসিলেন। রায়বাহাদুরের ছেলেরা সকলেই উপস্থিত ছিলেন। মার অবস্থা দেখিয়া সকলেই মুগ্ধ। আমি মৌনভাবে নাম করিতেছি। এদিকে মেয়েরা খাওয়া-দাওয়া করিয়া আসিল। তাহারা অনেকক্ষণ নাম করার পর শুইয়া পড়িল, মা আমাকে নাম করিতে বলিলেন। ঘুমাইয়া পড়ি ভয়ে হাঁটিয়া হাঁটিয়া নাম করিলাম। অতি প্রত্যুষেই মা উঠিয়া নাম আরম্ভ করিলেন এবং ভ্রমরকে ও অন্যান্য মেয়েদের তুলিয়া দিলেন। কিছুক্ষণ নাম হইয়া বন্ধ হইল। এদিকে ঢাকায় কি উপলক্ষে কীর্ত্তন সুরু হইয়াছিল ঠিক মনে নাই,—হয়ত সোমবার কি বৃহস্পতিবারের কীর্ত্তন হইবে। বাবা কালীপূজার দিন হইতে শাহবাগে আছেন। মা আমাকে নিয়া আসিলেন। কমলাকান্তকে

তাঁহার সেবার জন্য রাখিয়া আসিলেন। মার আদেশেই বাবাকে টেলিগ্রাম করা হইল, —"মা ঢাকা না ফিরিয়া যাওয়া পর্য্যন্ত যেন কীর্ত্তন বন্ধ না হয়।" বাবা মেডিকেল স্কুলের ছেলেদের দিয়া ও অন্যান্য লোকজন দিয়া কীর্ত্তন রক্ষা করিতেছিলেন। কীর্ত্তনের তৃতীয় দিনে আমরা মার সহিত ঢাকা গিয়া পৌঁছিলাম। রাস্তা হইতেই কীর্ত্তন শুনা যাইতেছিল, মা গাড়ীর ভিতরেই সমাধিস্থ হইয়া পড়িলেন। গাড়ী কীর্ত্তনের ঘরের সামনে গিয়া দাঁড়াইতেই মাকে দেখিয়া সকলে আনন্দে আরও উচ্চৈঃস্বরে কীর্ত্তন আরম্ভ করিল, এবং গান ধরিল, "মা আমাদের ঘরে এল, হরি বল হরি বল।" মহানন্দে তাহারা নাচিয়া নাচিয়া গাহিতে লাগিল। এদিকে মাকে কোন প্রকারে গাড়ী হইতে নামান হইল। মা কীর্ত্তনের মাঝখানে গিয়া সটান ভাবে মাটিতে গড়াইয়া পড়িলেন। দেখিলাম, কাশী হইতে নির্ম্মলবাবু সকলকে নিয়া রয়ানি-পূজা করিতে ঢাকায় আসিয়াছেন।* দিদি, নির্ম্মলবাবু,

---

*এই অগ্রহায়ণ মাসেই নির্ম্মলবাবু (৺নির্ম্মলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়) মাকে প্রথম দর্শন করেন। তিনি মাঘমাসে বাবার টিকাটুলীর বাসাতে আসিয়া রয়ানি-পূজা করেন। এই উপলক্ষ্যে মা টিকাটুলীর বাসায় চারি দিন ছিলেন। ওখান হইতে শাহবাগে ফিরিবার দিন সিঁড়ি দিয়া নামিবার সময় পায়ে চোট লাগিয়া পায়ের পাতার হাড় ভাঙ্গিয়া যায়। মা সাতদিন চৌকির উপর বসিয়াছিলেন—নামেন নাই, খাইতেনও না। এই পা-ভাঙ্গার রহস্য কি সে সম্বন্ধে মা পরে একদিন প্রসঙ্গতঃ বলিয়াছিলেন,—

সকলেই এই দৃশ্য দেখিয়া আনন্দে মুগ্ধ হইয়া চাহিয়া আছেন। সকলেরই চক্ষু সজল। অনেকক্ষণ পর মা একটু সুস্থির হইলেন।

একদিন ভোরে নির্ম্মলবাবু শাহবাগে গিয়াছেন। তার পূর্ব্বদিন রাত্রিতে আমরা অনেকেই মার কাছে ছিলাম। মা সকলকে নাম করিতে বলিলেন—সঙ্গে সঙ্গে মাও অনেকক্ষণ নাম করিলেন। সমস্ত রাত্রি নাম-কীর্ত্তনে কাটিয়া গেল। পরদিন সকালবেলা নির্ম্মল বাবু হঠাৎ শাহবাগের দরজায় গিয়া দাঁড়াইতেই মাও উঠিয়া দরজায় যাইয়া দাঁড়াইলেন। তখন মায়ের পায়ে হাত দেওয়া নিষেধ ছিল। কিন্তু নির্ম্মলবাবু দুইটী জবা ফুল নিয়া আসিয়াছিলেন। তিনি নিজের ভাবে বিভোর হইয়া একটী জবা মার পায়ে ও একটী মায়ের মাথায় দিলেন, এবং

নির্ম্মলবাবুর সরস্বতীরূপে মাতৃদর্শন।

"দেখ, সেই পূজার সময় যখন পাঁঠা বলি হইয়াছিল, তখন পাঁঠার কান কাটিয়া গিয়াছিল। গলা সম্পূর্ণ কাটিবার পূর্ব্বে কান কাটিয়া গেলে বলির অঙ্গহানি হয়। এই প্রকার দোষনিবৃত্তির কোন বিধান পুরোহিত দিতে পারিল না। কিন্তু বাবার কল্যাণে যখন পূজা হইয়াছে তখন বলিতে অঙ্গহানি হইলে অশুভ ফল হওয়ার কথা, এরূপ আমার মনে হইল। তাই এই শরীরটার উপর দিয়া ঐভাবে একটা চোট লাগিয়া গেল। এইরূপই হইয়া যাইত—আমি ত নিজে ইচ্ছা করিয়া কিছু করি না। যাহারা এই শরীরটার উপর নির্ভর করিয়া থাকিত, কখনও তাহাদের কোনরূপ অমঙ্গল আশঙ্কা হইলে এই শরীরের উপরই কিছু না কিছু হইয়া যাইত।"

চরণে মস্তক লুটাইয়া প্রণাম করিলেন। সঙ্গে সঙ্গে নির্ম্মল বাবুর স্ত্রী এবং আরও দুই একটী ভক্ত প্রণাম করিলেন। মা কিছু বলিলেন না। এই ভাবে মাকে প্রণাম নিতে দেখিয়া আরও দুই একটী ভক্ত দৌড়িয়া প্রণাম করিতে গেলেন; কিন্তু মা সে স্থান হইতে চলিয়া যাওয়ায় আর প্রণাম করিতে সাহস করিলেন না। মা ফুল দুইটী হাতে করিয়া রাখিলেন। পরে যখন রমনার কালীপূজার ফুল তুলিতে ডালা নিয়া শাহবাগে গেল, তখন মা সেই ডালায় ঐ নিবেদিত ফুল একটী দিয়া দিলেন এবং নির্ম্মলবাবুকে বলিলেন, "তোমার ফুল পূজার ফুলের ডালায় দিয়া দিয়াছি।" নির্ম্মলবাবুও উত্তরে বলিলেন, "বেশ, তোমার যেখানে ইচ্ছা দাও।" এই ঘটনার কিছু পরে মা সিদ্ধেশ্বরী রওনা হইলেন। মার সঙ্গে সঙ্গে অনেকেই হাঁটিয়া সিদ্ধেশ্বরী চলিলেন। সেখানে যাইয়া মা সিদ্ধেশ্বরীর আসনে বসিলেন। কিছুক্ষণ পরে ধানকোড়ার বাড়ীর মোটরে মাকে শাহবাগে আনা হইল। নির্ম্মলবাবু এবং অন্যান্য ভদ্রলোক হাঁটিয়া শাহবাগে আসিতেছিলেন। তখন বেলা প্রায় দশটা। এই পরিষ্কার সূর্য্যালোকে নির্ম্মলবাবু দেখিলেন, নাচ-ঘরের একটী থামে হেলান দিয়া যেন সরস্বতী-মূর্ত্তি দাঁড়াইয়া আছেন। একটু নিকটে আসিতেই নির্ম্মলবাবু দেখিলেন মা-ই ঐ মূর্ত্তিতে দাঁড়াইয়া আছেন। নির্ম্মলবাবু বলিয়াছেন—এত শুভ্র বর্ণ তিনি আর কখনও দেখেন নাই। তিনি খুব চাপা প্রকৃতির লোক ছিলেন, কিন্তু এই ঘটনায় তিনি এত আশ্চর্য্য হইয়া

ছিলেন যে, তখনই তিনি সকলের কাছে এই ঘটনা বলিয়াছিলেন।

শুনিলাম কুলদাকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় নামে একজন ভদ্রলোক কীর্ত্তনের প্রারম্ভ হইতেই কিছু খাইতেছেন না। তাঁর সঙ্কল্প-কীর্ত্তন-শেষে মা ফিরিয়া আসিলে জল খাইবেন। অনেকদিন পূর্ব্বে তিনি একবার মাকে দেখিয়া গিয়াছিলেন আর আসেন নাই। এই কয়দিন পূর্ব্বে আবার আসিয়াছেন। তিনদিন যাবৎ আসিয়া মাকে না দেখিয়া জল পর্য্যন্ত খান নাই। তিনি আসিয়া মাকে প্রণাম করিলেন এবং মার অনুমতি নিয়া জল খাইলেন। ইনি খুব নিষ্ঠাবান্ ও কঠোর কর্ম্মী। ইনি এখন একেবারেই গৃহত্যাগ করিয়া আশ্রমবাসী হইয়াছেন। ১৩৪২ সনের জ্যৈষ্ঠ-মাসে যোগেশদাদা উত্তর-কাশী গেলে ইনিই অন্নপূর্ণা মন্দিরের পূজার কার্য্যে ও দৈনিক হোমাদি কার্য্যে নিযুক্ত হইলেন। আশ্রম হওয়ার পরে ইঁহার কনিষ্ঠ পুত্রটীকেও আশ্রমে ব্রহ্মচারী করিয়া দিলেন। সিদ্ধেশ্বরী-আশ্রমেতেই ছেলেটীর পৈতা হইল।

কুলদা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথা।

এই ভাবে মায়ের লীলা চলিতে লাগিল। প্রথম প্রথম কালী-প্রতিমার পূজা প্রতিদিন বিশেষ কিছু হইত না,—কমলাকান্ত মালা দিত ও বাবা প্রত্যহ গীতা ও চণ্ডী পাঠ করিতেন। বাবা যখন কালী-মন্দিরে থাকিতেন তখন নিয়ম মত গীতা

যজ্ঞাগ্নি রক্ষার ও কালীপূজার ব্যবস্থা।

ও চণ্ডীপাঠ করিতেন এবং নিজের সন্ধ্যাপূজাদি করিতেন। মা বলিতেন, "এই ত পূজা হইতেছে।" পারুলদিয়া হইতে আমাকে মৌনী করিয়া নিয়া আসিবার পর হইতে দিন-রাত কালী-মন্দীরে যজ্ঞের আগুনের কাছে একজনকে মৌনী হইয়া নাম করিতে হইত। কমলাকান্ত, আমি ও আর একটী স্ত্রীলোক ভাগাভাগি করিয়া এই কাজের ভার পাইলাম। দিনরাত্রি অগ্নি ও নাম রক্ষা করিতে হইত। একদিন রাত্রি বারটা হইতে তিনটা পর্য্যন্ত কমলাকান্ত অগ্নি রক্ষা করিতেছিল। তিনটার পর আমার রাখিবার কথা, তিনটার সময় বাবাও উঠিয়া কাজে বসিতেন। আমি তিনটায় উঠিয়া দেখি—কমলাকান্তের অসাবধানতায় আগুন নিভিয়া গিয়াছে। দৌড়িয়া গিয়া মাকে খবর দিলাম। ভোলানাথ অনেক চেষ্টায় মাকে উঠাইলেন, মা সব শুনিয়া ভোলানাথ ও আমাকে নিয়া দরজা বন্ধ করিয়া দিলেন। পরে মার কথামত ভোলানাথ অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করিলেন—কি ভাবে অগ্নি জ্বালান হইল তাহা প্রকাশ করিতে আমাদিগকে নিষেধ করিয়া দিলেন। একটা ধূপতির আগুন আমার কাছে দিয়া মা বলিলেন, "সাতদিন একেবারে মৌনী হইয়া তুমি এই অগ্নি রক্ষা কর।" তাই করিতে লাগিলাম। সাতদিন পর শাহবাগের পুষ্করিণীর পাড়ে একটা কুণ্ড করিয়া মা ও ভোলানাথ অগ্নি স্থাপন করিলেন। কুলদা দাদা তখন হইতেই সেই অগ্নিতে কিছু কাজ করিবার

আদেশ পাইলেন। কখনও কখনও সেই অগ্নিতে চরু ইত্যাদি পাক হইত। কুলদা দাদা তাহাই খাইয়া থাকিতেন। কালী পূজার ও যজ্ঞের ভার এখন হইতে ধীরে ধীরে কুলদা দাদার উপর পড়িল।* কি কি নিয়মে উহা করিতে হইত তাহা তিনিই জানেন, সাধারণে তাহার প্রকাশ হইত না। মা যে কার্য্যের ভার যাহাকে দিতেন, সেই কার্য্যের বিষয়ে তাহাকেই বলিতেন, সকলের নিকট সব কথা প্রকাশ হইত না।

---

* ইনি প্রত্যহ এই কালীপূজা ও যজ্ঞের কার্য্য সমাধা করিয়া গভীর রাত্রিতে একাকী তিন চারি মাইল দূরে বাসায় ফিরিয়া যাইতেন। উপবাস করিয়া, ফল খাইয়া এবং সময়ানুসারে মার সকল ব্যবস্থা পালন করিয়া চলিতেন।

পঞ্চম অধ্যায়

হরিদ্বারে সেবার পূর্ণকুম্ভ। স্থির হইল মা ও ভোলানাথ আমাদিগকে লইয়া কুম্ভস্নানে যাইবেন। এদিকে যজ্ঞের ও কালীপূজার বন্দোবস্ত হইল। মার সহিত আমরা ১৩৩৩ সনের ফাল্গুন মাসে হরিদ্বার রওনা হইলাম। বাবা, আমি, কলিকাতার রাজেন্দ্র কুশারী ও তাঁহার স্ত্রী, মটরী পিসিমা, দিদিমা, দাদা-মহাশয়, সকলেই এই উপলক্ষ্যে তীর্থভ্রমণে বাহির হইলাম। কলিকাতা গেলাম। ভাগ্যকুলের কুণ্ডুদের একটা খালি বাড়ীতে রাজেন্দ্র কুশারী মার থাকিবার বন্দোবস্ত করিয়াছেন। আমাদের সঙ্গে প্রায় ১৯।২০ জন লোক ছিল। কাজেই কাহারও বাসায় উঠা উচিত মনে হয় নাই। রাজা জানকীনাথ রায়ের পুত্র যোগেন্দ্রবাবু মাকে দেখিয়া মার প্রতি খুবই শ্রদ্ধান্বিত হইলেন। তাঁহাদের নিজেদের বাড়ীতে একদিন মাকে নিয়া কীর্ত্তন করিলেন। মার খুব ভাব হইল। সেখানে বহুলোক একত্র হইয়াছিল। রায়বাহাদুরও তখন কলিকাতায় ছিলেন—তাঁহার চেষ্টায় ঢাকার নবাবজাদি প্যারীবানুর বাড়ীতেও কীর্ত্তন হইল। ইনিই শাহবাগের মালিক। রায়বাহাদুর প্যারীবানুরই ম্যানেজার ছিলেন। এখানেও মার খুব ভাব হইল, নবাবজাদি ছেলে-মেয়ে সহ "হরিনাম" করিলেন। পরেও অনেকদিন এ বাড়ীতে কীর্ত্তন

মহাকুম্ভ-দর্শনে হরিদ্বার যাত্রা—ফাল্গুন, ১৩৩৩।

হইয়াছে। মাকে ইঁহারা খুবই শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিতেন। এখানেও বহুলোক একত্র হইল।

সুরেন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের বাড়ীতেও মা গেলেন; চণ্ডীবাবু, হর্ষবাবু, অনন্তবাবু, প্রভৃতি অনেকে মার দর্শন পাইলেন।

মার ভাবের পরিবর্ত্তন।

সম্প্রতি মার একটী নূতন অবস্থা হইয়াছে। তিনি নৌকায় চড়িতে পারিতেন না—নৌকায় উঠিলেই জলের ঢেউয়ের সঙ্গে সঙ্গে কেমন হইয়া যাইতেন, জলে ঝাঁপাইয়া পড়িতে চাহিতেন, ধরিয়া রাখা মহা কষ্টকর হইত। মা পরে বলিয়াছিলেন, "জল এমন ভাবে আমাকে আকর্ষণ করিত যেন শরীরটা জলের সহিত মিলিয়া যাইতে চাহিত, কোন পার্থক্য-বোধ হইত না।" আবার এক ভাব ছিল,—দোতলায় উঠিতে পারিতেন না, উঠিতে গেলেই সমাধিস্থ হইয়া পড়িতেন। সিঁড়িতে পা দিতে পারিতেন না, শূন্যে পা দিতে যাইতেন, আর পড়িয়া যাইতেন। এই ভাবের কথায় একদিন বলিয়াছিলেন, "শরীরটাকে শূন্যে আকর্ষণ করে। বাতাস যেমন শূন্যের ভিতর মিলিয়া আছে, শরীরটা সেই ভাবে শূন্যে মিলিয়া গিয়াছে বলিয়া মনে হয়। তখন আর কিছুরই জ্ঞান থাকে না, তাই সিঁড়িতে পা দিতে পারি না।" তাঁহাকে দোতলায় উঠাইতে অথবা নামাইতে হইলেই ধরাধরি করিয়া করিতে হইত। বলিতেন, "সিঁড়ি দিয়া হাঁটিয়া উঠিতে হইবে বা নামিতে হইবে, এ ভাবই

থাকে না। সব যেন শূন্যময়—শরীরও তাই।” কি অদ্ভুত অবস্থা !

৺কাশীধাম—কুঞ্জবাবুর বাড়ীতে

৺কাশীধাম হইয়া হরিদ্বার যাইতে হইবে। কাশীতে শ্রীযুক্ত কুঞ্জমোহন মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের বাসায় মাকে নামান হইবে। তাঁহার ছেলে জিতেনদাদা তখন কলিকাতায় ছিলেন, তিনি কাশীতে লিখিয়া দিলেন। বাবাও লিখিয়া দিলেন যে, নীচের তলায় যেন মার থাকিবার স্থান করা হয়। নির্ম্মলবাবুরা মাকে দেখিয়া গিয়াছেন। কুঞ্জমোহন মুখোপাধ্যায় মহাশয় কোনও আবশ্যকীয় টেলিগ্রাম পাইয়া একদিনের জন্য কাশী ছাড়িয়া গিয়াছেন। ষ্টেশনে তাঁহার স্ত্রী ও নির্ম্মলবাবু সপরিবারে উপস্থিত, গলায় গামছা দিয়া হাত জোড় করিয়া দাঁড়াইয়া আছেন। গাড়ী পৌঁছিতেই মাকে দর্শন মাত্রেই তাঁহারা সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিলেন। সকলে মাকে বাসায় নিয়া গেলেন। সব দরজায় মঙ্গল-কলসী ও মালা মার আগমন উপলক্ষ্যে স্থাপন করা হইয়াছে। মার ও ভোলানাথের ভোগ হইয়া গেলে সকলেই প্রসাদ পাইলেন। এইবারই নেপাল-দাদা (শ্রীযুক্ত নেপালচন্দ্র চক্রবর্ত্তী) মাকে প্রথম দেখিলেন। মাকে নির্ম্মলবাবুর স্ত্রী ও তাঁহার এক গুরুভাই তাঁহাদের গুরু শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাছে একদিন নিয়া গেলেন। মার সঙ্গে ঠাকুরের কোন কথা হয় নাই। কিছু সময় বসিয়াই মা চলিয়া আসিলেন। আমরা সকলেই

সঙ্গে ছিলাম। গিয়া শুনিলাম মা আসিবার দুই দিন পূর্ব্বে কুঞ্জমোহন মুখোপাধ্যায় মহাশয় সন্ধ্যাবেলা ছাদে বসিয়া হঠাৎ মাকে দেখিতে পাইয়াছিলেন—যেন রক্তবস্ত্র পরিয়া মা সম্মুখে দাঁড়াইয়া আছেন। মাকে তিনি ইতিপূর্ব্বে আর কখনও দেখেন নাই, জিতেনদাদার ও নির্ম্মলবাবুদের মুখে শুনিয়াছিলেন মাত্র। ইতিপূর্ব্বে মা আসিবেন বলিয়া তিনি বিশেষ কিছু উৎসাহিত হন নাই। তবে বাবা মার খুব অনুগত হইয়াছেন, ইহা শুনিয়াছিলেন,—ভাবিলেন তিনিই যখন নিজে নিয়া আসিতেছেন, এবং অন্যান্য সকলের মুখেও খুব প্রশংসা শুনিয়াছেন, তখন এবার দেখিবেন। দর্শনের পরই মার জন্য রক্তচেলীর বস্ত্র নিয়া আসিলেন এবং মালা ও মঙ্গল-কলসী দরজায় বসাইলেন। মনে জাগিল, দেবী আসিতেছেন। রাত্রিতে মা একটু শুইয়াই উঠিয়া বসিয়া আছেন। ভোলানাথ শুইয়াই আছেন। মা বসিয়া বসিয়া ঢুলিতেছেন। ভোর রাত্রিতেই কুঞ্জমোহন মুখোপাধ্যায় মহাশয় আসিয়া মাকে দর্শন করিলেন, দর্শন মাত্রেই বুঝিলেন, এই মূর্ত্তিই তিনি দেখিয়াছিলেন। দেখিয়াই গলিয়া গেলেন, নানারূপ স্তবপাঠ করিতে লাগিলেন ও রক্তচেলী পরাইয়া রক্তজবা দিয়া পূজা করিলেন। ঢাকা হইতে বাহির হওয়ার পর হইতেই পা ছুঁইয়া প্রণামের নিষেধ ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল। বহু লোক প্রণাম করিতে আসিত, মা কিছু না বলিয়া শুধু হাত জোড় করিয়া থাকিতেন। এত লোককে বাধা দেওয়া অসম্ভব। বিশেষতঃ

মা বলিতেন, "পূর্ব্বে পা ছুঁইতে দিতে পারি নাই, এখন দেখি হাতও যাহা পা-ও তাহাই, উভয়ের কোনই প্রভেদ নাই। হাত ধরিতে যখন বাধা দিই না, তখন পা ধরিতেই বা বাধা দিবার কি আছে?" পরের দিন কীর্ত্তন হইল, মার ভাবও হইল, কিন্তু গড়াগড়ি দিলেন না, সমস্ত বাড়ীতে কেমন একটা ভাবে হাঁটিতে লাগিলেন।

পরের দিনই আমরা হরিদ্বার রওনা হইয়া গেলাম এবং তার পরদিনই অতি প্রত্যূষে হরিদ্বার পৌঁছিলাম। নির্ম্মলবাবু আগেই আসিয়া ধর্ম্মশালা ঠিক করিয়া ষ্টেশনে উপস্থিত ছিলেন।

হরিদ্বারে কুম্ভস্নান ও মথুরা বৃন্দাবন হইয়া ঢাকায় প্রত্যাগমন।

ফাল্গুন মাস, কিন্তু সকলেই কম্বল মুড়ি দিয়া কোন প্রকারে শীতে কাঁপিতে কাঁপিতে ধর্ম্মশালায় গেলাম, সেইদিন প্রথম স্নান। মা ও আমরা ধর্ম্মশালায় দাঁড়াইয়া সাধুদের যাত্রা দেখিতে লাগিলাম। পরে আমরা মার সহিত সকলে গিয়া ব্রহ্মকুণ্ডে স্নান করিয়া আসিলাম। সাতদিন ধর্ম্মশালায় থাকিয়া আমরা হৃষীকেশ কালী-কম্বলীওয়ালার ধর্ম্মশালায় গেলাম—দুই দিন থাকিয়া ও লছমন-ঝোলা ইত্যাদি স্থান দেখিয়া ফিরিলাম ও ভীম-গোড়ায় একটী পাঞ্জাবী সাধুর আশ্রমে ঘাসের কুটিয়াতে স্থান নিলাম। যে দিন হৃষীকেশ হইতে ফিরলাম সেই দিনই টেলিগ্রাম পাওয়া গেল—সীতানাথ কুশারী মহাশয় মারা গিয়াছেন। আরও এক টেলিগ্রাম পাওয়া গেল—জ্যোতিষবাবুর অবস্থা

খুবই খারাপ। ইতিপূর্ব্বেই তাঁহার শরীর অসুস্থ হইয়া পড়িয়াছিল, যক্ষ্মার সূচনা দেখা যাইতেছিল। এই দুই টেলিগ্রাম পাইয়া সেইদিন রাত্রিতেই মা সকলকে নিয়া ঢাকা অভিমুখে রওনা হইলেন। ভোলানাথের কনিষ্ঠ ভ্রাতা যামিনীবাবুও এই সঙ্গেই ছিলেন। যাওয়ার পথে মথুরা, বৃন্দাবন, আগ্রা প্রভৃতি তীর্থস্থান দেখিয়া যাইবেন। মা বাবাকে ও আমাকে একান্তে নিয়া (যাইবার কিছু পূর্ব্বেই) হরিদ্বারে তিনমাস থাকিতে আদেশ করিলেন এবং কি কি নিয়মে খাওয়া-দাওয়া ও থাকা আবশ্যক তাহা বলিলেন। মা চলিয়া যাইবেন অথচ আমরা সঙ্গে যাইতে পারিব না,—খুবই কষ্ট হইল, কিন্তু মার আদেশ পালন করাতেও যে একটা আনন্দ আছে তাহা অনুভব করিলাম। মার সঙ্গে দেখা হওয়ার পর এই প্রথম মাকে ছাড়িতে হইতেছে। প্রাণটা বড়ই অস্থির হইল। সন্ধ্যার পরে মা আমাদের সান্ত্বনা দিয়া ঐ আশ্রমেই রাখিয়া সকলকে নিয়া রওনা হইয়া গেলেন। আমাদের কুম্ভস্নানের জন্য বেশী ঝোঁক ছিল না, মার সঙ্গই প্রধান কথা। মা ইহাও বলিয়া আসিলেন, "যদি বাবার অসুখ করে তখনই কাশী চলিয়া যাইও, এখানে অপেক্ষা করিও না।" পরে শুনিলাম, মা টেলিগ্রাম পাইয়াই ভোলানাথকে বলিয়াছিলেন, "দেখ, আমি দেখিলাম যেন জ্যোতিষবাবুকে কোলে নিয়া আমি বসিয়া আছি।" তখনই ভোলানাথ বলিলেন, "তবে তাঁহার প্রাণের কিছু আশঙ্কা নাই।" অথচ তখন এমন অবস্থা যে ডাক্তারেরা জবাব

দিয়াছেন। মা নানাস্থানে ঘুরিয়া ঢাকা গেলেন। প্রায় দেড়-মাস পর ভোলানাথ কোনও কারণে পত্র লিখিয়া জানাইলেন যে, মা আমাদিগকে ঢাকা ফিরিয়া যাইতে লিখিয়াছেন। এ দিকে বাবারও খুব অসুখ হইল, আমি অনতিবিলম্বে হরিদ্বার ত্যাগ করিয়া কাশী গেলাম। পথে আমারও খুব জ্বর হইল। কাশীতে বাবা ও আমি একটু সুস্থ হওয়া মাত্রই ঢাকা গিয়া মার চরণে উপস্থিত হইলাম। শুনিলাম জ্যোতিষদাদা অপেক্ষা--কৃত ভাল আছেন। তিনি রমনায় শাহবাগের নিকটেই একটা বাড়ী ভাড়া করিয়া আছেন। মা রোজই একবার যান, ও রোজই একটু প্রসাদ পাঠাইয়া দেওয়া হয়। একদিন বাবা মাকে টিকাটুলীর বাসায় নিয়া নিজ ইষ্টমন্ত্রে তাঁহার পায়ের উপর পূজা করিলেন। মা পূজা শেষ হইবার সঙ্গে সঙ্গে উঠিয়া বসিলেন। কেমন একটা ভাবে বিভোর অবস্থা। বাবাকে সেই ভাবে বসিয়াই বলিলেন, "আজ হইতে তোমার ফুল-বেলপাতার বাহ্য পূজা শেষ হইল।" বাবা আবার সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিলেন। কিছুক্ষণ পর মা উঠিয়া দাঁড়াইলেন, শাহবাগ যাইবেন এমন অবস্থা হইয়াছে। পরে বলিলেন, "আমার মনে হইয়াছিল দোতলার রাস্তার দিকের বারান্দা হইতেই নীচে নামিয়া যাইব।" (সে দিকে কিন্তু নামিবার কোনই রাস্তা নাই)। শেষে একদিন বাবাকে বলিলেন, "তোমার কুলগুরুকে চিঠি লিখিয়া দাও, তিনি এ সম্বন্ধে কি আদেশ দেন জান।" আশ্চর্য্যের বিষয়

বাহ্যপূজা ত্যাগের কথায় তিনিও কোন আপত্তি করিলেন না, বরং সন্তুষ্টচিত্তে অনুমতি দিলেন। বাবার হার্টের খুব অসুখ ছিল, একটু বেশী হাঁটিলে নাড়ীর গতি খারাপ হইয়া যাইত। ট্রেণেও বেশী চলাফেরা করিতে পারিতেন না। মা তাঁহাকে শ্বাসের একটী প্রক্রিয়া নিয়ম মত করাইতে লাগিলেন। বাবা তাহাতেই খুব উপকার পাইতে লাগিলেন। মা তাঁহাকে ২৪ঘণ্টা কি ততোঽধিক সময়ও বসিতে বলিয়াছিলেন, বাবাও তাহাই মার কৃপায় করিয়াছেন। মা বলিয়াছিলেন, "এইভাবে আর কাহাকেও কাজ করান হয় নাই, তোমাকেই করান হইতেছে। যে যে-ভাবে কাজ করিবার অধিকারী তাহাকে সেই কাজের কথাই বলা হয়। সকলে ত এক ভাবের নয়।" মার নির্দ্দেশ-মত কাজ করিতে করিতে বাবা অনেক সময়ই বসিয়া থাকিতে পারিতেন, কোনই কষ্ট হইত না। পূর্ব্বে ঠাণ্ডা জল পায়ে দিলেও (গরমের দিনেও) অসুখ হইত, পেটেও কিছু সহ্য হইত না। পুকুরে স্নান করিলে যুবক-বয়স হইতেই অসুস্থ হইয়া পড়িতেন বলিয়া স্নান বন্ধ ছিল। এখন এই বৃদ্ধ বয়সে পুকুরে স্নান করিতেন, মার প্রসাদ সবই খাইতেন, হাঁটা-চলাও খুব করিতে পারিতেন, মার কৃপায় সকলি সহ্য হইতে লাগিল। মাকে সকলেই নিজ নিজ বাসায় নিয়া যাইতে লাগিলেন। ধানকোড়ার জমিদার ৺দীনেশ বাবুর স্ত্রী মাকে অনেক সময় তাঁহার বাসায় নিয়া যাইতেন ও কীর্ত্তনের ব্যবস্থা করিতেন। অন্যান্য অনেক বাসায়ই মা যাইতেন।

ভক্তেরা সকলেই তখন সেই বাসাতেই মিলিতেন। উয়ারীর নলিনী বাবুর স্ত্রী ও তাঁহার ভ্রাতৃবধূ (বেবীদিদি ও সুনীতিদিদি) মধ্যে মধ্যে আসিতেন।

একদিন মা ধানকোড়ার বাড়ীতে যাইতেছেন। মোটরে রাস্তায় বাহির হওয়া মাত্রই ঘোড়ার গাড়ী করিয়া এক ভদ্রলোক মার সহিত দেখা করিতে আসিলেন। তিনি যেই দেখিলেন—মা মোটরে বাহির হইয়া গেলেন অমনি ব্যস্ত হইয়া গাড়োয়ানকে বলিলেন, "শিগ্‌গির মোটরের পিছনে পিছনে গাড়ী চালাইয়া যাও।" খেয়াল নাই,—ঘোড়ার গাড়ী মোটরের পিছনে দৌড়াইয়া কি করিবে। তিনি শুধু ভাবিতেছিলেন, "মা চলিয়া গেলেন—তাঁহাকে ধরিতে হইবে।" খানিক দূর গেলেই মা যখন দেখিলেন ঘোড়ার গাড়ীখানা মোটরের পিছনে ছুটিয়া আসিতেছে, তখন বলিলেন, "মোটর একটু থামাও।" মোটর থামাইলে গাড়ী আসিয়া মোটরের নিকট পৌঁছিল। সেই ভদ্রলোকটী নামিয়া মার পায়ের ধূলা লইলেন, এবং মা ধানকোড়ার বাড়ীতে যাইতেছেন খবর পাইয়া তিনিও কিছু পরেই সেখানে গিয়া উপস্থিত হইলেন। এই কথা-প্রসঙ্গে শাহবাগে মা ভক্তদের নিকট বলিয়াছিলেন, "দেখিলে ত, এক লক্ষ্য হইয়া এইভাবে দৌড়াইতে পারিলে ঘোড়ার গাড়ীর জন্যও মোটর থামিয়া যায়। পরে ধীরে ধীরে সব খবর পাইয়া কিছু পরেই সেও গিয়া মিলিতে

এক লক্ষ্য হওয়ার মাহাত্ম্য।

পারে। আমরা মোটরে চলিয়া গেলাম, সে ঘোড়ার গাড়ীতে গিয়াও আমাদের সঙ্গেই মিলিল। এক লক্ষ্য হইয়া ছুটিতে পারিলেই হয়।”

কীর্ত্তনে বাউলবাবুর ও চিন্তাহরণ-বাবুর স্ত্রীর ভাব।

শাহবাগে কীর্ত্তনে বাউলবাবুর স্ত্রীও সর্ব্বদাই আসিতেন, কীর্ত্তনে তাঁহার বেশ ভাব হইত। দীক্ষার পরদিন কীর্ত্তনে আসিয়া চিন্তাহরণবাবুর স্ত্রীরও অস্বাভাবিক অবস্থা হইয়াছিল। সন্ধ্যার পরে কীর্ত্তনে তিনি অসাড় হইয়া পড়িলেন, মার চরণ ধরিয়া পড়িয়াই গেলেন। তাঁহাকে উঠাইতে প্রায় রাত্রি দুইটা বাজিল, সেই হইতে তাঁহার মধ্যে মধ্যে এই প্রকার ভাব হয়।

মার দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত জলত্যাগ—মাকে জল খাওয়াই-বার অলৌকিক পুরস্কার।

একবার মা তের দিন পর্য্যন্ত জল না খাইয়া রহিলেন, পরে একদিন ভোলানাথকে জল দিতে বলিলেন, তিনি জল খাওয়াইয়া দিলেন। আবার একবার তেইশ দিন জল মুখে নিতেন না। মুখ পর্য্যন্ত ধুইতেন না। তেইশ দিন পর একদিন রাত্রিতে কমলাকান্ত, অটলদাদা নন্দু ও আমি মার কাছে সারারাত বসিয়া আছি, মা মাটিতে বসিয়া আছেন, ভোলানাথ শুইয়া আছেন। রাত্রি প্রায় আড়াইটা কি তিনটার সময় মা এক ঘটী জল আনিতে বলিলেন। জল আনা হইলে ভোলানাথকে উঠাইয়া বলিলেন, “তোমরা যে পাঁচজন ঘরে আছ তাহারা আমাকে এই এক ঘটী জল কিছু

কিছু করিয়া খাওয়াইয়া দাও।” তাহাই দেওয়া হইল। এই তেইশ দিন পর জল খাইলেন। বলিলেন, “দেখিলাম জল না খাইয়া কেমন লাগে? কিন্তু দেখিতেছি জলের ব্যবহারই ভুল হইয়া যাইতেছে। যদি একবার ভুল হইয়া যায় তবে আমাকে নিয়া তোমাদের মুস্কিলই হইবে, তাই আবশ্যকতা না থাকিলেও জল খাইলাম।” জল খাইয়া বসিয়া আছেন, একটু পরেই হঠাৎ উঠিয়া গিয়া দরজা খুলিয়া বাহিরে গেলেন (তখন মা গোলঘরে থাকিতেন) ও দরজার নিকট হইতে পাঁচটী পদ্মফুল নিয়া ফিরিয়া আসিয়া হাসিয়া বলিলেন, “দেখ, কে এই পাঁচটী পদ্মফুল রাখিয়া গিয়াছে। তোমরা পাঁচজনে জল খাওয়াইয়াছ, পাঁচটি পদ্মই রাখিয়া গিয়াছে, তোমরা পাঁচজনে নেও” বলিয়া প্রত্যেকের হাতে এক একটী ফুল দিলেন। এত রাত্রিতে দরজায় কে পদ্মফুল রাখিবে? ভাবিয়া আমরা অবাক্ হইলাম। তবে মার কাছে সবই সম্ভব, তাই অনেক বিশেষ বিশেষ ঘটনাও তেমন ভাবে মনে করিয়া রাখি নাই।

কয়েকটী পুরাতন ঘটনা— মাঝে মাঝে অলৌকিক শক্তির প্রকাশ।

পূর্ব্বকথা বলিতে বলিতে একদিন বলিয়াছিলেন, “এই সিদ্ধেশ্বরীতে তিনমাস পড়িয়া থাকিতে চাহিয়াছিলাম, কিন্তু ভোলানাথ কিছুতেই দিলেন না, বাধা দিলেন। তাহার ফলে ভোলানাথের খুব অসুখ হইয়াছিল।”

জ্যোতিষদাদা ঐ ভাবে শয্যাগত আছেন, একদিন দুপুরবেলা তাঁহার বাসায় মা ও ভোলানাথ গিয়াছেন।

মা বলিলেন, "ঐ সামনের পুকুরটাতে ডুব দিয়া এস ত?" ঘটনাচক্রে তখন বাসায় সকলেই নিদ্রিত, জ্যোতিষদাদা তখনই গিয়া ডুব দিয়া আসিয়া কাপড় ছাড়িয়া বিছানায় শুইয়া পড়িলেন। তখন কেহ কেহ জাগিয়াছে। ভিজা কাপড় দেখিয়া তাহারা এই ঘটনা জানিতে পারিল। জ্যোতিষদাদা ভয় করিতেছিলেন, যদি আজ রক্ত বেশী পড়ে তবে সকলেই মন্দ বলিবে এবং সকলেই মনে করিবে স্নানের জন্যই হইয়াছে। কিন্তু এই রোগীর এই স্নানে রোগবৃদ্ধির কোন লক্ষণই প্রকাশ পাইল না; বরং সেইদিন ভালই রহিলেন। এইরূপ ছোট বড় কত ঘটনা ঘটিয়াছে। হাতে এক সময় একটা ফুল কি অন্য কোন জিনিষ নিলেন, এমনও দেখিয়াছি হয়ত পাঁচ ছয় দিন সেটা হাতের মধ্যেই আছে। পরে হয়ত কাহাকেও দিয়া দিলেন। পূর্ব্বেই বলিয়াছি—মা রাত্রিতে অনেক সময়ই ঘুরিয়া বেড়াইতেন কিংবা আপন মনে বসিয়া থাকিতেন। মোট কথা রাত্রি হইলে চট্‌পটে ভাব হইত। অনেক সময় রাত্রিতে গাড়ী করিয়া সকলের বাসায় বাসায় যাইতেন। কোন কোন দিন এমন হইত রাত্রিতে মোটেই সুস্থির থাকিতেন না। বিছানায় শুইয়া থাকিলেও নানা কথা বলিতেন, সে কথার অর্থ কেহই বুঝিত না। কখনও দেখিয়াছি রাত্রিতে শুইয়া বলিতেছেন, "ইটালীটা কোথায়? সে দেশে কোন্ জাতীয় লোকেরা থাকে?" দুই চার দিন পরই ইটালীর একটী লোক শাহবাগে মার সঙ্গে দেখা করিতে আসিল। কখনও

কখনও ইংরাজী শব্দ বাহির হইত, কখনও অপর বিদেশী ভাষা বাহির হইত, কখনও কখনও ভোলানাথকে দিয়া লিখাইয়াও রাখিতেন। রাত্রিতে শুইয়া শুইয়াও এইরূপ হইত। আবার কোন দিন শুইতেই পারিতেন না, আপন মনে সারারাত পায়চারি করিতেন। একবার নিরঞ্জনবাবুর বাসায় কীর্ত্তনশেষে ভোগ হইল, সে দিন রাত্রিতে সেই বাসাতেই ছিলেন। সারারাত হাঁটিয়াই কাটাইয়া দিলেন। অনেকের মনের কথাও অনেক সময় বলিয়া দিতেন। কেহ হয়ত একটা প্রশ্ন মনে করিয়া বসিয়া আছেন, মা অপরের সহিত কথা বলিতেছেন, কথায় কথায় ঐ প্রশ্নেরও পরিষ্কার জবাব দিয়া দিতেছেন। যিনি প্রশ্ন করিবেন বলিয়া বসিয়াছিলেন তাঁহাকে আর প্রশ্ন করিতে হইল না। এইরূপ একবার নয়, বহুবার হইয়াছে। মার দূরদৃষ্টির প্রমাণ অনেকবার পাইয়াছি। বাসায় হয়ত দুপুরে কোন কাজ করিয়াছি, বৈকালে মার কাছে আসিলেই অনেক সময় বলিতেন, "দুপুরে পড়িয়াছিলাম, দেখিতেছিলাম তুমি এই কাজ করিতেছ।" ঠিক ঠিক বলিয়া দিতেন। অনেকেই এই ভাবে দূরদৃষ্টির প্রমাণ পাইয়াছেন। তবে মা এইসব খুব কমই বলিতেন, কখনও কিছু বাহির হইয়া যাইত নতুবা বড় প্রকাশ করিতেন না। একবার শাহবাগে মাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, "মা, আমরা যখন তোমার জন্য ব্যস্ত হই তখন তুমি কি বুঝিতে পার ?" মা বলিয়াছিলেন, "কেমন করিয়া বুঝি, জান ? যখনই

তোমাদের আমার প্রতি লক্ষ্য পড়ে তখন তোমাদিগকে আমার কাছে নানা ভাবে দেখি, তখনই বুঝি তোমরা আমাকেই চিন্তা করিতেছ।" এই বলিয়া বলিলেন, "একদিন রাত্রিতে মশারির মধ্যে শুইয়া আছি, দেখি তুমি আস্তে আস্তে মশারি উঠাইয়া পায়ে হাত দিতেছ।" একদিন সিদ্ধেশ্বরীর আসনে গিয়া বসিয়াছেন, কীর্ত্তন হইবে, ঘরে অনেক লোক। একটি অপরিচিত নূতন লোক দাঁড়াইয়াছিল, সে মার দিকে চাহিয়া বলিল, "বলুন ত আমি কেন আসিয়াছি? আমি মুখে বলিব না, মনে মনে প্রশ্ন করিলাম জবাব দিন দেখি।" মা তাহার দিকে একটু চাহিয়া বলিলেন, "উত্তর দিয়াছি, বুঝিয়া নেও। তুমিও মনে মনে প্রশ্ন করিয়াছ, আমিও মনে মনেই জবাব দিয়াছি, বুঝিয়া লও।" এই বলিয়া তাহার দিকে চাহিয়া একটু হাসিলেন। সেই লোকটি আর কিছু বলিল না। পরদিন শাহবাগে গিয়া দেখি সেই লোকটী মার ঘরের এক কোণে দাঁড়াইয়া কাঁদিতেছে, মাকে প্রণাম করিবে ও ক্ষমা চাহিবে, কিন্তু মা সাংসারিক নানা কাজ করিতেছেন, ওদিকে যেন লক্ষ্যই নাই। লোকটীর মনে কি ভাব হইয়াছে জানি না, সে কাঁদিয়া আকুল হইতেছে। পরে কি হইল ঠিক মনে নাই। আর একবার কি ঘটনায় মা রাজি হইতেছেন না, ভোলানাথ পীড়াপীড়ি করিতেছেন, শেষে মা তাহা করিলেন, কিন্তু পনর দিন পর্য্যন্ত ঘরের ভিতর যাইতে পারিলেন না।

ঝড়-বৃষ্টির মধ্যে বাহিরেই থাকিতেন। এইরূপ ঘটনা আরও দেখিয়াছি; ভোলানাথের আদেশ পালনের জন্যই করিয়া যাইতেন কিন্তু শেষে হয়ত শরীরে বিপরীত ক্রিয়া হইতে থাকিত, ভোলানাথও ভয় পাইয়া যাইতেন। এজন্য তিনিও অনুরোধ করিতে ভয় পাইতেন, কি জানি আবার কি হয়। মা অনেক সময় "যাহা হইবার হইবে, উনি যখন বলিতেছেন করিয়া যাইব" এই বলিয়া করিয়া যাইতেন। মার দূরদৃষ্টির আরও একটী ঘটনা মনে পড়িল। একদিন একজন ভোগ নিয়া আসিয়াছেন। মা বাসায় ছিলেন না। মা শাহবাগে ফিরিয়া আসিলে ভোগ পাক হইল, খাওয়া-দাওয়া হইতে প্রায় সন্ধ্যা হইল। সন্ধ্যার সময় যোগেশ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় শাহবাগে গিয়া শুনিলেন—ভোগ হইয়া গিয়াছে। তিনি মাকে বলিলেন, "আমরা প্রসাদ পাইলাম না, এখন আমরা প্রসাদ পাইতে চাই।" মা বিশেষ কিছু না বলিয়া মসল্লা বাটিতে বলিলেন। এদিকে জ্যোতিষদাদার বাসায় সেদিন কে একটা বড় মাছ দিয়া গিয়াছে। তিনি চাকরকে বলিলেন, "কিছু শাহবাগে দিয়া আয়।" কতকগুলি মাছ ও অন্যান্য কি নিয়া সন্ধ্যা বেলায় চাকর শাহবাগে গিয়া উপস্থিত। মা হাসিয়া উঠিলেন। মসল্লা ত পূর্ব্বেই বাটাইয়া রাখিয়াছেন। রান্না হইল, যোগেশবাবু এবং অন্যান্য অনেকেই প্রসাদ পাইয়া আসিলেন। আবার কোন কোন দিন মা সকলকে নিয়া শাহবাগে মাঠে বসিয়া

আছেন, হঠাৎ উঠিয়া কাপড় ঠিক করিয়া বসিলেন ও বলিলেন, "রায়বাহাদুর আসিতেছে।" সত্যই কিছুক্ষণ পরই দূরে রায়বাহাদুরের মোটরের শব্দ পাওয়া যাইত। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, এই সব ঐশ্বর্য্যের প্রকাশ খুবই কম হইত।

মা অনেককে অনেক সময় বলিতেন, "চোরা-বাক্স করিতে হয়। এই সব ভাবের বিষয় প্রকাশ করিতে নাই, চোরা বাক্স কর। বাক্স ভরিয়া যদি কিছু বাহির হইয়া পড়ে তাহা হউক, সেদিকে লক্ষ্য করিতে নাই। তুমি তোমার লক্ষ্যপথে চলিতে থাক, যেটুকু প্রকাশ হইয়া পড়িবার পড়ুক, তুমি কিছু প্রকাশ করিতে যাইও না।" মা বলিতেন, "এই যে এক একটা প্রকাশ হইয়া পড়ে ইহাও এই রাস্তার একটা অবস্থা মাত্র। এই পথে চলিতে চলিতে এমন একটা স্তর আসে, যখন আপনা আপনিই এই সব প্রকাশ হইয়া যায়। কিন্তু সাধকের সেদিকে লক্ষ্য করিতে নাই, সে যদি নিজের যশের আকাঙ্ক্ষায় এই সব প্রকাশ করিতে আরম্ভ করে তবেই সেখানে সে আটকাইয়া পড়ে। আর যদি রাস্তার এই তামাসা দেখিতে সে দাঁড়াইয়া না থাকিয়া আপন লক্ষ্য ধরিয়া চলিতে থাকে তবে দেখা যায়—এই যে প্রকাশ হইতেছিল আবার এক স্তরে গিয়া এইগুলি বন্ধ হইয়া গিয়াছে।"

মার উপদেশ—অলৌকিক ভাব-বিষয়ক সংযমের আবশ্যকতা।

১৩৩৪ সনে একদিন রাত্রিতে মা গাড়ী করিয়া টিকাটুলীর

বাসায় গিয়া উপস্থিত। কিছুক্ষণ পরই আবার অন্য এক বাসায় চলিলেন। রাত্রি তখন অনেক হইয়াছে। মার অবস্থা দেখিয়া বাবার ও আমার কেমন সন্দেহ হইল, মা যেন কোথায়ও যাইবেন। এদিকে মা কয়েকটী বাসা হইয়া শাহবাগের কাছেই জ্যোতিষদাদার কাছে গিয়া বলিলেন, "রোজ রোজ কি প্রসাদ পাঠান যায়, আজই কিছু বেশী প্রসাদ করিয়া রাখ।" এই বলিয়া কিছু ফল প্রসাদ করিয়া দিয়া আরও দুই চারি কথা বলিয়া শাহবাগে চলিয়া গেলেন। তাঁহারও কেমন সন্দেহ হওয়ায় চাকরকে শাহবাগে পাঠাইয়া খবর নিলেন, মা ও ভোলানাথ বসিয়া আছেন। এদিকে রাত্রি প্রায় তখন দুইটা, বাবার মন সুস্থির হইতেছে না, তিনি টিকাটুলী হইতে ঐ রাত্রে হাঁটিয়াই শাহবাগে আসিয়া উপস্থিত। ফটকের দরজা বন্ধ ছিল। তিনি প্রাচীর টপ্‌কাইয়া ভিতরে গেলেন, কিন্তু প্রাচীরের নিকটে ময়লা ছিল। তাহাতে পা লাগিয়া গেল। সেই অবস্থায়ই তিনি মার কাছে গিয়া উপস্থিত, দেখিলেন এত রাত্রে মা ও ভোলানাথ বসিয়া কি কথাবার্ত্তা বলিতেছেন। বাবাকে এত রাত্রে দেখিয়া মা বলিলেন, "একি, এত রাত্রে আসিয়াছ?" বাবা বলিলেন, "মা, মনে কেমন সন্দেহ হইল, তাই আসিয়াছি। আমাদের ফেলিয়া কোথাও যাইবে নাকি?" মা বলিলেন, "গেলে ত জানিতেই পারিবে।" এ কথায় সন্দেহ গেল

একটী ঘটনা।

না। বাবা ময়লাতে পা দেওয়াতে অপবিত্র বোধ করিতেছেন, তাই মা তাঁহাকে বাসায় ফিরিয়া যাইতে বলিলেন। বাবাও ঘরে যাইতে পারিতেছিলেন না, স্নান করিবেন ভাবিয়া বাসায় চলিয়া আসিলেন। এই ঘটনা না হইলে হয়ত ও রাত্রি ওখানেই থাকিতেন।*

মার ঢাকা পরিত্যাগ।

এদিকে মা মনে করিয়াছেন সেই দিনই ভোরে নারায়ণগঞ্জ চলিয়া যাইবেন ও সেখান হইতে অন্যত্র যাইবেন। মা ইহাও মনে করিয়াছিলেন—যাওয়ার সময় যদি কাহারও সহিত দেখা হয় তবে যাইবেন না। জ্যোতিষদাদার বাসার দরজা দিয়াই নারায়ণগঞ্জে যাইতে হয়। প্রত্যহ অতি প্রত্যূষেই জ্যোতিষদাদা দরজা খুলিয়া দিয়া শুইয়া থাকেন, কিন্তু সেই দিন অনেক রাত্রিতে মা আসিলেন বলিয়া জাগিয়া থাকায় ভোরে ঘুমাইয়া পড়িয়াছেন। মার যাওয়ার সময় কাহারও সহিতই দেখা হইল না। বাবা প্রায় রাত্রি তিনটা কি সাড়ে তিনটায় বাসায় ফিরিয়াছেন। চারটার সময়ই মা ভোলানাথকে নিয়া বাহির হইয়া পড়িয়াছেন। ভোরেই বাবা আবার শাহবাগে আসিয়া দেখেন মা চলিয়া গিয়াছেন, কোথায় গিয়াছেন

---

* একটা কথা এখানে বলা আবশ্যক মনে হইতেছে। হরিদ্বার হইতে আসিবার পর মা বাবাকে ও আমাকে বাসায় গিয়া থাকিতে আদেশ করায় আমরা বাসায়ই থাকিতাম। তবে অনেক সময়ই শাহবাগে কাটিত।

কিছুই খবর পাইলেন না। জ্যোতিষদাদার বাসায় গিয়া কাঁদিয়া ফেলিলেন। জ্যোতিষদাদাও ব্যস্ত হইলেন, কিন্তু কি করিবেন ? এদিকে মা রাত্রিতে বাবাকে বলিয়াছিলেন, "গেলে খবর পাইবে।" এই কথা রক্ষার জন্য মা নারায়ণগঞ্জ হইতে একটী লোকের কাছে বাবাকে খবর দিতে বলিয়া দিলেন যে, তিনি ভোরের গাড়ীতে নারায়ণগঞ্জ গিয়াছেন এবং তথা হইতে অন্যত্র চলিয়া গিয়াছেন। পরে ক্রমশঃ খবর পাইলাম—মা রাজসাহী হইয়া কলিকাতা, তথা হইতে দেওঘর ও দেওঘর হইতে বিন্ধ্যাচল গিয়াছেন। বিন্ধ্যাচলে তখন আশ্রম ছিল না। মা একটা বাংলায় ছিলেন। জিতেনদাদা মার সহিত কলিকাতা হইতে দেওঘর যান ও তথা হইতে মার বিন্ধ্যাচলে যাওয়ার খবর কাশীতে দেন। খবর পাইয়া কাশী হইতে তাঁহার বাবা (শ্রীযুক্ত কুঞ্জমোহন মুখোপাধ্যায়), মা এবং সপরিবারে নির্ম্মলবাবু বিন্ধ্যাচল আসিয়া মার সঙ্গে দেখা করেন। পরে মা চুনার ও নানা স্থান ঘুরিয়া ঘুরিয়া পুনরায় ঢাকা যান।

মার জন্য আশ্রম-প্রতিষ্ঠার প্রথম উদ্যোগ।

ইতিমধ্যে জ্যোতিষদাদা, নিরঞ্জনবাবু প্রভৃতি মার জন্য একটী বড় আশ্রম করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। মা তাঁহাদিগকে বলিলেন, "আশ্রমের ত আমার কোনই দরকার নাই, গাছতলাই আমার আশ্রম। তবে যদি তোমাদের দরকার হয় করিতে পার। কিন্তু আমার একটা কথা আছে

—যদি তোমরা কিছু কর তবে এই রমনায় কালীবাড়ীর পিছনের জায়গাটা (যেখানে বর্ত্তমান আশ্রম) তোমরা নিতে চেষ্টা করিও।" পরে মা বলিয়াছেন—ঐ স্থানে পূর্ব্বে অনেক ফলাহারী, বাতাহারী সন্ন্যাসীরা থাকিতেন। তিনি রমনার কালীবাড়ীতে তাঁহাদের অশরীরী আত্মার দর্শন পাইয়াছেন। মা বলিয়াছিলেন বলিয়াই এ স্থানটা নিবার জন্য জ্যোতিষদাদা ও নিরঞ্জনবাবু অনেক কষ্ট স্বীকার করিয়াছিলেন। জ্যোতিষ-দাদা অসুখে পড়িয়াও এই স্থানটা নেওয়া হইল না বলিয়া দুঃখ করিতেন। পরে ভাল হইলে যখন কিছুতেই এ স্থানটা নিতে পারিতেছিলেন না, তখন একদিন শেষ কথার জন্য কালীবাড়ীর ঠাকুরের কাছে গিয়াছিলেন। সে সময় স্পষ্টই যেন অনুভব করিলেন মা সঙ্গে আছেন। সেই দিনই কথা ঠিক হইয়া জায়গাটা নেওয়া হইল। মা হরিদ্বার হইতে ফিরিবার পরই ১৩৩৪ সনের বৈশাখ মাসে শাহবাগে প্রথম তাঁহার জন্মোৎসব হইল। সেবার এক দিন মাত্র (১৯শে বৈশাখ) কীর্ত্তন-ভোগাদি হইয়াই শেষ হইল।

মার কৃপায় কুঞ্জ-বাবুর পঞ্চম পুত্রের সর্পাঘাত হইতে পরিত্রাণ।

পরে কুঞ্জমোহন মুখোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার কনিষ্ঠা কন্যার বিবাহ দিতে সপরিবারে আমাদের টিকা-টুলীর বাসায় আসিলেন। মা সেই বিবাহের সময় উপস্থিত ছিলেন। জামাতার নাম শ্যামাকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় (জামসেদপুর)। তিনি মার খুব ভক্ত ও পরে ভোলানাথের কাছে দীক্ষিত হন।

বিবাহের পর সকলে কিছুদিন ঢাকাতেই ছিলেন ও মার কাছে সর্ব্বদা যাতায়াত করিতেন। শ্রাবণ মাসে কুঞ্জবাবুর পঞ্চম পুত্র মনুর সর্পাঘাতে মৃত্যুর কথা কোষ্ঠীতে লেখা ছিল। সেই কথা উল্লেখ করিয়া মনুর মা মাকে বলিলেন, "মা, এই ছেলেকে তোমার কাছেই রাখিয়া যাই, তবে যদি রক্ষা পায়।" মা বলিলেন, "কোন আবশ্যক নাই, সঙ্গেই নিয়া যাও।" তাঁহারা সকলে কাশী চলিয়া গেলেন। ইহার কিছু পরেই সম্ভবতঃ শ্রাবণ মাসে, মা ভোলানাথকে নিয়া বাহির হইয়া যান। কলিকাতা হইতে খবর পাইয়া কাশী হইতে কুঞ্জমোহন মুখোপাধ্যায় মহাশয় ও নির্ম্মলবাবু সপরিবারে মার দর্শনে বিন্ধ্যাচল গেলেন। একদিন সকলে মিলিয়া অষ্টভুজা দেবীকে দর্শন করিতে গিয়াছিলেন। সেখান হইতে সীতাকুণ্ডের দিকে চলিলেন। পথে একস্থানে মা সকলকে পিছনে ফেলিয়া একটু অগ্রসর হইয়া গেলেন। একটু দূরে গিয়া পিছনে হাত দিয়া সকলকে অগ্রসর হইতে নিষেধ করিলেন। ভোলানাথ প্রভৃতি সকলেই দৌড়িয়া গিয়া দেখেন মার একটু দূরেই একটা গোখরা সাপ মার দিকে চাহিয়া স্থির হইয়া আছে। মা তাহার উপর পা দিয়াছিলেন বলায় সকলেই ব্যস্ত হইয়া কামড়াইয়াছে কি না জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। মা কিছুই বলিলেন না, আপন মনে তাড়াতাড়ি হাঁটিতে লাগিলেন। মনুর ছোট ভাই শঙ্কর—তখন তাহার বয়স ছয় বা সাত বৎসর হইবে—হঠাৎ তাহার মাকে বলিয়া উঠিল,

"মা, দাদাকে সাপে কাটিবে লেখা ছিল, তাই মা উহা নিয়া নিলেন।" শিশুর মুখে হঠাৎ এই কথা শুনিয়া সকলেই অবাক্ হইল। কোষ্ঠীর কথাও সকলেরই মনে হইল। মা যে বাংলায় থাকিতেন সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। মাও আসিয়া একটু হাসিয়া মনুকে বলিলেন, "মনু, কথা ছিল সাপে তোকে কাটিবে, আর কাটিল আমাকে।" মা ত সাধারণতঃ কিছুই খাইতেন না, সেই দিন যত খিচুড়ী পাক হইয়াছিল সব খাইয়া ফেলিলেন। এ দিকে মা বাহির হইয়া আসার কিছুদিন পরই হাওয়া পরিবর্ত্তনের জন্য জোতিষদাদাও বিন্ধ্যাচল চলিয়া আসিয়াছিলেন। তিনি নীচে বাসা ভাড়া করিয়াছিলেন। মা খাওয়া-দাওয়ার পর পাহাড়ের নীচে জ্যোতিষদাদার বাসায় বেড়াইতে চলিলেন। সেখানে জ্যোতিষদাদা সাপে কামড়াইবার খবর শুনিয়া ব্যস্ত হইয়া কোন্ পায় কামড়াইয়াছে তাহা না জানিয়াই ডান্ পায় কতকগুলি কি ঔষধ ঢালিয়া দিলেন। মা হাসিয়া বলিলেন, "কামড়াইল বাঁ পায়, আর ঔষধ ঢালা হইল ডান পায়। বেশ চিকিৎসা হইয়াছে, আর ঔষধের দরকার নাই।" একটু পরেই পাহাড়ের উপরে বাংলায় চলিয়া আসিলেন। ছেলেরা দৌড়াদৌড়ি করিতেছিল, মাও সেই সঙ্গে খেলিতে লাগিলেন। পরে এক জায়গায় বসিলে সকলেই দেখিল পায়ের নীচে তুইটা গর্ত্ত নীল হইয়া আছে। সকলেই জিজ্ঞাসা করিল, সাপে কামড়াইলে কেমন লাগিয়াছিল? মা বলিলেন, "বিশেষ কিছু নয়, শুধু ঐ পা-টা একটু ঝির্ঝির্ করিয়াছিল মাত্র।"

তারপর জ্যোতিষদাদা চুনার গেলেন। মাও তুই একদিনের জন্য চুনারে গিয়াছিলেন। সকলেই বুঝিল মার কৃপায় জ্যোতিষ-দাদার জীবন-রক্ষা হইল। জ্যোতিষদাদা চুনারের পাথর দিয়া মার পাদ-পদ্ম তৈয়ার করিয়া ঢাকার আশ্রমে একটা সমাধিস্থানের উপর স্থাপিত করিয়াছেন। তাহার উপর একটী ছোট মন্দিরও নির্ম্মাণ করা হইয়াছে। প্রত্যহ সেই পাদপদ্মের পূজা হয়। ইহার পর জ্যোতিষদাদা গিরিডি গিয়া রহিলেন।

জ্যোতিষবাবুর চুনার ও গিরিডিতে অবস্থান।

মা ঘুরিয়া ফিরিয়া ঢাকায় আসিলেন। একদিন মা শাহবাগে নাচ-ঘরটায় নগেনবাবু, নিরঞ্জনবাবু প্রভৃতির সহিত বসিয়া আছেন। অষ্টভূজা-পাহাড়ের সাপের কথা উঠিল, মার চোখে জল আসিল। সকলে কারণ জিজ্ঞাসা করায় মা বলিলেন, "সেই সাপের বিশেষ খেয়ালটা আসিতেছে, আবার তাহার সঙ্গে দেখা হইবে।" সকলেই জিজ্ঞাসা করিলেন, "এই সাপ কে ?" কিন্তু মা জবাব দিলেন না। মা অনেক সময়ই বলিতেন, "সব সময় সব কথার জবাব হয় না, আসে না, বোধ হয় তখনও প্রকাশ হওয়ার নয়, তাই প্রকাশ করিতে পারি না।"

মার ঢাকায় প্রত্যাবর্ত্তন।

কিছুদিন পর মা বিদ্যাকূট পিত্রালয়ে গেলেন। সঙ্গে ভোলানাথ ও তাঁহার ছোট ভাই যামিনীবাবু, বাবা, বীরেনদাদা,

দাদামহাশয়, দিদিমা, মাখন, মার ছোট বোন এবং আমি চলিলাম। বিত্তাকূট পৌঁছিলাম। সেখানে দাদামহাশয়দের বহু জ্ঞাতি, তাঁহারা সকলেই এবং অন্যান্য গ্রামবাসীরা মাকে দর্শন করিতে আসিলেন ও মার ছোটবেলার কথা নিয়া অনেক আনন্দ করিলেন। মাকে সকলের বাড়ী লইয়া গেলেন। আশ্চর্য্যের বিষয়, নূতন লোক সকলেই আমাকে মার সহোদরা ভগিনী বলিয়া বলাবলি করিত। ঢাকাতেও অনেকেই প্রথম প্রথম আমাকে মার ভগিনী বলিয়া মনে করিত। অনেকেই বলিত মার সহিত আমার চেহারার সাদৃশ্য আছে; জাগতিক কোন সম্বন্ধ নাই বলিলেও বিশ্বাস করিত না, ভাবিত আমি গোপন করিতেছি। অথচ মাসিমা সঙ্গেই আছেন, তাঁহাকে কেহ মার বোন বলিয়া অনুমান করিত না। ইহা নিয়া আমাদের মধ্যে আনন্দ হইত। বিত্তাকূট হইতে নাট-ঘরের শিবমন্দির দর্শনে যাওয়া হইল।

মার পিত্রালয় বিত্তাকূটে গমন।

আবার একদিন দাদামহাশয়ের মাতুলালয়—মার জন্ম-স্থান—খেওড়াগ্রাম দেখিতে চলিলাম। নৌকায় গেলাম। এখন সেই বাড়ীটা মুসলমানেরা কিনিয়া বসবাস করিতেছে। এই মুসলমানেরাও ছোটবেলায় মাকে দেখিয়াছে। মা এদের সম্বন্ধে কত কথা বলিতে লাগিলেন,—তিনি কাহাকেও কাকা, কাহাকেও দাদা, কাহাকেও মামা ডাকিতেন। ইহারাও মাকে কত আদর করিত। দিদিমাকে সকলেই জন্মস্থানটা দেখাইয়া

দিতে বলিলেন। কিন্তু বাড়ীর এত পরিবর্ত্তন হইয়া গিয়াছে যে দাদামহাশয় বা দিদিমা কেহই স্থান নির্দ্দেশ করিতে পারিলেন না। মা ঘুরিয়া ঘুরিয়া গাছপালা দেখাইতেছেন ও পুরানো কথা সব বলিতেছেন। কিছুতেই জন্মস্থান নির্দ্দেশ করা যাইতেছে না দেখিয়া মাকে বলিলাম, "মা তুমিই দেখাইয়া দাও না, এত কষ্ট করিয়া সকলে আসিলাম, জন্মস্থানটাই দেখা হইল না।" মা কিছু বলিতেছেন না। খানিক পরে মা ঘরের পিছন দিকে একটা জায়গায় গিয়া দাঁড়াইলেন, সেই জায়গাটাতে গোবর স্তূপাকার করা ছিল। মা সেই জায়গায় দাঁড়াইয়াই একটু মাটি হাতে নিয়া ভয়ানক কাঁদিতে লাগিলেন। পরে মার মুখেই জানা গেল ঐটাই জন্মস্থান। অন্যান্য চিহ্নাদি দেখিয়া দিদিমারও মনে পড়িল যে, ঐটাই জন্মস্থান। মাকে এমন চীৎকার করিয়া কাঁদিতে দেখিয়া সকলেই ব্যস্ত হইয়া পড়িল। ভোলানাথ ত বিশেষ ভয় পাইয়া গেলেন, ভাবিলেন কি জানি কি আবার করিয়া বসেন। কিছুক্ষণ পরে মা শান্ত হইলেন। চোখের জল মুছিয়া সেই জায়গায় দাঁড়াইয়াই মুসলমানদের ডাকিলেন। তাদের বলিতে লাগিলেন, "দেখ এই জায়গাটা পবিত্র ভাবে রাখিলে তোমাদের মঙ্গল হইবে। এই স্থানে আসিয়া তোমাদের বিশুদ্ধ ভাবে প্রার্থনায় ফলের আশা। এই স্থানটা অপবিত্র করিও না।" তাহারা রাজি হইল। বাবা স্থানটা ভালভাবে রাখিবার জন্য কিছু দিতে চাহিলেন, কিন্তু

খেওড়া গমন—
জন্মস্থান দর্শন।

তাহারা কিছুই নিল না, নিজেরাই স্থানটা ঠিকভাবে রাখিবে বলিল। তাহারাও এই সব দেখিয়া ভয় পাইতেছিল। মা বলিলেন, "তোমাদের কোন ভয় নাই, আমরা এখনই চলিয়া যাইতেছি।" ওখানকার মার হাতের মাটি নিয়া আসিলাম। পরে আর এক বাড়ী যাওয়া হইল। সেখানে একটু অপেক্ষা করিয়া আমরা মাকে নিয়া নৌকায় আবার বিদ্যাকূট রওনা হইলাম। এত অল্প সময়ে গ্রামের কেহই বড় খবর পায় নাই। আমরা যখন নৌকা ছাড়িয়া দিয়াছি, তখন দেখি বহু লোক ছুটিয়া আসিতেছে। কিন্তু অপেক্ষা করা হইল না। এক বাড়ীর কাছে নৌকা একটু রাখা হইল, তাহারা দৌড়িয়া আসিয়া নৌকার কাছে দাঁড়াইল। এই বাড়ীরই একটী ভদ্রলোক দিদিমাকে "মা" বলিয়া ডাকিতেন, মার পরের তিনটী ভাই যখন ছয় মাসের মধ্যে মারা যায় তখন ইনিই দিদিমাকে শান্ত করিতেন। মাকেও ইনি নিজের বোনের মতই স্নেহ করিতেন। ইঁহার নাম ছিল শ্রীশচন্দ্র, ইনি ডিব্রুগড়ে কাজ করিতেন। মা অনেক সময় দুর্গাপূজায় ইঁহাদের বাড়ীতে থাকিতেন। মা ইঁহার চরিত্রের খুব প্রশংসা করিলেন। শ্রীশবাবুও আসিয়া নৌকার কাছে দাঁড়াইলেন। মার ছোটবেলার সখী নির্ম্মলা দেবীও*

* মার নাম নির্ম্মলা সুন্দরী, এই মেয়েটির নামও নির্ম্মলা ছিল। ইনি মার শৈশবের সহচরী ছিলেন। মার "আনন্দময়ী" নাম জ্যোতিষবাবু রাখিয়াছেন।

আসিয়া দাঁড়াইলেন। ইঁহারা মাকে নামাইয়া নিতে চাহিলেন, কিন্তু মা রাজি হইলেন না। অল্প সময় অপেক্ষা করিয়াই আমরা বিদ্যাকূট রওনা হইলাম। দুই তিন ঘণ্টার মধ্যেই বিদ্যাকূট পোঁছিলাম। বাড়ীতে মার এক জ্যেষ্ঠতাত-ভ্রাতৃ-বধূ আছেন।

কয়েকদিন বিদ্যাকূট থাকিয়া আমরা ঢাকা রওনা হইলাম। রওনা হইবার সময় মা তাঁহার এক জ্ঞাতি জ্যেষ্ঠতাতকে ধরিয়া খুব কাঁদিতে লাগিলেন। আমরাও দেখিয়া অবাক্—কোন অঙ্গেরই ত্রুটী নাই, পিত্রালয় হইতে যাইতে কান্নার অভিনয়ও ঠিক ঠিক করিতেছেন। অথচ কাঁদিবার কিছুই নাই—বাপ, মা, ভাই, বোন সব সঙ্গে। ভোলানাথদের বাড়ীতেও আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে বড়ই ছত্রভঙ্গ হইয়া গিয়াছিল। তিন ভাইয়ের মধ্যে কাহারও সহিত বোনদের বহু বৎসর যাবৎ দেখা হয় নাই। ছোট ভাই প্রথম কালীপ্রসন্ন কুশারী মহাশয়ের কাছে থাকিতেন, তারপর মুক্তাগাছার জমিদারদের কাছেই থাকিতেন। এক ভাই বহুকাল নিরুদ্দেশ। বড় ভাই রেবতীবাবু বাঁচিয়া থাকিতে একটু শৃঙ্খলা ছিল, তিনি মারা যাওয়ার পর সবই ছত্রভঙ্গ হইয়া যায়। সকলের ছোট বোনকে ত মা দেখেনই নাই। উনিশ বৎসর পর মা তাহাকে শাহবাগে আনাইলেন—সেই প্রথম দেখা। পিসিমা (কালীপ্রসন্ন কুশারী মহাশয়ের স্ত্রী) বলিতেন, "আমাদের এই সংসার ত

বিদ্যাকূট হইতে ঢাকা রওনা

একেবারেই ছত্রভঙ্গ ছিল, কাহারও সহিত কাহারও বহুকাল দেখা ছিল না, বধূঠাকুরাণীই (মা) সব মিলাইতেছেন।” বোনেরা ও ভাইয়েরা ঢাকাতেই মার উপলক্ষ্যে সব মিলিয়াছিলেন। আজ মা মেয়ে সাজিয়া পিত্রালয় হইতে আসিবার সময় কাঁদিতেছেন। অথচ মা বলিয়াছিলেন—এই জ্যেষ্ঠতাতের সহিত নাকি কথা বলিতেও সাহস পান নাই। জ্যেষ্ঠতাতও পিঠে হাত বুলাইয়া মাকে শান্ত করিতেছেন। ফলে এই হইল—মার কান্না দেখিয়া পাড়া-প্রতিবেশী আত্মীয়-স্বজন যাঁহারা উপস্থিত ছিলেন, সকলেই কাঁদিতে লাগিলেন। মা নৌকায় উঠিলেন। চোখের জল মুছিয়া ফেলিতেছেন। আবার হাসিতেছেন, আমরা মার এই কাণ্ড দেখিয়া নৌকায় আসিয়া খুব হাসিলাম। বীরেনদাদা বলিলেন, “সকলকে না কাঁদাইয়া আসিবেন না। তাই নিজে কাঁদিয়া সকলকে কাঁদাইয়া আসিলেন।”

নৌকাপথে সর্পরূপী মহাপুরুষের দর্শন।

নৌকায় আসিতেছি, নবীনগড়ে আসিয়া ষ্টীমার ধরিতে হইবে—নবীনগড় পর্য্যন্ত নৌকায় আসিতে হয়। মা নৌকায় এক কিনারায় আসিয়া বসিয়াছেন। একধারে বীরেনদাদা ও একধারে আমি বসিয়া আছি। নদীর মধ্যে নৌকা দ্রুতভাবেই চলিতেছে, হঠাৎ দেখিলাম—বহুদূর হইতে একটা সাপ দ্রুতগতিতে নৌকার দিকে আসিতেছে। মার দিকে চাহিয়া দেখি, মাও এক দৃষ্টিতে সাপের দিকে চাহিয়া আছেন, সাপও মার বরাবরই

আসিতেছে। মা অনেকক্ষণ হইতেই স্থির ভাবে বসিয়া ছিলেন, বোধ হয় অনেকক্ষণ হইতেই মা সাপটিকে দেখিতেছিলেন, কিন্তু আমরা সাপটাকে কিছু নিকটে আসিবার পর দেখিতে পাইলাম। আশ্চর্যের বিষয় নৌকা এত দ্রুত চলিতেছে কিন্তু সাপটী এদিক ওদিক না গিয়া একেবারে মা যেখানে বসিয়া আছেন সে দিকেই, আসিতেছে। মা নৌকার কিনারায় বসিয়াছিলেন। অল্প সময়ের মধ্যেই সেইদিক দিয়াই সাপ নৌকায় উঠিতে লাগিল। মা চুপ করিয়া বসিয়া আছেন, সাপও প্রায় গায়ে লাগিবে, এমন সময় আমরা দেখিয়া লাফাইয়া উঠিলাম, মাঝিও তখনই সাপকে উঠিতে দেখিয়া হাতের বৈঠা দিয়া সাপকে লক্ষ্য করিয়া মারিল। কিন্তু সাপ নৌকার নীচে চলিয়া গেল ; জল উছলাইয়া উঠিয়া মার শরীর ভিজিয়া গেল। মা স্নান করিয়া উঠিলেন, কিন্তু তবু একেবারে চুপ। আমরা মাকে কাপড় ছাড়িতে বলিলাম, কিন্তু মা কাপড় ছাড়িলেন না, ঐ ভিজা কাপড় গায়েই শুখাইলেন। তখন আমাদের মনে হইল—মা বলিয়াছিলেন, "অষ্টভুজার সাপের কথা মনে পড়িয়া চোখে জল আসিয়াছে। আবার তাহার সহিত দেখা হইবে।" বীরেনদাদা অনেক করিয়া মাকে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন, "মা, এই সর্পরূপে কে আসিয়াছিলেন ?" মা কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন। পরে বলিতে লাগিলেন, "আমি কয়েক হাত উপরেই শূন্যের মধ্যে দুইটি মহাপুরুষ বসিয়া আছেন দেখিলাম। একটী গুরু, অপরটী শিষ্য। শিষ্যটী দাঁড়াইয়া আছে।" আর কিছু বলি-

লেন না। সকলে অনুমান করিলেন 'হয়ত সাপ কে'? এই প্রশ্নের এই জবাব হইল। হয়ত কোন মহাপুরুষ সাপরূপে মার কাছে আসিয়াছিলেন। আবার এক সময়ে মা বলিয়াছিলেন, "আবার দেখা হইবে।" আমরা ঢাকায় ফিরিয়া গেলাম।

অনেকদিন পর মা একবার নিরঞ্জনবাবুর বাসায় কীর্ত্তনে গিয়াছেন। দোতলায় গিয়া এক ঘরে মাটীর উপর পড়িয়া আছেন। হঠাৎ মার বোধ হইল—পায়ের কাছে সাপ। কিন্তু তখন কিছু বলিলেন না। পরে নীচে যখন কীর্ত্তনে যাইতেছিলেন, তখন সিঁড়িতে নামিতেই সাপের গায়ে পা দিলেন, পিছনে ভোলানাথ ছিলেন, তাঁহাকে মা ঠেলিয়া সরাইয়া দিলেন। সাপকে মারিতে সকলে দৌড়াইয়া আসিল। কিন্তু মা বলিলেন, "পারিলে মার।" সিঁড়ির পর বড় বারান্দা, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন জায়গা, সমস্ত্ বাড়ী আলোময়। কিন্তু সিঁড়ি হইতে সাপ কোথায় গেল কেহ দেখিতে পাইল না। মা কীর্ত্তনে গিয়া বসিলেন। এই ভাবে অনেক সময় মা যেই বলিতেন "সাপ, সাপ খেয়াল হইতেছে" অমনিই দেখা যাইত তুই চারি দিনের মধ্যেই মা সাপ দেখিতেন। সাপের সঙ্গে মার কি সম্বন্ধ তা মা-ই জানেন। রমনার যে জায়গাটা মা নিতে বলিতেছিলেন (বর্ত্তমান আশ্রমের স্থান), সেখানেও খুব বড় বড় সাপ

নিরঞ্জনবাবুর বাড়ীতে মার সর্প-দর্শন।

আছে। একবার একটা সাদা খুব বড় সাপ দেখা গিয়াছিল। একবার শুনিয়াছিলাম—প্রতুলকে দিয়া যখন দুধ-কলা দেওয়াইতেন তখন একবার একটা গর্ত্তের মুখে মা পা দিয়া দাঁড়াইয়া প্রতুলকে বলিয়াছিলেন, "এখন তুমি আসিয়া দুধ-কলা দিয়া যাও, কোন ভয় নাই।" ঢাকা বক্‌সী বাজারের সত্যবাবু ও তাঁহার স্ত্রীও অনেকদিন হইতেই মার কাছে আসিতেছেন। তিনিও কিছুদিন দুধ-কলা দিতেন।

কলিকাতা আসা-যাওয়ার সময় প্রতিবারই এখন প্যারী-বানুর ওখানে মাকে নেওয়া হয় ও কীর্ত্তনাদি হয়। প্যারীবানুর একমাত্র মেয়ে ও একটীমাত্র ছেলে—তাহাদের বিবাহ উপলক্ষ্যে মাকে ১৩৩৪ সনে কলিকাতা নেওয়াইলেন। বাবা, আমি ও মা ভোলানাথের সঙ্গে গেলাম। বিবাহের সময় মাকে উপস্থিত রাখিলেন। পাত্র-পাত্রী মাকে প্রণাম করিয়া বিবাহের আসনে গেল। একরাত্রেই দুই বাড়ীতে দুই বিবাহ হইল। মাকে দুই বাড়ীতেই বিবাহের স্থানে বসাইয়া রাখিলেন! যদিও বাহিরের দিক দিয়া দেখিলে প্যারীবানুর বাগানে ভোলানাথ একজন কর্ম্মচারী মাত্র, কিন্তু তাঁহারা এখন ইহাদিগকে সেই চক্ষে মোটেই দেখিতেন না, খুবই শ্রদ্ধা করিতেন। বিবাহের পরও মাকে কয়েকদিন কলিকাতা রাখিলেন। মাকে প্রত্যহ তাঁহাদের বাড়ীতে নেওয়াইতেন। প্যারীবানুদের পারিবারিক একটা ঝগড়া ছিল। একদিন তিনি

প্যারীবানুর পুত্র কন্যার বিবাহে—মার কলিকাতা গমন।

মাকে বলিলেন, "আমার শাশুড়ী কখনও এখানে আসেন নাই, এবার আপনার কৃপাতেই তিনি আসিয়াছেন। আমাদের মধ্যে একটা ভয়ানক গোলমাল চলিতেছে। আমাদের বিশ্বাস আপনি উপস্থিত থাকিলে সব মঙ্গল হইবে। তাই কাল আপনাকে কাছে রাখিয়া আমরা পারিবারিক অশান্তির মীমাংসা করিব।" তাই হইল,—মাকে কাছে বসাইয়া তাঁহারা সকলে একত্রে বসিলেন এবং আশ্চর্য্যের বিষয় তাঁহাদের এতকালের বিবাদ মিটিয়া গেল। আমিও সঙ্গে ছিলাম। তাঁহারা মাকে বলিলেন, "আপনার কৃপাতেই এই মীমাংসা হইল। আপনি আমাদের বাগান ছাড়িয়া কোথাও যাইতে পারিবেন না।" শাশুড়ী ঢাকায় থাকেন, তাই ইঁহারা ঢাকা যাইতেন না। এখন স্থির হইল সকলেই ঢাকা যাইবেন। মাকেও সেখানে যাইয়া তাঁহার সঙ্গে দেখা করিতে বলিলেন। মুসলমানের বাগানে কালীপূজা এ বড় সামান্য কথা নহে! শুধু মার প্রতি প্যারীবানুর শ্রদ্ধার ভাব ছিল বলিয়াই সম্ভবপর হইয়াছিল। অবশ্য মধ্যে রায়-বাহাদুর যোগেশবাবুও ছিলেন। মার সহিত আমরা ঢাকা ফিরিয়া আসিলাম।

প্যারীবানুর পুত্র-কন্যার বিবাহ উপলক্ষে ৺চিত্তরঞ্জন দাস মহাশয়ের বড় মেয়ে অপর্ণা দেবী নিমন্ত্রিত হইয়া আসেন। মায়ের পরিধানে লাল পাড় শাড়ী ও কপালে বড় সিন্দুরের ফোঁটা দেখিয়া তাহার মায়ের (বাসন্তী দেবীর) বহুদিন পূর্ব্বে দৃষ্ট একটী স্বপ্নের ঘটনা মনে পড়ে। বাসন্তী দেবী বিধবা হওয়ার

পূর্ব্বে একদিন স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন যে, একটী স্ত্রীলোক—যাহার পরিধানে লাল পাড় শাড়ী ও কপালে বড় সিন্দুরের ফোঁটা ছিল তিনি—তাঁহাকে বলিতেছেন, "তুমি সাবধান হও, তোমার ভয়ানক বিপদ আসিতেছে।" অপর্ণা দেবীর এই স্বপ্নের বিষয় মনে পড়াতে তিনি বাসন্তী দেবীকে মায়ের সংবাদ পাঠাইলেন। একদিন প্যারীবানুর বাড়ীর কীর্ত্তনে বাসন্তী দেবী মাকে দেখিতে আসিলেন। তিনি অনেকক্ষণ মায়ের দিকে চাহিয়া রহিলেন। সকলে জিজ্ঞাসা করাতে তিনি বলিলেন, "অনেকদিনের কথা, আমার ঠিক মনে নাই; তবে এই মূর্ত্তিই যেন আমি স্বপ্নে দেখিয়াছিলাম।"* তারপর অপর্ণা দেবীকে আদেশ করিয়া মাকে কীর্ত্তন শুনাইলেন এবং নিজে মাকে কোলে করিলেন। উক্ত দাস মহাশয়ের ভগিনী উর্ম্মিলা দেবী সহ বাসন্তী দেবী আরও অনেকবার মার কাছে আসিয়াছেন এবং নিজের বাড়ীতেও মাকে লইয়া গিয়াছেন। তিনজনেই মাকে অশেষ শ্রদ্ধা করেন। অপর্ণা দেবীও মাকে তাঁহার বাড়ী লইয়া গিয়াছেন।

কিছুদিন পর (১৩৩৪ সনেই) প্যারীবানু ছেলে-বউ ও মেয়ে-জামাতা সহ ঢাকায় শাশুড়ীর কাছে আসিলেন। একদিন

---

* ৺চিত্তরঞ্জন দাস মহাশয়ের মৃত্যুর কিছুদিন পূর্ব্বে ছবিতে দাস মহাশয়ের সহিত তাঁহার স্ত্রীকে দেখিয়া মা বলিয়াছিলেন, "এই মেয়েটীর সমূহ বিপদ আসিতেছে। ইনি শীঘ্রই বিধবা হইবেন।" তখন পর্য্যন্তও ইঁহাদের পরিচয় জানিতেন না।

তাঁহারা মার হাতের রান্না খাইবেন বলায় তাঁহাদিগকে খাইতে বলা হইল। মা নিজহাতে অনেক রান্না করিলেন। আমি ও মটরী পিসিমা সঙ্গে ছিলাম। তাঁহারা আনন্দ করিয়া গাছতলায় বসিয়া পাতা পাতিয়া খাইলেন। আমি পরিবেষণ করিলাম। মা নিকটে বসিয়া রহিলেন। ছেলে-মেয়েরা কত পদ রান্না হইয়াছে তাহা গুণিতে লাগিল। তাহারা হাসিয়া বলিল, "আমাদের নানীর বাড়ীতেও এত রকমের রান্না খাই নাই, এখানে অনেক বেশী হইয়াছে।" সকলে মহা আনন্দ করিয়া খাওয়া-দাওয়া করিলেন। বলিয়াছি মা যখন যাহা করেন তাহাই যেন পূর্ণ। নবাবের বাড়ীর সকলকে খাওয়াইতেছেন, সে কাজেও ক্রটী নাই। নবাবজাদী প্যারীবানু নিজের হাতে কালীপ্রতিমার গলায় সোণার মালা পরাইয়া দিলেন। কিছুদিন পর তাঁহারা সব কলিকাতায় চলিয়া গেলেন।

প্যারীবানুর ঢাকায় আগমন।

মার গৌহাটি যাওয়ার কথা হইল। এদিকে কুম্ভমেলায় যাওয়ার সময় পিরোজপুরের মুন্সেফ্ দীনেশচন্দ্র রায় মহাশয়ের সহিত কলিকাতায় মার দেখা হয়। তাঁহারা সপরিবারেই তখন কলিকাতায় ছিলেন। অল্পদিন পূর্ব্বে তাঁহাদের একটী উপযুক্ত পুত্র মারা যায়। সেই ছেলেটী নন্দুর সঙ্গে প্রেসিডেন্সী কলেজে বি, এ, পড়িত। নন্দুই দীনেশবাবু ও তাঁহার স্ত্রীকে মার সহিত দেখা করিবার জন্য নিয়া আসিয়াছিল। মাকে দেখিয়া তাঁহারা খুবই

কামাখ্যা-যাত্রা (১৩৩৪)

সান্ত্বনা পাইয়াছিলেন। ইহার পর এক ছুটিতে তাঁহারা মার সঙ্গ-লাভের জন্য ঢাকায় আসিয়া বাসা ভাড়া করিয়া ছিলেন। এখন তাঁহারা মাকে একবার পিরোজপুরে নেওয়ার জন্য পীড়াপীড়ি করিতে লাগিলেন। গিরিজাশঙ্কর কর মহাশয়ের বাড়ী বরিশালের বাইসারী গ্রামে—তিনিও একবার মাকে নিজ বাড়ীতে নিতে চাহিতেছেন। মা আমাদের সকলকে নিয়া ১৩৩৪ সনেই গৌহাটী কামাখ্যা দর্শনে চলিলেন। কথা হইল—গৌহাটী হইতে ঢাকায় না আসিয়া লামডিং দিয়া পিরোজপুর যাইবেন ও বাইসারী হইয়া ফিরিবেন। আমি, বাবা ও মা ভোলানাথের সঙ্গে চলিলাম। বীরেন দাদাও গেলেন। কামাখ্যা-পাহাড়ে উঠিবার সময় প্রথম প্রথম মা খুব তাড়াতাড়ি উঠিলেন, খানিক দূর গিয়াই শ্বাসের গতি অন্য রকম হইয়া যাওয়াতে আর উঠিতে পারিলেন না। আমরা ধরাধরি করিয়া কোন প্রকারে উঠাইয়া নিলাম। উপরে যাইয়া দেখি—কাশী হইতে কুঞ্জমোহন মুখোপাধ্যায় মহাশয় আসিয়াছেন। নির্ম্মলবাবু আসেন নাই, কিন্তু তাঁহার স্ত্রী আসিয়াছেন। ছুই চারিদিনের মধ্যেই কলিকাতা হইতে দাদামহাশয় (দাদামহাশয় কলিকাতায় সুরেন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের বাসায় কিছুদিন যাবৎ ছিলেন), সুরেন্দ্রবাবু, চণ্ডীবাবু, চারুবাবু (রায়বাহাতুরের ছোট ছেলে) প্রভৃতি অনেকেই গিয়া উপস্থিত হইলেন। খুব আনন্দ চলিল। 'কামাখ্যা-দেবীর দর্শন হইল। একদিন রাত্রিতে মা বাহিরে

গিয়াছেন, দেখিলেন—সমস্ত পাহাড়টা যেন এক পবিত্র সত্তায় পরিপূর্ণ। এই পবিত্র ভাবের প্রভাব চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িতেছে। মুকুটধারী কত রাম, কৃষ্ণ এবং অপরাপর দেব-দেবীরা ছুটাছুটী করিয়া খেলিতেছেন—সবারই বাল্যাবস্থা। আরও বহু মুনি-ঋষিদের দেখিলেন, যাঁহাদের লম্বা লম্বা চুল-দাড়ি ছিল অথচ কেহই বাল্যাবস্থা অতিক্রম করেন নাই। তাঁহারা সকলেই মাকে লইয়া আনন্দ করিলেন। এত মূর্ত্তি ছিল যে, পাহাড়টী যেন আর দেখা যাইতেছিল না। মা দ্রুত ঘরে চলিয়া আসিলেন। তখন কিছু বলিলেন না, পরে বলিয়াছেন। আমি বলিলাম, "রামায়ণ মহাভারতে বালখিল্য ঋষিদের বর্ণনা পাওয়া যায়, তাঁহারা সবাই বালক অথচ মহাতপস্বী ছিলেন।" মা বলিলেন, "তাই নাকি, আমি ত এ কথা আর শুনি নাই, সবাই কিন্তু ঐ রকমই। দেখ, স্থানটীর কি প্রভাব তখন ছিল। নির্ম্মলবাবুর স্ত্রী আমার সাথেই ছিল, সে কিছু দেখে নাই, কিন্তু তাহার সমস্ত শরীর ভয়ে রোমাঞ্চ হইয়াছিল। ভয়ের কারণ বলিতে পারিল না।" পূজার সময়ও নাকি অনেক বালক-বালিকা মায়ের কাছে আসিয়াছিল। কামাখ্যা-পাহাড়ে একদিন রাত্রিতে মা ও ভোলানাথ শুইয়া আছেন, আমরা সকলেই বসিয়া আছি; মা পূর্ব্বকথা, অষ্টগ্রামের কথা, বাজিতপুরের কথা, কি ভাবে গৃহস্থালী করিতেন সেই সব কথাও বলিতেছেন, বাবা এক ঘরে সারারাত বসিয়া নিজের কাজ করিতেছিলেন। এই

ঘরে মার সঙ্গে কথায় কথায় ভোর হইয়া গেল। কুঞ্জমোহন মুখোপাধ্যায় মহাশয় হঠাৎ বলিলেন, "আজ মনে করিয়াছিলাম মার কাছে নিজের কাজের কথা বলিব, কিছুই হইল না, বাজে কথায় কাটিয়া গেল।" মা অমনি বলিয়া উঠিলেন, "তোমরা ত কত কথা বল, তা বুঝি বাজে হয় না, আমার গৃহস্থালীর কথাই বুঝি বাজে হইল।" সকলেই বুঝিল, মা শিক্ষা দিবার জন্যই এ কথা বলিলেন। মার প্রত্যেক কথাই যে আমাদের মন্ত্রের মত শ্রদ্ধার জিনিষ তাহা আমরা ভুলিয়া যাই বলিয়াই মা হাসি-ঠাট্টায় সে কথা স্মরণ করাইয়া দিলেন। যে কথা শুনিলে মন পবিত্র হয় তাহা কি বাজে কথা হইতে পারে? বিশেষতঃ মার জীবনের পূর্ব্বঘটনা—তাহা যে অতি পবিত্র কথা। কাজের কথা ও বাজে কথা কাহাকে বলে তাহাও আমরা বুঝি না। কুঞ্জমোহন মুখোপাধ্যায় মহাশয় এ কথার অর্থ বুঝিয়া খুব লজ্জিত হইলেন ও আপনার ভুল বুঝিলেন। কামাখ্যা-পাহাড়ে একদিন ভোলানাথ মার পূজা করিবেন, সব যোগাড় করা হইল। মা বসিয়া আছেন, ভোলানাথ পূজা করিতেছেন—মা একেবারে সমাধিস্থ হইয়া পড়িলেন। বহুক্ষণ ঐ ভাবেই বসিয়া আছেন। কপালে সিন্দুরের ফোঁটার কাছে খানিকটা স্থান খুব সাদা দেখা যাইতেছিল, উপস্থিত সকলেই দেখিলাম। তখনও কলিকাতার দল আসিয়া পৌঁছে নাই। যে ঘরে পূজা হইল তাহার পরে মস্ত বারান্দা, বারান্দা খুব উঁচু। বারান্দার

নীচে কিছু দূরে বলি হইল। ভোলানাথই বলি দিলেন। বাবা ঘটনাচক্রে পাঁঠাটীকে বলির পরে এমনভাবে ধরিয়াছিলেন যে, তিনি রক্তে স্নান করিয়া উঠিলেন। সমাধি-ভঙ্গের পর মা বলিয়াছেন, "বলির রক্তের ফোঁটা আমার গায়ে লাগিয়াছে, আমি স্পষ্টই বুঝিয়াছি।" এ কথায় সকলেই আশ্চর্য্য হইল, কারণ এত দূর হইতে সাধারণভাবে রক্ত আসিতেই পারে না। ভোগ হইয়া গেল। পূজার পরে কলিকাতার দল আসিয়া পৌঁছিল। কয়েকদিন মা পাহাড়ে পাহাড়ে খুব আনন্দে বেড়াইলেন।

পিরোজপুরে মা।

পরে মা পিরোজপুরের দিকে রওনা হইলেন। মার যাইতে দেরী হওয়ায় দীনেশবাবু টেলিগ্রাম করিয়া জানাইলেন,—তিনি থাকিতে পারিলেন না, বদলী হইয়া চলিয়া যাইতেছেন, কিন্তু পিরোজপুরের সকলকে যেন মা দর্শন দিয়া যান। ঢাকার গিরিজাবাবু, সুবোধ, সীতানাথ, সকলে পিরোজপুরে গিয়া মার জন্য অপেক্ষা করিতেছেন। আমরা পিরোজপুরে পৌঁছিলাম (১৩৩৫)। ষ্টীমার হইতে নামিয়া খানিকটা নৌকায় যাইতে হয়। নৌকা ঘাটে পৌঁছিতে না পৌঁছিতেই কীর্ত্তনের অতি মধুর ধ্বনি শোনা যাইতে লাগিল, মার ভাবাবস্থা হইয়া পড়িল। নৌকা ঘাটে লাগিতেই বহুলোক কীর্ত্তন করিতে করিতে ঘাটে আসিতেছেন দেখা যাইতে লাগিল। মালা-চন্দন লইয়া সকলে আসিতেছেন, মাকে ধরিয়া উঠান হইল ও কোমরে কাপড় জড়াইয়া দেওয়া হইল। সকলে মালা-

চন্দনে মাকে সাজাইলেন। সকলকেই মালা-চন্দন পরাইতে-ছেন। মার ঐ ভাবাবস্থায় চোখ অর্দ্ধনিমীলিত, শরীর যেন ছাড়িয়া দিয়াছেন। চুল খোলা, শরীরে ও কোমরে কাপড় জড়ানো, একটি সেমিজ গায়ে—তিনি ঢুলিয়া ঢুলিয়া কীর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন। মায়ের ঐ রূপ দেখিয়া সকলে যেন মাতিয়া উঠিল। সকলেই ঐ মূর্ত্তি দেখিতেছেন আর আনন্দে বিভোর হইয়া কীর্ত্তন করিতেছেন। যেখানে মার থাকিবার স্থান করা হইয়াছিল, সেখানে যাওয়া হইল। মা গিয়াই বসিয়া পড়িলেন। সকলে ঘুরিয়া ঘুরিয়া কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন, দীনেশবাবুর মুখে সকলেই মার কথা শুনিয়াছিলেন। কিছুক্ষণ পরে ভোগ হইল। মা কিছুতেই খাইতে পারিলেন না, ভাবাবস্থায়ই আছেন। কীর্ত্তনও বন্ধ হইতেছে না। মা দুই দিন ছিলেন, কীর্ত্তন প্রায় সব সময়ই চলিয়াছে। শুনিলাম পিরোজপুরের সকলেই মার কাছে আসিয়াছেন, শুধু এক বৃদ্ধা চলিতে পারেন না তিনিই বাকী আছেন। মাকে নিয়া সকলে তাঁহাকে দেখাইয়া আনিল।

গিরিজাবাবু মাকে পিরোজপুর হইতে নিজ বাড়ীতে নিয়া গেলেন; সেখানেও মার খুব ভাবাবস্থা, কীর্ত্তনও খুব চলিল।

বাইসারিতে।

সারাদিন পর রাত্রিতে কীর্ত্তন একটু বন্ধ হইলে ভোগ হইল। বহু লোক প্রসাদ পাইলেন। গিরিজাবাবুর বৃদ্ধা মা, স্ত্রী ও ছেলে-মেয়েরা সব

বাড়ীতেই ছিলেন। মার যাইতে দেরী দেখিয়া গিরিজাবাবু প্রভৃতি মার আসা সম্বন্ধে নিরাশ হইতেছিলেন। একদিন তাঁহার মা ভোরে উঠিয়া বলিলেন, "আমি স্বপ্নে দেখিয়াছি, কালী ও মনসামাতা আসিতেছেন, তোরা পিরোজপুরে যা, নিশ্চয়ই মা আসিতেছেন।" তাঁহারা পিরোজপুর যাওয়ার পরই মা আসিয়া পৌঁছিলেন। তিন-দিন গিরিজাবাবুর বাড়ীতে থাকিলেন। মার যে স্থানে ভাব হইয়াছিল, গিরিজাবাবু সেখানে মার একটী আশ্রম করিয়াছেন। সেখান হইতে বীরেনবাবু (ডাক্তার) তাঁহার বাড়ীতে মাকে লইয়া গেলেন। সেখানেও কীর্ত্তনাদি খুব হইল, বহু লোক প্রসাদ পাইলেন। গিরিজাবাবুর বাড়ীতেই বীরেন মহারাজ আসিয়া মার সঙ্গ লইলেন।

সোহাগদল গ্রাম।

বীরেন ডাক্তারের বাড়ী হইতে সোহাগদল গ্রামে যাওয়া হইল। গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে মা কতকটা নৌকায় এবং কতকটা হাঁটিয়া গেলেন। সঙ্গে সঙ্গে বহু লোক কীর্ত্তন করিতে করিতে যাইতেছিল। কেহই মাকে ছাড়িয়া দিতে চায় না। শিশু, বৃদ্ধ সকলে মিলিয়া কীর্ত্তন করিতেছে, মনে করিতেছে—সর্ব্বদা কীর্ত্তন করিলে মা, আর যাইতে পারিবেন না। মা একদিন বাবাকে বলিলেন, "আজ যাইব, যাওয়ার বন্দোবস্ত কর।" বাবা নৌকা ঠিক করিলেন, দুপুরেই মা সকলকে নিয়া বাহির হইয়া পড়িলেন। মা নৌকায় আসিয়াও সমাধিস্থ হইয়া পড়িয়া রহিলেন।

এখান হইতে আমরা কলিকাতা সালকিয়াতে পিসিমার

বাসায় যাই, সেখান হইতে মার সঙ্গে রাজসাহী গেলাম, পরে আবার কলিকাতা হইয়া ঢাকাতে যাওয়া হইল। আমরা মাকে লইয়া ঢাকা পৌঁছিলাম। এই সব গ্রামে গ্রামে মা অনেকের বাড়ীতেই গিয়াছেন। সকলেই বাড়ী পবিত্র করিতে মাকে নিজেদের বাড়ীতে লইয়া গিয়াছে। অনেক বাড়ীতেই একটী করিয়া লক্ষ্মীর কিম্বা রাধা-কৃষ্ণের আসন থাকে, সেখানে যাইয়া মা সেই আসনের বাতাসা বা পান চাহিয়া খাইয়াছেন। মার প্রতি অনেকেরই দেবীবুদ্ধি ছিল; তাই আসনের পান-বাতাসা মাকে দিতে তাঁহারা কোন দ্বিধা বোধ করেন নাই। এই ভাবে নানা খেলা করিয়া মা ঢাকায় পৌঁছিলেন। দেওঘর হইতে বাহির হইবার পর হইতেই মা আর একেবারে এক বছরও ঢাকায় থাকেন নাই।

সালকিয়া ও রাজসাহী হইয়া ঢাকায় প্রত্যাগমন।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

কিছুদিন মার খাওয়ার নিয়ম হইল—একবারে বা হাতে যতটা ধরে তাহা উঠাইয়া বা রাখিয়া ডান হাত দিয়া খাওয়াইয়া দেওয়া হইবে। ইহা ছাড়া আর কিছুই খাইবেন না; তাহাই করিতাম। একদিন কলিকাতায় প্রমথবাবুর বাসায়ও এই ভাবে খাওয়াইয়াছি। কয়েকদিন কোন পাত্রেই কিছু খাইতেন না। ঘরের মেঝে পরিষ্কার করিয়া লইয়া মাকে খাওয়াইতে হইত। একদিন ভোলানাথ কি বলায় তিনি বলিলেন, "কাঁসার পাত্রে খাইব না।" পিতলের পাত্রেও খাইবেন না বলিলেন। তখন ভোলানাথ ঠাট্টা করিয়া বলিলেন, "কোনটাতেই খাইবে না, তবে কি রূপার পাত্রে খাইবে?" মা-ও জবাব দিলেন, "ঠিকই বলিয়াছ, রূপার পাত্র হইলে তাহাতে খাইতে পারি। কিন্তু বলিয়া দিতেছি, আমার জন্য কোন রূপার পাত্র তৈয়ার করাইও না বা কাহাকেও এই কথা বলিতে পারিবে না।" আশ্চর্য্যের বিষয়, তার দুই এক দিনের মধ্যেই জ্যোতিষদাদা বাসা হইতে কিছু সন্দেশ সহ একখানা রূপার রেকাবী মাকে পাঠাইয়া দিলেন। কয়েকদিন পরে বাবাও একখানা রূপার রেকাবী মাকে দিলেন। তখন এই প্রসঙ্গে খুব হাসাহাসি হইল। তখন হইতে মা কিছু সময় রূপার পাত্রে লইয়া শেষে অন্য পাত্রাদিতে লইতে আরম্ভ করিলেন। কাঁসার বাসনে ভুলক্রমে খাওয়ানো হইলে, খাওয়া বন্ধ হইয়া যাইত,

খাওয়ার নূতন নিয়ম।

অবস্থারও একটা বিষম পরিবর্ত্তন হইয়া পড়িত। বহুদিন পর এই নিয়ম ভাঙ্গিয়াছে।

প্রমথবাবু নিজেই গল্প করিয়াছেন—একদিন তাঁহার মনে মার সম্বন্ধে কেমন সংশয় জাগিল। মনে হইল, সেদিন তিনি যে দেবীর বিষয় মনে করিতেছিলেন, যদি মা তাঁহাকে সেই মূর্ত্তিতে দেখা দিতে পারেন তবে তাঁহার সংশয় ভঞ্জন হইবে। তিনি কাহাকেও কিছু বলিলেন না। সেইদিন সন্ধ্যাবেলায় মা, ভোলানাথ ও প্রমথবাবু সিদ্ধেশ্বরী গিয়াছেন।

প্রমথবাবু ও তাঁহার চাপরাশিকে অলৌকিক দিব্যরূপ প্রদর্শন।

মা মধ্যে মধ্যে সেখানে যাইতেন। মা সেইদিনও গিয়া কালীর মন্দিরের বারান্দায় বসিয়াছেন। অনেক রাত্রি হইয়াছে, মার ত ফিরিবার কিছু ঠিক নাই, ভোলানাথ বারান্দায় শুইয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছেন। প্রমথবাবু বসিয়া জপ করিতেছেন। তখন মার খুব বড় ঘোম্‌টা দেওয়া থাকিত, মুখ প্রায়শঃ দেখা যাইত না। মা সেই ভাবে বসিয়া আছেন। অনেকক্ষণ পর সব নীরব, নিস্তব্ধ হইয়া গিয়াছে। মা হঠাৎ উঠিয়া দাঁড়াইলেন, মাথার কাপড় পড়িয়া গেল, মাথা উল্টিয়া পিঠের সঙ্গে মিলিল, চুল খুলিয়া পড়িয়াছে, কি হইল জানি না। প্রমথবাবু সেইদিন ছিন্নমস্তা মূর্ত্তি দেখিবার বিষয় মনে করিয়াছিলেন; তাহাই মার মধ্যে দেখিয়া তিনি স্তম্ভিত হইয়া গেলেন এবং লুটাইয়া মাকে প্রণাম করিলেন। মুহূর্ত্ত পরেই মা আবার স্থির হইয়া বসিয়া পড়িলেন, ভোলানাথ জাগিলে সকলে

শাহবাগে আসিলেন। পরে প্রমথবাবু নিজের বাসায় চলিয়া গেলেন। সেইদিন তাঁহার সঙ্গে এক চাপরাশি ছিল, সেও এই সব দেখিয়াছিল। সে প্রমথবাবুকে বলিল—"বাবু, আমি মার মধ্যে দশ-মহাবিদ্যার রূপ দেখিলাম।" প্রমথবাবু তাহাকে আলিঙ্গন দিয়া বলিয়াছিলেন, "আমার চেয়েও তুই ভাগ্যবান্, কারণ আমি মাত্র এক রূপ দেখিয়াছি, আর তুই দশ রূপ দেখিয়াছিস্।" এই ঘটনার কথা বাবা প্রমথবাবুর মুখেই শুনিয়াছেন।

মা নিত্যসিদ্ধা—বালানন্দ স্বামীর মত।

দেওঘরে বালানন্দ স্বামীজীও একদিন নিজে হইতেই বাবাকে বলিয়াছিলেন, "যে সঙ্গ ধরিয়াছ, ছাড়িও না। মা ত সাধিকা নন্। ইনি নিত্যসিদ্ধা,—কোনও কর্ম্মের উপলক্ষে জন্মগ্রহণ করেন, আবার সেই কর্ম্ম শেষ হইলেই চলিয়া যান। ইঁহাদের কোন প্রকার সাধন-ভজন করিতে হয় না।" মার সম্বন্ধে এইরূপ আরও অনেকে অনেক কথা বলিয়াছেন। মা কিন্তু এমন সাধারণভাবে চলেন যে, সকলেই ভুলিয়া থাকে। বিশেষ বিশেষ এক একটা ঘটনা দেখিলেও পরে আবার সকলেই ভুলিয়া যায়।

সিদ্ধেশ্বরীতে মার গুপ্ত লীলা।

ইহার মধ্যে একবার ৺শিবরাত্রির দিন দুপুরে মা ভোলানাথ, বাবা, বীরেনদাদা, নন্দু, মরণী ও আমাকে লইয়া সিদ্ধেশ্বরী গেলেন। মা গিয়া সেই গহ্বরেই বসিলেন, একটু পরে উঠিয়া ভোলানাথকে

তথায় বসিতে বলিলেন। ভোলানাথ বসিলে মা গিয়া তাঁহার এক হাঁটুর উপর বসিলেন। ও অপর হাঁটুর উপর মরণীকে বসাইলেন। শেষে বাবাকে মার কোলে বসিতে বলিলেন। বাবা বসিলেন। বাবাকে উঠাইয়া আবার বীরেনদাদাকে বসিতে বলিলেন, তিনিও বসিলেন। পরে তাঁহাকে উঠাইয়া আমাকে বসাইলেন এবং আমাকে উঠাইয়া নন্দুকে বসাইলেন। পরে সকলে উঠিয়া আসিলেন। গুপ্তভাবেই এই লীলা হইল, আর কেহ জানিল না। কিছুক্ষণ ওখানে থাকিয়া শাহবাগে চলিয়া আসা হইল।

টিকাটুলীর বাসায় বাবার পৈত্রিক দুর্গাপূজা, ১৩৩৪।

মা শাহবাগে থাকিতে ১৩৩৪ সনে আমাদের টিকাটুলীর বাসায় দুর্গাপূজা হইল। ইহা পৈতৃক পূজা, সেই জন্য আত্মীয় স্বজনেরা সকলেই একত্র হইয়াছেন। মার ভক্তেরাও অনেকে আসিয়াছেন। কলিকাতা হইতে অনেকে আসিয়াছেন। সকলেই টিকাটুলীর বাসায় একত্র হইয়াছেন। মা ও ভোলানাথ ষষ্ঠীর দিনই টিকাটুলীর বাসায় গেলেন। কাশী হইতে কুঞ্জমোহন মুখোপাধ্যায় মহাশয় সপরিবারে গিয়াছেন। তাঁহার বন্ধু ও শ্রীযুক্ত অরবিন্দ ঘোষ মহাশয়ের শিষ্য মির্জ্জাপুরের ডাক্তার শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, মহাশয়ও মার নাম শুনিয়া কুঞ্জবাবুর সঙ্গেই মাকে দর্শন করিতে সস্ত্রীক গিয়াছেন। যে পুরোহিত বাসন্তী পূজা করিয়াছিলেন, তিনিই দুর্গাপূজা করিতে গিয়াছেন। তাঁহার পায়ে খুবই ব্যথা হইয়াছিল। মা

বলিলেন, "এই ভাবে পূজা করা ঠিক নয়। নিজেদের পূজা নিজেদেরই ত করা উচিত। তা পার না বলিয়া পুরোহিত দ্বারা করান হয়। বাবাই পূজা করুক।" ভাইদের মধ্যে বাবাই সকলের বড়—মার আদেশে তিনিই পূজা করিবেন ও পুরোহিত মন্ত্র বলিয়া দিবে—এই স্থির হইল। জীবনে এরূপ আর কখনও কেহ দেখেন নাই। বাবা পূজা করিতে বসিলেন। মা সেই ঘরের একধারে বসিয়া থাকিতেন। বাবা মার পায়ের ধূলা ও আদেশ নিয়া পূজায় বসিলেন। যতক্ষণ পূজা হইত ততক্ষণ মা ঐ ঘরেই বসিয়া থাকিতেন। বাবা পূজা করিতেন ও অন্যান্য সকলে পূজার যোগাড় করিতেন। শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় মহাশয় বাবার খুল্লতাত-পুত্র, কাজেই উহা তাঁহারও পৈতৃক পূজা। তিনি সপরিবারে আসিয়াছেন। চারুবাবু, হর্ষবাবু, অনন্তবাবু ও চণ্ডীবাবু আসিয়াছেন। মা এই পাঁচজনকে পঞ্চ-পাণ্ডব বলিতেন। একদিন এই পাঁচজনে মাকে শাহবাগে লইয়া গিয়া পূজা করিলেন। দুর্গাপূজায় বলির ব্যবস্থা আছে। সপ্তমীদিন বলি নির্ব্বিঘ্নে হইয়া গেল। তিনদিনে তিনটী বলি হইত, ইহাই পূর্ব্ব পুরুষের নিয়ম ছিল। অষ্টমীর দিন শুধু বাবার কল্যাণার্থে একটী বিশেষ বলি বহুদিন যাবৎ চলিয়া আসিতেছে। সুরেন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় মহাশয়ই বলি দিতেছেন। অষ্টমীর দিন পাঠা উৎসর্গের পর খাঁড়া লইয়া যাইবার সময় তিনি মাকে প্রথম একবার প্রণাম করিলেন, আবার

খাঁড়া' উৎসর্গের পর যখন খাঁড়া লইয়া বলি দিতে যাইবেন তখন খাঁড়া মাটিতে রাখিয়া মাকে প্রণাম করিয়া বলির ঘরে চলিয়া গেলেন। যে ঘরে পূজা হইতেছিল তার পরের ঘরেই প্রতিমার বরাবর করিয়া বলির বন্দোবস্ত করা হইয়াছে। এদিকে মা প্রতিমার দিকে মুখ করিয়া পূজার ঘরের একধারে বসিয়া আছেন—মার পিছনদিকে বলির কোঠা। মা যেখানে বসিয়াছেন সেখান হইতে বলির স্থান মোটেই দেখা যায় না, বিশেষতঃ মা প্রতিমার দিকে মুখ করিয়া বসিয়া আছেন। কিন্তু খাঁড়া লইয়া বলি দিতে যাইবার সঙ্গে সঙ্গেই মা হঠাৎ উঠিয়া দাঁড়াইলেন। একেবারে দুই কোঠার মধ্যস্থানের দরজায় গিয়া দাঁড়াইতেই খাঁড়া পাঁঠার উপর পড়িল এবং সঙ্গে সঙ্গেই পাঁঠা ঠেকিয়া গেল বলিয়া মেয়েরা সকলে উচ্চৈঃস্বরে 'মা' 'মা' বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিলেন। বাড়ীতে ভয়ানক একটা গোলমাল উঠিল, কারণ ইহা অমঙ্গলের চিহ্ন বলিয়া বিশ্বাস। কিন্তু মা যেমন স্থির তেমনই স্থির-ধীর-শান্ত আনন্দময়ী মূর্ত্তিতে দাঁড়াইয়া আছেন। ভোলানাথ মহা ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন, তিনি ভাবিলেন "এত আনন্দ, এর মধ্যে এই ঘটনা হইল!" তিনি তখনই প্রতিমার পায়ে অঞ্জলি দিয়া সুরেন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের হাত হইতে খাঁড়া লইয়া বলি দিবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। সুরেন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয় মার দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া আছেন। ভোলানাথ বীরেনদাদাকে পাঁঠা আনিতে

বলিলেন, পাঁঠা আনা হইল, বলি হইয়া গেল। এখন বাবার কল্যাণের জন্য পাঁঠা বলিও হইবে। তাহাও কাঠ-গড়ায় দেওয়া হইল। ভোলানাথ বলির জন্য খাঁড়া উঠাইয়াছেন, এমন সময় মা ছুটিয়া গিয়া পাঁঠার গলায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িলেন। হাসিয়া বলিলেন, "আমার হাত না কাটিয়া পাঁঠা কাটিতে পারিবে না।" ভোলানাথ খাঁড়া নামাইলেন। পাঁঠা উঠাইয়া লওয়া হইল। পাঁঠা কি করা হইবে জিজ্ঞাসা করা হইল। মা এইটীকেও রম্‌নার মাঠে পূর্ব্বস্থানে লইয়া ছাড়িয়া দিয়া আসিতে বলিলেন এবং এবারও পাঁঠার সমস্ত গায়ে পা বুলাইয়া দিলেন। এবং তখনই আদেশ দিলেন, "বাবার কল্যাণে যে প্রতি বৎসর একটী বিশেষ বলি হয় তাহা আর হইবে না।" বলিলেন, "তোমাদের পৈতৃক বলি সম্বন্ধে গুরুদেবকে জিজ্ঞাসা কর, তিনি বলিলে বন্ধ করিতে পার।" সেই হইতে বাবার কল্যাণের বলি বন্ধ হইয়া গেল। কিন্তু গুরুদেবের ইচ্ছানুসারে পৈতৃক বলি চলিতেছে। পূজা দেখিতে যাঁহারা আসিয়াছিলেন, আজ যখন স্ত্রী-পুরুষ অনেকেই এই ভাবে বলির ব্যাপারে ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছিল আর সকলেই 'মা', 'মা' বলিয়া ডাকিতেছিল, তখন মার ক্ষণকালের জন্যও একটু চাঞ্চল্য দেখা যায় নাই, মুখের একটুও পরিবর্ত্তন হয় নাই, যেন কিছুই হয় নাই—এই ভাব। ইহা দেখিয়া যাঁহাদের মার প্রতি ততটা ভক্তি বিশ্বাস ছিল না, তাঁহারাও অবাক্ হইয়া গিয়াছিলেন। তাঁহারাও স্বীকার

করিয়াছিলেন, এমন স্থির ভাব আর কখনও দেখেন নাই। বাস্তবিকই আর কিছু না মানিলেও শুধু এই সর্ব্বাবস্থাতেই শান্ত, স্থির, আনন্দ-পূর্ণ ভাবের জন্যই তিনি জগতের কাছে পূজনীয়া হইয়াছেন। মানবজাতি এই ভাবের কাছে মাথা না নোয়াইয়া পারে না। এই ভাবে মা তুইবার তুইটী বলি বন্ধ করিয়াছেন। মা বলিলেন, "উৎসর্গ হইলেই বলি হইয়া যায়।"

সিদ্ধেশ্বরীতে বড় ঘর নির্ম্মাণ।

সিদ্ধেশ্বরীর ঘরখানা পুরানো হইয়া গিয়াছিল। মার জন্য একটী আশ্রম নির্ম্মাণ করা আবশ্যক বলিয়া অনেকে মনে করিতেছিলেন। কারণ ঐ বাগানে সব সময় সকলের মিলনের বাধা পড়িতেছিল। প্যারীবাবুদের দিক হইতেই একটু একটু গোলমাল শোনা যাইতে লাগিল। সেইজন্য সিদ্ধেশ্বরীতে একখানা ভাল ঘর তুলিবার প্রস্তাব হইল। ইতিপূর্ব্বে মার ইচ্ছায় যে ঘরখানা হইয়াছিল তাহার চাল খড়ের ও ভিটি মাটীর। এখন সকলের মতে বড় ঘর করাই স্থির হইল। বাবা অগ্রসর হইয়া এই ভার নিলেন ও যতটুকু জমি ছিল সবটুকু লইয়া বড় করিয়া একটী ঘর তুলিলেন। পরে এই ঘরের খরচ প্রায় অর্দ্ধেক অপর সকলে মিলিয়া দিয়াছেন, বাকী অর্দ্ধেক বাবা দিয়াছেন। ইহাই মার আদি আশ্রম। সেই ঘর এখনও আছে। এবার ঘর তুলিবার সময় মা সেই নির্দ্দিষ্ট আসনের স্থানটী সম্বন্ধে বলিলেন, "ঐ স্থানটী

এতদিন গহ্বরের মত ছিল, কিন্তু দেখিতেছি ঐ স্থানটী কেহ রক্ষা করিতে পারিবে না।" এই বলিয়া মার নিজের শরীরের মাপে ঐ স্থানটায় যে ভাবে বেদি হইবে তাহা বলিয়া দিলেন। সেই ভাবেই বেদি করা হইল।

মার ঢাকা ত্যাগ—গিরিডি, চুনার ও বিন্ধ্যাচল গমন।

কিছুদিন পর মা আবার বাহির হইবেন। এবার আমাদের সঙ্গে নিবেন না বলিতেছেন। সঙ্গে ভোলানাথ, মরণী ও নন্দুকে লইয়া বাহির হইবেন। আমরা সঙ্গে সঙ্গেই আছি কাজেই খুব কষ্ট হইল কিন্তু মা বুঝাইয়া শান্ত করিয়া রওনা হইয়া গেলেন। কলিকাতা গেলেন, তথায় কাশী হইতে শ্রীযুক্ত কুঞ্জ-মোহন মুখোপাধ্যায় মহাশয় সপরিবারে আসিয়া সঙ্গ লইলেন। সকলে গিরিডি গেলেন, সেখান হইতে পরেশনাথ দেখিয়া কয়েকদিন থাকিয়া কলিকাতায় আসিলেন। সম্ভবতঃ কলিকাতা হইতেই শ্রীযুক্ত কুঞ্জমোহন মুখোপাধ্যায় মহাশয়ও সপরিবারে কাশী চলিয়া গেলেন। মা সঙ্গীয় সকলকে লইয়া চুনার হইয়া মির্জ্জাপুর ও তথা হইতে বিন্ধ্যাচল গেলেন। তখনও বিন্ধ্যাচলে আশ্রম হয় নাই। মা মাড়োয়ারীদের 'বাংলায়' রহিলেন। রোজ সন্ধ্যাবেলায় মির্জ্জা-পুরের ডাক্তার শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় অষ্টভুজা-পাহাড়ে মার কাছে আসিতেন। আবার ভোরবেলা চলিয়া যাইতেন। মা, ভোলানাথ ও নন্দু সকলে মিলিয়া রান্না-বান্না করিতেন, এইভাবেই চলিত। কিছুদিন পর বিন্ধ্যবাসিনী

দর্শনে আসিয়া নির্ম্মলবাবু মার সংবাদ পাইয়া অষ্টভুজা-পাহাড়ে মার কাছে সপরিবারে উপস্থিত হইলেন। কয়েকদিন পর নন্দু কলিকাতা চলিয়া গেল। মা সকলকে লইয়া কিছুদিন বিন্ধ্যাচলে থাকিয়া কলিকাতা চলিয়া গেলেন। সেখানে গিয়া সুরেন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের বাসাতেই আছেন, খুব আনন্দ হইতেছে। মাকে লইয়া সুরেনবাবু, চণ্ডীবাবু প্রভৃতি তারকেশ্বরে গেলেন। পরে মা একবার নবদ্বীপও গেলেন। দুইএক-দিনের জন্য মা ও ভোলানাথ জয়পুর ও ভরতপুর এই সময়েই হইয়া আসিলেন।

কথা বলিতে সাবধানতা আবশ্যক, ১৩৩৪।

শাহবাগ হইতে বাহির হইবার সময় প্রফুল্লবাবুর স্ত্রী মাকে ঠাট্টা করিয়া বলিয়াছিলেন, "শীঘ্র শীঘ্র আসিবেন, দেরী করিলে কিন্তু শাহবাগে ঢুকিতে দিব না—দরজা বন্ধ করিয়া দিব।" মা-ও হাসিয়া বলিলেন, "তাই নাকি, আচ্ছা।" ভোলানাথ প্রফুল্লবাবুর স্ত্রীকে এই কথা বলিতে নিষেধ করিলেন। সে অবশ্য ভাল ভাবেই এই কথা বলিয়াছিল। কিন্তু মুখ হইতে যাহা বাহির হইল তাহাই হইল। মালিকেরা শাহবাগ কোর্ট অব্ ওয়ার্ডের হাতে দিয়া দিল; ভোলানাথ, যোগেশবাবু, ভূদেববাবু—সকলেরই চাকুরী গেল। মার আর শাহবাগে ফিরিয়া যাওয়া হইল না। এইজন্যই মা অনেক সময় বলিতেন, "কথা বলিতে সাবধান মত বলিতে হয়, কখনও কখনও ভাল খারাপ সব কথাই সত্য হইয়া যায়।"

মুন্সেফ্ দীনেশবাবু টাঙ্গাইলে ছিলেন, মা এইবার সেখান হইয়াই গিয়াছিলেন। এদিকে নবাববাড়ী মুসলমানদের মধ্যে গোলমাল হইল। কালীমূর্ত্তি বাগানে আছে, বাগানে তখন মটরী পিসিমা, দাদামহাশয়, দিদিমা, মাখন, অমূল্য প্রভৃতি থাকিত। কুলদা দাদা কালিপূজা করিয়া আসেন। কমলাকান্তও তখন বাগানেই ছিল,—সে প্রত্যহ কালীর গলায় রক্তজবার মালা দিত। একদিন ভুল হইল, মা তাহা জানিতে পারিলেন। চিঠি লিখিয়া খবর লওয়া হইলে জানা গেল মালা দিতে সত্য সত্যই ভুল হইয়াছে।

টিকাটুলীতে একটা বাসা ভাড়া করিয়া কালীমূর্ত্তি আনা হইল। যাঁহারা শাহবাগে ছিলেন, তাঁহারাও সেখানে গেলেন। বীরেন মহারাজাও কিছুদিন বাগানে ছিলেন, পরে অন্যত্র চলিয়া গেলেন। এত দিনের মাটীর কালীমূর্ত্তি—সকলেই ভয় পাইল, হয়ত উঠাইলেই খসিয়া পড়িবে। কিন্তু উপায় নাই, মূর্ত্তিটী স্থানান্তরিত করিতেই হইবে। যোগেশবাবু, সুরেনবাবু প্রভৃতি মূর্ত্তিটীকে উঠাইয়া মোটরে করিয়া টিকাটুলীতে লইয়া গেলেন কিন্তু মূর্ত্তির কিছু হইল না।

৺কালীমূর্ত্তির স্থান-পরিবর্ত্তন, ১৩৩৪।

সিদ্ধেশ্বরীর ঘর তৈয়ার হইয়া গিয়াছে। এবার জন্মোৎসব সেখানেই হইবে স্থির হইয়াছে, এবং জন্মোৎসবের সময়ও আসিয়া পড়িয়াছে। মা কলিকাতা হইতে টিকাটুলীর ভাড়াটিয়া বাসায় ১৩৩৫ সনের বৈশাখ মাসে আসিলেন। জ্যোতিষদাদাও

সেই সঙ্গে আসিয়াছেন। নিরঞ্জনবাবুর স্ত্রীর খুব অসুখ, উদরী ব্যারামে ভুগিতেছেন। মা আসিয়া প্রথমে সেই বাসায় উঠিলেন, পরে ভোগের পর টিকাটুলী আসিলেন। শাহবাগ কোর্ট অব্ ওয়ার্ডে চলিয়া গিয়াছে, কাজেই ভোলানাথের চাকুরী গিয়াছে। রায়বাহাতুর যোগেশবাবুরও চাকুরী গিয়াছে। তখন এই চাকুরীর জন্য রায়বাহাতুরের সমস্ত পরিবার মার কাছে অনেক অনুরোধ করিয়াছিলেন। কিন্তু মা বলিলেন, "ব্যস্ত হইও না, সবই মঙ্গলের জন্য।" অবশ্য শেষে তাঁহারা সকলেই বুঝিয়াছিলেন, মার কৃপায় এই চাকুরী যাওয়া কত মঙ্গলকর হইয়াছিল। মাকে প্যারীবানু ও তাঁহার জামাতা ইহার পরেও নিতে চাহিয়াছিলেন কিন্তু যোগেশবাবু আর তথায় যাওয়া সঙ্গত মনে করেন নাই। তাই মাকে যাইতে দেন নাই। এবার মা ঢাকায় আসিয়া দেখিলেন, রায়বাহাতুরের পুত্র প্রফুল্লবাবুর স্ত্রীরও অবস্থা খুব খারাপ, তিনি তাঁহার শিয়রে মার ছবি রাখিয়াছেন। মা টিকাটুলীর বাসায় আসিবার একটু পরেই প্রফুল্লবাবুর স্ত্রীকে দেখিতে লইয়া যাওয়া হইল। মা অনেকক্ষণ সেখানে ছিলেন। আসার সময় গায়ের চাদরখানা তাঁহাকে দিয়া আসিলেন। কিছুদিন পর হইতেই তিনি ধীরে ধীরে সুস্থ হইয়া উঠিলেন।

মার টিকাটুলীর ভাড়াটিয়া বাসাতে গমন—বৈশাখ, ১৩৩৫।

১৩৩৫ সনের বৈশাখে সিদ্ধেশ্বরীতে মার জন্মোৎসব

আরম্ভ হইল।* কাশী হইতে কুঞ্জমোহন মুখোপাধ্যায় ও নির্ম্মলবাবু সপরিবারে আসিয়াছেন। বিনয়-বাবু (মুন্সেফ্) সপরিবারে আসিয়াছেন। মা ভোলানাথ ও সকলকে নিয়া সিদ্ধেশ্বরী গেলেন। এবার হইতে মার জন্মতিথি হইতে তারিখের মধ্যে যতদিন হয় ততদিন পর্য্যন্ত অখণ্ডভাবে নাম চলিবে স্থির হইয়াছে। এবং জন্মতিথিতে জন্মসময়ে ভোলা-নাথই মার পূজা করিবেন স্থির হইয়াছে। ১৯শে বৈশাখ হইতে উৎসব আরম্ভ হইল। ঘরটী বেশ বড় হওয়ায় ঘরের ভিতরই পালা-কীর্ত্তনও হইতেছে। চিন্তাহরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও অন্যান্য অনেকেই নিমাই সন্ন্যাস, মানভঞ্জন, মাথুর প্রভৃতি কীর্ত্তন গাহিয়া সমাগত সকলকে কখনও হাসাইতেছেন, কখনও কাঁদাইতেছেন। নিমাই সন্ন্যাস শুনিয়া সকলে কাঁদিয়া আকুল হইল। মা স্থিরভাবে একধারে বসিয়া গান শুনিতেছেন। ওদিকে ভোগের রান্নাবান্নাও হইতেছে, অনেকেই প্রসাদ পাইতেছেন। জন্মতিথির দিন রাত্রি প্রায় দশটা হইতেই মা দিদিমার কোলে

সিদ্ধেশ্বরীতে মার প্রথম জন্মোৎসব—বৈশাখ, ১৩৩৫।

---

* ১৩৩৩ সালের বৈশাখ মাসে মা একদিন আমাদের টিকাটুলীর বাসায় ভোগে গিয়াছিলেন। কথায় কথায় মার মুখে শুনিলাম—সেইদিন (১৯শে বৈশাখ ছিল) মার শরীরের প্রকাশের তারিখ। আমরা বলিলাম, "ভালই হইয়াছে, আজ এখানে ভোগ হইবে।" ইহার পর বৎসর (১৩৩৪ সালে) ঐ তারিখে জ্যোতিষদাদা প্রভৃতি সকল যোগাড় করিয়া শাহবাগে মার জন্মোৎসব করিয়াছিলেন। ইহাই জন্মোৎসবের পূর্ব্ব ইতিহাস।

পড়িয়া আছেন। শেষ রাত্রিতে প্রকাশের সময়—মা নিজের গলার মালা হইতে বহুক্ষণ যাবৎ একটী ফুল হাতে করিয়া বসিয়াছিলেন। ঐ ভাবে পড়িয়া আছেন কিন্তু ফুলটী হাতেই আছে। শেষরাত্রিতে ঠিক যখন প্রকাশের সময় উপস্থিত—ভোলানাথ পূজায় বসিবেন,—সেই সময় মা চোখ বুঁজিয়া দিদিমার কোলেই শুইয়া আছেন ; ঐ ভাবে থাকিতেই সকলেই দেখিলেন—মার হাত ধীরে ধীরে দিদিমার পায়ের কাছে গিয়াছে, শরীর ঐ ভাবেই পড়িয়া আছে, হাতটি খুলিয়া ফুলটী দিদিমার পায়ে পড়িয়া গেল। আর হাত উঠাইতে পারিলেন না। এই ভাবে কিছুক্ষণ অতিবাহিত হইবার পর মাকে উঠাইয়া পূজার স্থানে লওয়া হইল। মা সেখানে গিয়াও পড়িয়া রহিলেন।

ভোলানাথ ষোড়শোপচারে পূজা করিতেছেন ; সকলেই স্তব্ধ হইয়া অপূর্ব্ব দৃশ্য দেখিতেছেন। পূজা করিতে করিতে ভোর হইয়া গেল। পূজা শেষ হইল, কীর্ত্তনও আজ শেষ হইবে। মা পড়িয়া আছেন তাই কীর্ত্তন বন্ধ হইতেছে না। অনেকক্ষণ পর মাকে অনেক চেষ্টায় উঠান হইল। মা উঠিয়া বসিলেন, কিছুক্ষণ পর মা অনেকটা প্রকৃতিস্থ হইলেন। হাসি হাসি মুখে চাহিয়া আছেন। দাদামহাশয়ও কীর্ত্তন করিতেছিলেন; মা তাঁহাকে ডাকিলেন, নিকটে আসিলে মা নিজের গলার মালা দাদামহাশয়ের গলায় পরাইয়া দিলেন ও লুটাইয়া প্রণাম করিলেন। কিন্তু ঐ যে চরণে লুটাইয়া পড়িলেন আর উঠিতে

পারিলেন না, অনেক চেষ্টায় উঠান হইল। মা যখন যাহা করিতেন তাহাতেই যেন সমস্ত দেহ, মন, প্রাণ ঢালিয়া দিতেন। দাদামহাশয় সেই মালা, গলায় দিয়া নাচিয়া নাচিয়া গান ধরিলেন, "হরিনামের মালা, নিতাই দিল আমার গলে, হরিনাম-মন্ত্র দিল স্নান করায়ে গঙ্গাজলে" ইত্যাদি। এই উৎসবের মধ্যে একদিন বাউলবাবু সর্ব্বাঙ্গের ফুলের সাজ আনিয়া মাকে সাজাইলেন। মাথায় ফুলের মুকুট দিলেন, হাতে-পায়ে ফুলের গহনা, গলায় ফুলের মালা। মা কি অপূর্ব্ব সাজেই সাজিলেন! কিছুক্ষণ পর সব খুলিয়া ফেলিলেন। দেখিতাম কেহ বেশী সময় পা ছুঁইয়া থাকিলে, কি বিশেষ ভাবে পূজা করিলে, কি এমন ভাবে সাজাইলে, মা একটু পরেই সমাধিস্থ হইয়া পড়িতেন। এই ভাবে উৎসব শেষ হইল। সকলে টিকাটুলীর ভাড়াটিয়া বাসায় চলিয়া গেলেন। কালীবাড়ীর ভৈরবীই ঐ ঘরে ধূপ-প্রদীপ দিত। একটী ঘটনা লিখিতে ভুলিয়া গিয়াছি, —শাহবাগে থাকিতে একদিন কীর্ত্তন হইতেছে, মার খুব ভাবাবস্থা, কিন্তু সেদিন ঘুরিয়া ঘুরিয়া যেন কীর্ত্তন প্রদক্ষিণ করিতেছেন, মুখ-চোখের ভাব অস্বাভাবিক উজ্জ্বল। সমস্ত চেহারায় যেন বিদ্যুৎ চমকাইতেছিল। হঠাৎ মা কীর্ত্তনের ঘর হইতে বাহির হইয়া পড়িলেন, অতি দ্রুতভাবে অন্ধকারের ভিতরেই বাগান পার হইয়া ফকির সাহেবের যে বড় কবরটা ছিল, সেখানে গিয়া দাঁড়াইলেন। একটী মুসলমান ভদ্রলোকও সেইদিন মাকে দেখিতে আসিয়া তখন পর্য্যন্তও উপস্থিত

ছিলেন। সকলে দৌড়িয়া আলো লইয়া মার পিছনে পিছনে গেল, সেই মুসলমান লোকটীর কাছে মা ঐ অবস্থায়ই গিয়া তাঁহাকে সঙ্গে যাইবার জন্য পিঠে সামান্য ভাবে স্পর্শ করিতেই তিনিও সঙ্গে সঙ্গে যাইয়া কবরের দরজা খুলিয়া দিলেন। মা ভিতরে ঢুকিয়া চারিদিক ঘুরিলেন এবং অতি উচ্চৈঃস্বরে কোরাণের সব কথা আওড়াইতে লাগিলেন। মার এত উচ্চ স্বর আর কখনও শুনি নাই, তবে প্রথম দিন পৌষ সংক্রান্তির কীর্ত্তনে "হরে মুরারে"ও খুবই উচ্চৈঃস্বরে গাহিয়াছিলেন। কোরাণের কথাগুলি অতি স্পষ্টভাবে উচ্চারণ করিতেছেন। মুসলমানটী মাথা নীচু করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। সকলেই স্তব্ধ। কোথায় মা কোরাণের এই সব কথা শিখিলেন? তার পর মা মুসলমানেরা যেমন নমাজ পড়ে সেই ভাবে নমাজ পড়িতে লাগিলেন। কিন্তু মুসলমানেরা সাধারণতঃ নিয়ম রক্ষা করিবার মতই একবার উঠে, বসে, নমস্কার করে, হাত তোলে। মাও সেই সব করিতেছেন, কিন্তু সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ যেন ঐ সব ক্রিয়ার সময় ঢালিয়া দিতেছেন। মুসলমান ভদ্রলোকটীও তখন নমাজ পড়িলেন। কিন্তু মা যেন দেখাইয়া দিলেন, ঐ সব ক্রিয়া কি ভাবে সমস্ত শরীর, প্রাণ, মন ঢালিয়া দিয়া করিতে হয়। পরে মা কিছু কিছু বুঝাইয়াও দিয়াছিলেন—কোন্ অঙ্গ কি ভাবে চালনা করিতে হয়। মা বলিলেন, "ইহার ভিতরেও খুব সুন্দর কথা আছে। কিন্তু সাধারণতঃ তাহা কেহ জানে না। সকলে শুধু নিয়ম রক্ষার

মতই করিয়া যায়।" এই সব কোরাণের ভাষার বিষয়ে বলিয়াছেন, "আমি ত নিজে ইচ্ছা করিয়া কিছু করিতে পারি না। দেখিলাম ভিতর হইতে এই সব বাহির হইতেছে। ভাষা, সুর, সব আপনা হইতেই হইয়া যাইতেছে। তবে ইহার কি অর্থ, এবং এই সব কি, তাহাও ভিতরেই প্রকাশ হয়। সব সময় তোমাদের কাছে প্রকাশ হয় না। নতুবা যখনই যাহা হইতেছে সবটারই অর্থ ভিতরে তখনই প্রকাশ হইয়া যাইতেছে।" পরে মা কবর-স্থান হইতে বাহির হইয়া আসিলেন। কীর্ত্তনের ঘরে আসিলেন, লুট দেওয়া হইল; মুসলমান ভদ্রলোকটী সেই লুটের প্রসাদ নিলেন। মাকে নিজ হাতে কিছু খাওয়াইয়া দিতে চাহিলেন, মা রাজি হইয়া কাছে দাঁড়াইতেই তিনি বাতাসা মার মুখে দিয়া দিলেন। মাও তাহা গ্রহণ করিলেন। পরে প্যারীবানুরা এই কথা শুনিয়া তাঁহারা যখন ঢাকায় আসিলেন, তখন মাকে পূর্ব্বোক্ত কবরের কাছে লইয়া গেলেন এবং সকলেই সেই ভাবে কোরাণ বলিতে অনুরোধ করিতে লাগিলেন। কিন্তু সকলে বলিলেই ত আর হয় না। মার সেইদিন কোন কথা কিছুতেই বাহির হইল না। অনেকক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়াছিলেন, হঠাৎ উঠিয়া দাঁড়াইলে একটু সময় কি সব কথা বাহির হইল। নবাববাড়ীর পরিবারেরা বুঝিল—কোরাণের কোন্ অংশ মা বলিতেছেন। কিন্তু সেদিন পূর্ব্বের মত হইল না; খুবই অল্প হইল।

সিদ্ধেশ্বরীতে জন্মোৎসবের পর টাঙ্গাইলে দীনেশবাবুর কাছে

যাওয়ার কথা পূর্ব্ব হইতেই হইতেছিল—মা সেখানে গেলেন, সঙ্গে ভোলানাথ ও জ্যোতিষদাদা ছিলেন। তুই এক দিন পরই সেখান হইতে ঢাকায় ফিরিয়া আসিলেন, সেবারও কোন কারণে আমাদের যাওয়া হইল না। মা চলিয়া আসার সঙ্গে সঙ্গেই আমরা যাই নাই বলিয়া দীনেশবাবু তুঃখ করিয়া এক পত্র লিখিয়াছিলেন। তাহাতে লিখিয়াছেন, "এখানে একদিন কীর্ত্তন হইয়াছিল, মার খুব ভাবাবস্থা হইয়াছিল। অনেকেই মার শরীর-রক্ষার জন্য চেষ্টাও করিতেছিলেন, কিন্তু মার শরীর পুনঃ পুনঃ মাটিতে পড়িয়া গিয়াছে।" মা একটু প্রকৃতিস্থ হইয়া বসিলে আমরা সকলে জিজ্ঞাসা করিলাম, "মা তোমার যখন ভাব হয় তখন একা খুকুনীই তোমার শরীর রক্ষা করিতে পারে। আজ খুকুনী নাই, কিন্তু এত লোক ছিল তবুও তোমার শরীরে যথেষ্ট চোট লাগিয়াছে, এর কারণ কি ?" মা মৃতুভাবে জবাব দিলেন, "তাহা সকলে বুঝিবে না।" এই চিঠি পাইয়া মার ঐ সামান্য কথাটুকু পড়িয়া যেন কৃতার্থ হইলাম।

মার টাঙ্গাইলে গমন।

মা টাঙ্গাইলে চলিয়া গেলেই জ্যৈষ্ঠমাসে (১৩৩৫) ঢাকেশ্বরীর বাড়ীর কাছে একটী বাড়ী ভাড়া করিয়া তথায় কালীমূর্ত্তি লইয়া যাওয়া হইল। এই তৃতীয়বার কালীমূর্ত্তির স্থান পরিবর্ত্তন করা হইল। স্থির হইল, মা আসিয়া তথায়ই থাকিবেন। মা আসিয়া সেখানেই উঠিলেন। দোতলা

কালীমূর্ত্তির উত্তমা-কুটীরে স্থান পরিবর্ত্তন ও মার উত্তমা-কুটীরে অবস্থান—জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৫।

বাড়ী, বেশ সুন্দর। মা উপরেই থাকিতেন। উপরে একটী কোঠা ছিল। এ বাসাতে কয়েকদিন পর টাকীর জমিদার সূর্য্যকান্তবাবু সপরিবারে মার দর্শনে আসেন। তিনি তখন পুত্রদের বিয়োগে বড় কাতর ছিলেন। মাকে পাইয়া তাঁহাকে পূজা করিয়া তাঁহারা বড়ই শান্তি পাইলেন। মা বলিলেন, "আমি তোমার মেয়ে।" তাঁহারাও মাকে বুকে জড়াইয়া বড়ই আনন্দ পাইলেন। কয়েকদিন থাকিয়া তাঁহারা কলিকাতায় ফিরিয়া গেলেন। এদিকে নিরঞ্জনবাবুর স্ত্রীর অবস্থাও ভাল নয়। তাঁহার ইচ্ছা—রোজ মাকে দর্শন করেন,—নিরঞ্জনবাবু রোজই মাকে একবার করিয়া বাসায় লইয়া যাইতেন। একদিন মার সহিত বীরেনদাদাও গিয়া নিরঞ্জনবাবুর স্ত্রীকে দেখিয়া আসিলেন। তাঁহার অবস্থা দেখিয়া বীরেনদাদার মনটা খুব খারাপ হইয়া গেল। সন্ধ্যাবেলা মা চোখ বুঁজিয়া বসিয়া আছেন, উপরের ঘরেই মা বসিয়া ছিলেন। ঘরে অনেক লোক, সকলেই চুপ করিয়া বসিয়া আছেন। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, মা অনেক সময় সন্ধ্যাবেলাটা আকাশের দিকে চাহিয়া একেবারে পাথরের মত স্থিরভাবে বসিয়া থাকিতেন। উপস্থিত সকলেই স্থিরভাবে বসিয়া থাকিতেন। আজও সকলে চুপ করিয়া বসিয়া আছেন। বীরেনদাদা চোখ বুঁজিয়া মনে মনে মার কাছে নিরঞ্জনবাবুর স্ত্রীকে রক্ষা করিবার জন্য খুব প্রার্থনা করিতে-ছিলেন, কারণ উদরী-ব্যারামে তিনি বড়ই কষ্ট পাইতেছিলেন। কিছুক্ষণ পরেই মা চোখ খুলিয়া ইতস্ততঃ চাহিতে চাহিতে

বলিয়া উঠিলেন, "আমাকে কে ডাকে?" বীরেনদাদা দেখিলেন মা প্রাণের ডাক শুনিয়াছেন। তিনি অমনি হাত জোড় করিয়া বলিলেন, "মা, আমি ডাকিতেছিলাম, নিরঞ্জন-বাবুর স্ত্রীকে রক্ষা কর।" মা তাঁহার মুখের দিকে একটু চাহিয়াই চোখ বন্ধ করিয়া আবার পূর্ব্ববৎ বসিয়া রহিলেন। ইহার কয়েকদিন পরই নিরঞ্জনবাবুর স্ত্রী মারা গেলেন। স্ত্রী মারা যাওয়ার কয়েক মাস পরেই নিরঞ্জনবাবুও মারা যান। মা তখন ঢাকায় ছিলেন না। এই বাসাতেই কীর্ত্তনের সময় একদিন রামঠাকুরকে লইয়া মথুরামোহন চক্রবর্ত্তী প্রভৃতি মাকে দর্শন করিতে আসিলেন। রামঠাকুরের সহিত মার কলিকাতায় প্রথম দেখা হয়—দেখা হওয়া মাত্রই রামঠাকুর মহাশয় সাষ্টাঙ্গে মাকে প্রণাম করিলেন। এবং কথাবার্ত্তায় সকলের কাছেই মাকে "ভগবতী দেবী" বলিয়া প্রকাশ করিতেন। উত্তমা-কুটীরেও একবার কালীপূজার দিন পূর্ব্বোক্ত কালীমূর্ত্তির উপর কালীপূজা হইল, কিন্তু সেদিন ভোলানাথ পূজা করিলেন, মা নিকটে মাটিতে পড়িয়া রহিলেন।

বরিশালে ও বিক্রমপুরে গমন।

মা একবার এই সময়েই চিন্তাহরণ সমাদ্দার মহাশয়ের আহ্বানে বরিশাল সহরে গেলেন। কয়েকদিন তথায় ছিলেন। পরে মুন্সীগঞ্জে ফিরিয়া সেখান হইতে বিক্রমপুরের গ্রামে গ্রামে নৌকা করিয়া ঘুরিলেন। প্রথমে মা তন্তর গেলেন, সেখানে মার পিসিমাদের বাড়ী। দুই তিন দিন সেখানে থাকা হইল—কীর্ত্তনাদিও

হইল। তন্তরে একদিন মার কাছে বসিয়া আছি, কি কথায় হঠাৎ মা কাপড়ের একধার ছিঁড়িয়া আমার বাম বাহু বাঁধিয়া দিলেন। কাপড় টুকরা করিলেন না, মাঝখান দিয়া খানিকটা স্থান ছিঁড়িয়া বাঁধিয়া দিলেন। যে কাপড় পরিয়া আছি সেই কাপড় দিয়াই হাত বাঁধা হইয়াছিল বলিয়া খুব অসুবিধা বোধ হইতেছিল। অন্যে যাহাতে না দেখে সেইজন্য আমি গায়ের চাদর দিয়া ঢাকিয়া রাখিলাম। আমার কেমন মনে হইল হয়ত মার ইহা খুলিতে নিষেধ। অবশ্য মা মুখে কিছু বলেন নাই। পরের দিন হলদিয়া গ্রামে শ্যামলাদের বাড়ী গেলাম। প্রাতে কাপড় ছাড়িব, গায়ে সেমিজ ছিল, ঐ বাঁধন না খুলিলে সেমিজও খুলিতে পারি না। মাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "কি করিব ?" মা বলিলেন, "খুলিও না, সাত দিন পরে খুলিও।" আমাকেই ভোগের পাক করিতে হইবে—মাকে খাওয়াইয়া দিব। মাকে বলিলাম, "পায়খানায় যাইব, তারপর বাসি কাপড় না ছাড়িয়া তোমার ভোগ পাক করিব, তোমাকে খাওয়াইব, লোকে কি বলিবে ?" মা বলিলেন, "কাহাকেও কিছু বলিও না, তুমি এই কাপড় নিয়াই সব করিয়া যাও।" জীবনে এই ভাবে এক কাপড়ে থাকিয়া পূজাদির কাজ করা এই প্রথম, কিন্তু মায়ের আদেশে দ্বিধা হইল না। শুধু লোকের দৃষ্টি এড়াইবার জন্য একটা চাদর গায়ে দিয়া থাকিতাম। তবুও সকলেই বোধ হয় লক্ষ্য করিল। আমিই সব করিয়াছিলাম। এই বাড়ীতে খুব কীর্ত্তনাদি হইল। ইহার পর ভোলানাথের

ভ্রাতুষ্পুত্রীর শশুরবাড়ী বেঁজগাও গ্রামে এবং ভোলানাথের নিজ বাড়ী আটপাড়াতে গেলেন। তখন আটপাড়াতে ভোলানাথের বিধবা ভ্রাতৃবধূ (রেবতীবাবুর স্ত্রী) ছিলেন। এবার তিনি মাকে বাড়ীর ভিতর যাইবার জন্য খুব অনুরোধ করিলেন। কিন্তু মা নিকটেই অপর এক বাড়ীতে বসিয়া পড়িলেন। শুধু বিনীত ভাবে বলিতে লাগিলেন, "আপনার কথার অবাধ্য ত কোন দিন হই নাই, কিন্তু আজ আমি পারিতেছি না, কি করিব বলুন।" এবার বাবা, আমি, রাজেন্দ্র কুশারীর স্ত্রী, অমূল্য প্রভৃতি সঙ্গে ছিলাম। এবার আমরা মথুরবাবুর বাড়ী ছয়গাঁও গ্রামে গিয়াও দুই এক দিন ছিলাম। ইতিপূর্ব্বেও একবার তাঁহাদের বাড়ীতে মা আমাদের লইয়া গিয়াছিলেন। তারপর আমরা আবার দোকাছি ৺সীতানাথ কুশারী মহাশয়ের বাড়ী গেলাম।

এই ভাবে ঘুরিয়া ঘুরিয়া ঢাকা গেলাম। যেদিন ঢাকায় পৌঁছিলাম সেই দিনই কলিকাতা কুণ্ডুদের বাড়ী হইতে টেলিগ্রাম আসিল, যোগেন্দ্রবাবুর বড় অসুখ, মাকে একবার কলিকাতা যাইতে হইবে। আবার টেলিগ্রাম আসিল, কলিকাতাতে নন্দুর খুব অসুখ। পূর্ব্বদিন আমি ও বাবা মার আদেশ পাইয়া কলিকাতা চলিয়া গেলাম। পরের দিন মা কলিকাতা রওনা হইলেন ও কুণ্ডুদের বাড়ী গিয়া উঠিলেন। যেদিন কলিকাতায় পৌঁছিলাম সেই দিন কাপড়ের বাঁধন খুলিবার দিন, আমি বাঁধন খুলিয়া ফেলিলাম। কয়েকদিন পর নন্দু ও যোগেশবাবু

কিছু ভাল হইলে আমরা মার সঙ্গে ঢাকায় ফিরিয়া আসিলাম। পরে মা বলিয়াছিলেন, "নন্দুর এই অসুখ হইবে আমি জানিতাম, নন্দুরই জীবন রক্ষার্থে ঐরূপ কাপড়ের বাঁধন হইয়া গিয়াছিল।" মা কলিকাতায় যোগেন্দ্র কুণ্ডুদের বাড়ী পূর্ব্বে আরও দুই তিনবার গিয়াছেন। একবার তাঁদের খেলনা দিয়া সাজান একটা ঘরে মাকে নিয়া মেয়েরা বলিল, "মা, তোমার যাহা ইচ্ছা নাও। আলমারিতে নানা রকমের খেলনা সাজান ছিল, মা তাহার মধ্য হইতে একটী 'চুসনী' লইয়া আসিলেন, তাহাতে সকলেই হাসিতে লাগিলেন। এত বড় বাড়ী প্রথমবার গিয়াই মা এমন ভাবে চলাফেরা করিতেন, যেন সব রাস্তাই মার জানা আছে। সেই 'চুসনী' মা নন্দুকে দিয়াছিলেন। বিক্রমপুরের গ্রামে গ্রামে প্রতি বাড়ীতে গিয়াও মা খুব আনন্দ করিয়াছেন। কাহারও হাঁড়িভরা লাড়ু খুঁজিয়া খুঁজিয়া বাহির করিয়া সকলকে বিলাইয়া দিয়াছেন। কাহারও বাড়ী আচারের হাঁড়ি, এই ভাবে খালি করিয়া দিয়াছেন। সকলেই এই ব্যাপারে খুব আনন্দ করিয়াছেন। আর ঐ লক্ষ্মীর আসনের জিনিষ নিজে চাহিয়া খাইয়া আসিয়াছেন।

একবার কাশীতে কুঞ্জমোহন মুখোপাধ্যায় মহাশয় 'মন্নুর জীবন-দান' উপলক্ষ্য করিয়া মার পূজার আয়োজন করিয়া মাকে লইয়া যাইবার জন্য অনুরোধ করিয়া চিঠি লিখিলেন। কথা হইল—যাওয়ার সময় টাঙ্গাইলে দীনেশবাবুর বাড়ীও

হইয়া যাওয়া হইবে। এবার মায়ের এক পিসিমাও তীর্থ করিবার উপলক্ষে আমাদের সঙ্গে চলিলেন। মা, ভোলানাথ, বাবা, নন্দু, মার পিসিমা ও আমি চলিলাম। টাঙ্গাইলে যাওয়া

টাঙ্গাইলে দীনেশ-বাবুর বাড়ীতে গমন।

হইল, দীনেশবাবু সপরিবারে খুব আনন্দের সহিত কীর্ত্তনাদি করাইলেন। এখানেও মার খুব ভাব হইল। একদিন এমন অবস্থা—ভোলানাথ ও আমরা সকলেই ভয় পাইতেছি। ভোলানাথ উপায়ান্তর না দেখিয়া জল আনাইলেন ও মার মুখে চোখ ছিটাইয়া দিতেই মা যেন তীব্রভাবে বলিয়া উঠিলেন, "কে জল দেয়? আমার কি ফিট্ হইয়াছে?" এমন ভাবে এই কথা চোখ বুঁজিয়াই বলিলেন যে, ভোলানাথ থতমত খাইয়া বলিতেছেন, "কি করিব? না বুঝিয়া জল দিয়াছি, তোমাকে উঠাইবার জন্য।" পরক্ষণেই মা একটু মৃদু হাসিয়া চোখ বুঁজিয়াই বলিলেন, "সরবৎ গুলিয়া দিয়াছে।" সত্যই সকলে মাকে লইয়া এত ব্যস্ত ছিল যে, জল চাহিবামাত্র একটী মেয়ে সরবতের বাসনটাই না জানিয়া লইয়া আসিয়াছে। অনেকক্ষণ পরে মা উঠিলেন। পরদিন দীনেশবাবুর স্ত্রী মাকে পূজা করিলেন। হঠাৎ মা এমন ভাবে কাঁদিয়া উঠিলেন যে, অন্য কোঠা হইতে ভোলানাথ প্রভৃতি সকলেই দৌড়িয়া আসিয়া তাঁহাকে সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন। কোনও ঘটনায় ভোলানাথ একটু অসন্তুষ্ট হওয়ায় দীনেশবাবুও সপরিবারে দুঃখিত, এই ভাবেই

রওনা হইয়া আসা হইল। মাকে দেখিয়াছি—কোনও গোলমাল হইলেই কেমন হইয়া যাইতেন। করুণাময়ী শুধু চাহিতেন সকলে আনন্দে মিলিয়া থাকুক, কিন্তু জাগতিক ব্যাপারে সব সময় তা' হইয়া উঠিত না। এই যে মাকে কত আনন্দ করিয়া নিলেন, তারপর আসিবার সময় দীনেশবাবুদের সপরিবারে মনটা খারাপ হইতেই বোধ হয় মার প্রাণেও আঘাত লাগিল। অথবা অন্য কোন কারণে কিনা মা-ই জানেন আমরা অনুমান করি মাত্র। কিন্তু ব্যাপার বড়ই বিপরীত হইয়া দাঁড়াইল। অনেক দূর পর্য্যন্ত নৌকায় আসিয়া ষ্টীমার ধরিতে হয়, নৌকায় আসিয়াই মা শুইয়া পড়িলেন। খানিক পরে শরীর কেমন হইয়া উঠিল, মা জলে ঝাঁপাইয়া পড়িবার জন্য কাঁদিয়া আকুল, শরীরে তখন এত শক্তি যে, আমরা তিন চার জনে ধরিয়া রাখিতে পারি না। ভয়ানক অবস্থা—চোখ লাল, মুখের ভয়ানক অবস্থা। মনে হয় জীবন ছাড়িয়াই দিবেন। আমি ত অবস্থা দেখিয়া কাঁদিতে লাগিলাম ও মাকে ডাকিতে লাগিলাম। ভোলানাথ ও বাবা সকলেই মহা ব্যস্ত; অনেকক্ষণ পরে ডান হাত লম্বা করিয়া জলের দিকে বাড়াইয়া দিয়া শুইয়া পড়িলেন। ভোলানাথও অনেক সান্ত্বনা দিলেন। জলে যাইবেনই। ভোলানাথ বলিলেন, "কি করিলে শান্ত হইবে, তুমি শান্ত হও" ইত্যাদি ইত্যাদি। অনেক পর ডান হাত ঐ ভাবে উঠাইয়া শুইয়া পড়িলেন ও মৃদু স্বরে বলিলেন, "ফিরিয়া চল।" তখন প্রায় ষ্টীমারের নিকট আসিয়া

পড়িয়াছি, ভোলানাথ তাহা বলিলেন, কিন্তু মা চোখ বুঁজিয়া পড়িয়াই আছেন। দুইবারই বলিলেন, "ফিরিয়া চল।" তখন নৌকায় ফিরাইয়া আবার দীনেশবাবুর বাসায় লওয়া হইল। খবর পাইয়া তাঁহারা অবাক্। মাকে উঠাইয়া লইয়া গেলেন। মা অনেকক্ষণ পড়িয়া রহিলেন, পরে উঠিয়া বসিলেন। ভোলানাথকে কি বলিলেন, ভোলানাথ তাহাতে শান্ত হইলেন। দীনেশবাবুরও সপরিবারে মা ফিরিয়া আসিতেই অনেকটা দুঃখ মিটিয়া গিয়াছিল। ভোলানাথকে শান্ত দেখিয়া তাঁহারাও আনন্দিত হইলেন। এই ভাবে গোলমাল মিটাইয়া মা পরদিন রওনা হইলেন। নৌকায় যে মা ডান হাত লম্বা করিয়া দিয়া শুইয়া পড়িয়াছিলেন সেই হইতে দেখিতেছি ডান হাতখানা অবশ হইয়া গিয়াছে, কিছুই ধরিতে পারিতেছেন না। অনেকদিন পর্য্যন্ত এই অবস্থা ছিল।* পরে ধীরে ধীরে

---

* প্রায় চার মাস এই অবস্থা ছিল। এই প্রকার অবশ ভাব কেন হইয়াছিল তাহা কোন সময়ে প্রসঙ্গতঃ এই ভাবে বুঝাইয়াছিলেন: "নন্দু প্রথমে আমাদের সঙ্গে যাইবে স্বীকার করিয়াছিল, পরে অসম্মত হইয়াছিল। টাঙ্গাইলে ইহার পর যখন শরীরটা কেমন হইয়া গেল তখন নন্দু খুব ভয় পাইয়া আমার ডান হাতে হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিল যে, আমার সঙ্গে যাইবে। কিন্তু কাশী রওনা হইবার সময় আবার যাইতে অস্বীকার করিল। ও ত ছেলেমানুষ—তাই ও এক একবার এক এক কথা বলিতেছে। আমার কেমন খেয়াল হইল—এই ডান হাতে হাত বুলাইতে বুলাইতে ও আমার সঙ্গে যাইতে সম্মত হইয়াছিল। পরে আবার

আবার ঠিক হইয়া গেল। এজন্য কোনও চিন্তা বা ঔষধ-পত্রাদি ব্যবহার করা হয় নাই। একবার এই অবস্থায় গোয়ালন্দ হইতে গাড়ীতে উঠাইবার সময় (গাড়ীটা অনেক উঁচু থাকে) আমি মাকে হাত ধরিয়া অল্প চেষ্টাতেই টানিয়া গাড়িতে উঠাইলাম। তখন খেয়াল করি নাই, কিন্তু কিছুক্ষণ পর গাড়ীতে বসিয়া মা আমাকে বলিলেন, "তুমি আমাকে কি করিয়া উঠাইলে?" আমি বলিলাম, "কেন, বাঁ হাত ধরিয়া টানিয়া তুলিয়াছি।" ডান হাত দিয়া ত মা কিছুই ধরেন নাই। মা বলিলেন, "কি করিয়া তুলিলে? এত বড় শরীরটা তুমি এত সহজেই আল্‌গা করিয়া উঠাইয়া আনিয়াছ, আমি ত কিছুই ধরিতে পারি না।" তখন আমার খেয়াল হইল। এর মধ্যেও মার করুণা বা ঐশ্বর্য্য প্রকাশ পাইয়াছে। উঠাইবার সময় আমার মোটেই কিছু ওজন বোধ হয় নাই, যেন একটা পাতলা জিনিষ অনায়াসেই একটু ধরিয়া উঠাইয়া নিলাম। পরে বুঝিলাম ইহা কখনই সম্ভব নয় যে, আমি নিজের শক্তিতে মার শরীরকে আল্‌গা করিয়া এতটা উঁচুতে বাঁ হাতে ধরিয়াই উঠাইয়া লইয়াছি অথচ মা কোন আঘাতও পান নাই।

অনিচ্ছা প্রকাশ করে—ও বোঝে না, কিন্তু উহাতে উহার ভয়ানক অমঙ্গল হইবে। তখন নন্দু কোলের শিশুর মত আমার সঙ্গে সঙ্গে থাকিত তাই আবার খেয়াল আসিল ও ডান হাতখানি অবশ হইয়া গেল।"

ইহাঁর পরই কাশীধামে কুঞ্জবাবুর বাড়ী যাওয়া হইল। কাশীতে খুব উৎসব হইল। মা সমাধিস্থভাবে পড়িয়া রহিলেন, ভোলানাথ পূজা করিলেন, পরে কীর্ত্তনাদিও খুব হইল। মা ভাবাবস্থায় তুই একটী শিশুকে ফুল ছিটাইয়া পূজা করিতে লাগিলেন। একটু হাসিয়া বলিলেন, "পূজা করিতেছি।" ভাবাবস্থায় অনেক সময় পড়িয়া রহিলেন। পরে উঠাইয়া নানা কথা জিজ্ঞাসা করা হইল। মা ঐ অবস্থায় যে কথা বলিতেন তাহা অতি মিষ্ট শুনাইত। চোখ-মুখের একটা অস্বাভাবিক জ্যোতি তখনও খুব থাকিত, শিশুর মত কথা অস্পষ্ট, মুখে হাসি—এক অপরূপ শোভা। এইভাবে কথা বলিতে বলিতে ক্রমে কথাও স্পষ্ট হইয়া আসিত, শরীরের অপরাপর লক্ষণেরও পরিবর্ত্তন হইয়া আসিত। কুঞ্জমোহন মুখোপাধ্যায় মহাশয় এই উপলক্ষে বহু লোককে নিমন্ত্রণ-পত্র দিয়াছিলেন এবং সর্পাঘাতের বিবরণ সহ এক ছোট বইও লিখিয়া সকলকে বিলাইয়াছিলেন। কাজেই বহু লোক উপস্থিত হইয়াছিলেন। কাশীর সংস্কৃত কলেজের প্রিন্সিপ্যাল মাননীয় গোপীনাথ কবিরাজ মহাশয় এবারই মাকে প্রথম দেখেন এবং মার কথা শুনিয়া মুগ্ধ হন। তিনি মার কথা শুনিয়া এবং সমাগত সকলের প্রশ্নের যে মা সাধারণ ভাষায় মীমাংসা করিয়া দিতেছেন তাহা শুনিয়া শুধু বলিতেন, "অপূর্ব্ব, এমন আর শোনা যায় নাই।"

কুঞ্জবাবুর আহ্বানে কাশী গমন।

গোপীবাবু প্রায়ই একখানি পাখা হাতে লইয়া মায়ের কাছে

বসিয়া বাতাস করিতেন ও মার শ্রীমুখের কথা শুনিতেন। ইহার পর হইতেই মা যখন কাশী যাইতেন, তিনি আসিয়া মার সহিত দেখা করিতেন। মার মুখ হইতে যে স্তোত্রাদি বাহির হইত কেহই তাহার কোন অর্থই বোঝেন নাই, ইনিই দুই চারিটী বুঝিয়া বলিয়াছিলেন, "ইহা প্রকৃত দেবভাষা, মর্ত্ত্যলোকের সংস্কার লইয়া ইহা বুঝা অসম্ভব।" ইনি বহু ভাষায় ও শাস্ত্রে অভিজ্ঞ। অনেক পণ্ডিত ও বড় বড় লোক মার দর্শনের জন্য আসিয়াছিলেন। প্রত্যহ বিকালবেলা একটা বড় খোলা জায়গায় মাকে বসাইয়া দেওয়া হইত। সকলে সেখানে মাকে দর্শন করিতে ও মার সহিত কথা বলিতে পারিতেন। রাত্রি প্রায় দশটায় মাকে ছাদের উপর উঠাইয়া লইয়া যাওয়া হইত। সেখানে তখন এক এক জন একান্তে মার সহিত কথা বলিতে যাইতেন। এইভাবে প্রায় তিনটা বাজিয়া যাইত। তখন ছাদের কোঠাতেই মার বিছানা করা হইয়াছিল, মা একটু শুইয়া পড়িতেন। আবার রাত্রি চারটা, কি সাড়ে চারটা বাজিতেই অনেকে পূজার সরঞ্জাম লইয়া মার চরণে উপস্থিত হইতেন। মা শুইয়া আছেন ঐ অবস্থায় বিছানার মধ্যেই অনেকে ফুল, চন্দন, গঙ্গাজল মার চরণে দিয়া পূজা করিয়া যাইতেন। বেলা হইবার সঙ্গে সঙ্গেই বাড়ীখানা লোকারণ্য হইয়া যাইত। দাঁড়াইবার জায়গা থাকিত না। বাড়ীর মালিকদের কেহ জিজ্ঞাসাও করিতেন না, একেবারে আসিয়া সকলে ঘরের ভিতর প্রবেশ করিতেন। দোতলা তেতলা সব ভরিয়া যাইত। মাও

প্রায় সকল সময়ই ভাবাবস্থায় বসিয়া থাকিতেন, বা পড়িয়া থাকিতেন, খাওয়া প্রায় বন্ধ হইয়া যাইত। মুখ ধোয়াইতেও লইয়া যাওয়া মুস্কিল হইত, লোকের এতই ভিড়। কেহ মাকে একটু সময়ের জন্যও ছাড়িয়া দিতে চাহিত না। সকলের এই ভাবে মাও ভাবস্থ হইয়াই আছেন। স্বামী শঙ্করানন্দ ও যোগেন্দ্র রায় সকলেই এইবারেই মার দর্শন পাইলেন। যোগেন রায় মাকে অনেক কীর্ত্তন শুনাইলেন, মাও খুব আনন্দ প্রকাশ করিলেন। বৈকালে সভার মত করিয়া সকলে মাকে লইয়া বসিয়া মার কথা শুনিত। ইতিপূর্ব্বে এই ভাবে আর কখনও সভা করিয়া বসান হয় নাই। আর মাও এত বড় বড় প্রশ্নের মীমাংসা এত লোকের মধ্যে বসিয়া আর কখনও করেন নাই। অথচ মা লেখাপড়া অতি সামান্যই জানিতেন। বিবাহের পর কোন বই পড়িতে দিলে মা উহা পড়িয়া উঠিতে পারিতেন না। অষ্টগ্রামে এই অবস্থা আরম্ভ হওয়ার পর মাকে সদ্‌গ্রন্থ পড়িতে দেওয়া হইলে, মা তাহা একটু পড়িতে না পড়িতেই কেমন ভাবস্থ হইয়া পড়িতেন, কাজেই আর পড়া হইত না, কাহারও মুখে ঐ সব বই শুনিলেও ভাবস্থ হইয়া পড়িতেন, কাজেই পুঁথিগত বিদ্যা মার মোটেই ছিল না। বলিয়াছি মা কথাই কম বলিতেন। শুধু ভাবেই বিভোর থাকিতেন। এই প্রথম মার এত কথা বাহির হইল। ইহার পর হইতে কলিকাতা এবং অন্যান্য স্থানেও সকলে মাকে লইয়া বসিয়া এই ভাবে প্রশ্নাদি করিতেন ও মার সাধারণ ভাষায় কত অমূল্য উপদেশ শুনিয়া

আনন্দলাভ করিতেন। মারও দিন দিনই নূতন নূতন কথা বাহির হইতে লাগিল। কীর্ত্তন বন্ধ রাখিয়া অনেক সময় সকলে মার কথা শুনিতেন। মার মাথার কাপড়ও তখন অনেকটা কমিয়া গিয়াছে, তিনি সকলের সঙ্গে খোলা ভাবে নানা বিষয় আলোচনা করিতেন। পূর্ব্ব ভাবস্থ হইয়া সর্ব্বদা পড়িয়া থাকিতেন, এখন তাহাও কমিয়া আসিতে লাগিল। মা যেন দিন দিনই সকলের মধ্যে মিশিয়া পড়িতে লাগিলেন। কিন্তু তাহাও খুব ধীরে ধীরে ও সুশৃঙ্খলার সহিত হইতে লাগিল। এই সকলের মধ্যে এতটা মিশিয়া যাওয়া যেন কেহ টের পাইল না। এমন কি ভোলানাথও ধরিয়া উঠিতে পারিতেছিলেন না, কি ভাবে মার পরিবর্ত্তন হইয়া যাইতেছে। একদিন কোনও কারণে একটু অসন্তুষ্ট হইয়া তিনি এই সব লইয়া মাকে অনুযোগ করিতেছিলেন। মা একটু হাসিয়া উত্তর দিলেন, "দেখ, তুমি কিছু বলিতে পার না। আমি প্রথমে তোমারই ঘরের কোণে থাকিতাম। তোমার আদেশ ভিন্ন কাহারও সহিত কথা পর্য্যন্ত বলি নাই। আমি বাহির হইতে না চাহিলেও তুমি জোর করিয়া আমাকে সকলের সম্মুখে বাহির করিয়াছ এবং সকলের সঙ্গেই ধর্ম্মবিষয়ে আলোচনা করিতে পুনঃ পুনঃ বলিয়াছ। তোমার আদেশেই আমি সকলের নিকট বাহির হইয়াছি ও আলাপ করিয়াছি, আজ সকলেরই হইয়া পড়িয়াছি। এখন বলিলে কি হইবে?" পরে একটু হাসিয়া বলিলেন, "তোমার হাতের ঘটিতেই জল ছিল, তুমিই তাহা

মাটিতে ঢালিয়া দিয়াছ, এখন আর উঠাইয়া ঘটিতে ভরিবার উপায় নাই। যদিও একটু উঠাও, তাহাও মাটি-মাখা হইয়া যাইবে।”

বহু পূর্ব্বের একটি কথা মনে পড়িল। বাজিতপুরের জানকীবাবুর স্ত্রীকে মা উষাদিদি বলিয়া ডাকিতেন। পূর্ব্বেই বলিয়াছি তাঁহার সহিত মার খুব ভালবাসা ছিল। তিনি যখন ঢাকায় আসিলেন তখন তাঁহার মুখে শুনিলাম,—মার যখন বাজিতপুরে এই অবস্থা আরম্ভ হয় তখন উষাদিদির শাশুড়ী উষাদিদিকে মার কাছে যাইতে দিতেন না, কারণ অনেকের বিশ্বাস ছিল মাকে ভূতে পাইয়াছে। কিন্তু উষাদিদি মাকে না দেখিয়া থাকিতে পারিতেন না, তাই লুকাইয়া লুকাইয়া মার কাছে আসিতেন। তাঁহার কেমন বিশ্বাস ছিল মার এই সব যাহা হইতেছে তাহা ভালই হইতেছে। মার উপর তাঁহার একটা ভক্তি জাগিয়াছিল। একবার তাঁহার একটী ছেলের অসুখ হওয়ায় মার কাছে লইয়া আসিলেন, মনে বিশ্বাস—মা ধরিলেই ভাল হইয়া যাইবে। সত্যই মা কি করিলেন, ছেলেটী ভাল হইয়া গেল।—পূর্ব্বেই লিখিয়াছি মার এইরূপ ক্রিয়াদি পূর্ব্বে হইয়া যাইত যাহাতে রোগী আরাম হইত। মা বলিতেন তিনি ইচ্ছা করিয়া কিছুই করিতেন না। যেমন আসন ইত্যাদি আপনা হইতেই হইয়া যাইত, এও সেইরূপই। ইহার পর হইতে উষাদিদির ভক্তি আরও বাড়িয়া যায়।

বাজিতপুরের উষাদিদির নিকট মার ভবিষ্যদ্বাণী।

একদিন মার অবস্থা দেখিয়া তিনি বলিয়াছিলেন, "তোমাকে আমার 'মা', ডাকিতে ইচ্ছা করে। ভগিনী-ভাব আসে না, মাতৃভাব আসিতেছে।" মা ভাবস্থ হইয়াছিলেন, একটু থামিয়া উত্তর দিয়াছিলেন, "তুমি কেন, একদিন জগতের বহুলোক এ দেহকে মা বলিয়া ডাকিবে।"

কাশীধামে মার অবস্থিতি।

এই যে কাশী আসিয়াছেন ইহা সেই কথার প্রায় তিন বৎসর পরই হইবে। এইভাবে প্রকাশ্য সভায় মা আর বসেন নাই। মা কত কথাই বলিতেছেন, সকলে শুনিতেছেন। কেহ কেহ প্রশ্ন করিতেছেন। একদিন তার মধ্যে কি কথায় মা আত্ম-প্রকাশ করিলেন, কিন্তু এত অস্পষ্ট ভাবে যে সকলে ধরিতে পারিলেন না। একদিন রাত্রিতে সকলেই প্রায় চলিয়া গিয়াছেন, মা ও বাড়ীর লোকেরা এবং বাহিরের দুই চারিজন ছাদের উপর বসিয়া আছেন। রাত্রি প্রায় দুইটা কি তিনটা। হঠাৎ মা বলিয়া উঠিলেন, "মৃত্যু আসিতেছে।" কাহার মৃত্যু কিছুই বোঝা গেল না। সকলেই চিন্তিত হইয়া পড়িলেন, কিন্তু আর কোন কথাই বাহির হইল না। মন্থুর মা (কুঞ্জমোহন মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের স্ত্রী) গৃহিণী, কাজেই তাঁহারই বেশী চিন্তা। তিনি বলিলেন, "মা গো, আমার উপর দিয়াই যেন যায়।" মা তাঁহার দিকে চাহিয়া একটু হাসিলেন, মাকে লইয়া আনন্দে সকলে একথা আর মনে করিতেও সময় পাইলেন না। দিনরাত্রি উৎসব চলিতেছে।

পূর্ণিমার দিন কথা হইল, সেই দিনই মা চলিয়া আসিবেন। তার পূর্ব্বদিন রাত্রিতে মন্নুর মা আমাকে বলিতেছেন, "যে লোকের ভিড়, মাকে একদিন ইচ্ছামত খাওয়াইতেও পারিলাম না। আমার একদিন ইচ্ছা করিয়াছিল ভাতে ভাত রাঁধিয়া ছেলে-মেয়েদের যেমন রান্নাঘরে বসিয়াই মা খাওয়াইয়া দেয়, সেই রকম ভাবে ভাতে ভাত রাঁধিয়া রান্নাঘরে বসিয়াই গরম গরম বড় বড় গ্রাসে মাকে খাওয়াই। তারপর সেই প্রসাদ সকলে লই। কিন্তু যে গণ্ডগোল—কিছুই হইল না। মাও যে অবস্থায় আছেন কিছুই খাইতেছেন না" ইত্যাদি ইত্যাদি। পরদিন বিকাল বেলা আমরা মাকে লইয়া কলিকাতা রওনা হইব। সকালে মাকে একটু খালি পাইয়া মুখ ধোয়াইতে লইয়া গিয়াছি। স্নানের ঘরে দরজা বন্ধ করিয়া মুখ ধোয়াইতেছি ও কাপড় ছাড়াইতেছি। এর মধ্যেই মা আমাকে বলিলেন, "দেখ, আজ ত চলিয়া যাইব। আজ পূর্ণিমা, কেহ দিলে খাইও না, (শাহবাগ হইতেই অমাবস্যা ও পূর্ণিমায় এ নিয়ম চলিতেছিল) কিন্তু আমার আজ ভাতে ভাত খাইতে ইচ্ছা করিতেছে।" পূর্ব্ব দিন রাত্রিতে মন্নুর মা যে মাকে খাওয়াইবার কথা বলিয়াছিলেন তখন হঠাৎ তাহা আমার মনে পড়িয়া গেল। আমি আশ্চর্য্য হইয়া গেলাম। মাকে তখনই বলিলাম, "মা, কাল মন্নুর মা তোমাকে ভাতে ভাত রাঁধিয়া খাওয়াইবার কথাই বলিতেছিলেন।" মা বলিলেন, "তুমি ত আর আমাকে বল নাই।" আমি বলিলাম, "তবে তুমিই

যখন বলিয়াছ তখন রাঁধিতে বলিয়া আসি।" মা বলিলেন, "আচ্ছা বল, কিন্তু তোমরা কেহ দিনে খাইতে পারিবে না, শুধু আমিই খাইব। আমি যে কতদিন খাই না, কাজেই আমার সঙ্গে তোমাদের কথা নাই।" আমি হাসিয়া বলিলাম, "তাহাই হইবে।" তখন মা বাহির হইয়া আসিলেন, সকলের কাছে গিয়া বসিলেন। আমি দৌড়িয়া গিয়া মন্নুর মাকে ভাতে ভাতের কথা বলিলাম। সকলেই আশ্চর্য্য ও খুব আনন্দিত হইলেন। তখনই রান্না হইল। মন্নুর মা রান্নাঘরে বসিয়াই বড় বড় গ্রাসে মাকে খাওয়াইয়া দিতে লাগিলেন। মাও বেশ খাইতে লাগিলেন। এতদিন মোটে কিছুই মুখে লইতেছিলেন না। আজ মন্নুর মার বাসনা পূর্ণ করিতেছেন। খাওয়াইতে খাওয়াইতে কথায় কথায় মন্নুর মা বলিতেছিলেন, "মা, পূর্ব্বপুরুষের মধ্যে কেহ মহাতপস্যা করিয়া তোমায় সন্তুষ্ট করিয়াছিল, সেই পুণ্যফলে সমস্ত পরিবারবর্গ মিলিয়া তোমাকে এভাবে দর্শন করিতে পারিতেছি।" মা একটু হাসিয়া খাইতে খাইতেই বলিলেন, "চৌদ্দপুরুষ পূর্ব্বে।" অমনি মন্নুর মা সকলকে ডাকিয়া এ কথা শুনাইলেন। পরে মা বলিলেন, "দেখ, এই রকম হয়। ভোলানাথদেরও আছে, সাত পুরুষ পর পর সিদ্ধ হয়।" সকলে মুগ্ধ হইয়া এ সব কথা শুনিতেছেন। বাবা ও কুঞ্জমোহন মুখোপাধ্যায় মহাশয় এ কথা শুনিয়া খুবই কৃতার্থ বোধ করিলেন, কারণ তাঁহারা দুই সহোদর।

তাঁহাদেরই একজন পূর্ব্বপুরুষ মাকে সাধনায় সন্তুষ্ট করিয়াছিলেন, তাহার ফলেই তাঁহারা মাকে এইভাবে পাইতেছেন। তাঁহাদের পুত্র, কন্যা, জামাতা সকলেই প্রায় মার চরণে আসিয়াছে। এর কিছু পরে সিদ্ধেশ্বরী আসনের কথা উঠিল, মা বলিলেন, "শঙ্করাচার্য্যের সহিত এই স্থানের যোগ আছে।" আর কিছুই বলিলেন না। যোগেন রায়কে মা বলিলেন, "তুমি ত কীর্ত্তন শুনাইতে শুনাইতে পেট ভরাইয়া দিয়াছ।" মা পূর্ণিমার দিন সকলকে লইয়া কলিকাতা রওনা হইলেন। সকলেই ষ্টেশনে আসিয়া মাকে উঠাইয়া দিল। সকলকে কাঁদাইয়া মা রওনা হইলেন।

আমরা কলিকাতায় সুরেন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের বাটীতে আসিলাম। পরে ঢাকা উত্তমা-কুটীরে যাওয়া হইল। মা কাশী হইতে আসিবার কিছুদিন পরেই কুঞ্জমোহন মুখোপাধ্যায় মহাশয় মার কাছে জানাইলেন—তাঁহার স্ত্রীর কলেরা হইয়াছে। দ্বিতীয় টেলিগ্রামে জানাইলেন তিনি মারা গিয়াছেন। মা কেন কাশীতে "মৃত্যু আসিতেছে" বলিয়াছিলেন, আজ তাহার মর্ম্মার্থ বুঝিলাম।

মার ঢাকা প্রত্যাগমন।

উত্তমা-কুটীর হইতেই কিছুদিন পর প্রফুল্ল ঘোষ মহাশয় (রায়বাহাদুরের ছেলে) মাকে কুমিল্লা লইয়া গেলেন। তিনি তখন কুমিল্লাতে থাকিতেন। কুমিল্লাতেও অসম্ভব ভিড় হইল। মাকে ঘরে রাখা দায় হইল, দর্শনার্থীরা দরজা ভাঙ্গিয়া ঘরে ঢুকিবার উপক্রম করিল, শেষে মাকে মাঠে বসান হইল।

কুমিল্লায় গমন।

কয়েকদিন তথায় থাকিয়া মা কলিকাতায় আসিলেন। এবার আসিয়া চারু ঘোষ মহাশয়ের বাসায় উঠিলেন। রায়-বাহাদুর ও তাঁহার স্ত্রীও তথায় ছিলেন। খুব আনন্দ চলিতেছে। ভ্রমরও সেইখানে থাকে ও গান করিয়া শুনায়। একদিন মা জল খাইতে বসিয়াছেন, হঠাৎ রায়বাহাদুর গিয়া বলিলেন, 'আমার একটু মাকে খাওয়াইয়া দিতে ইচ্ছা হইতেছে—কিন্তু আমার ত কোন বিচার নাই, মা কি আমার হাতে খাইবেন ?" মা বলিলেন, "বেশ ত, ইচ্ছা হইয়াছে, কিছু খাওয়াইয়া দাও।" আমি খাওয়াইয়া দিতেছিলাম, রায়বাহাদুর আসিয়া মাকে একটু ফল ও মিষ্টি খাওয়াইয়া দিলেন। মা তখনই বলিতেছেন, "আজ হইতে যখন যাহা খাইবে দেবতাকে নিবেদন করিয়া খাইও।" তিনি বলিলেন, "আমি ত যা'তা' খাই, কোনই বিচার করি না, অখাদ্য জিনিষও খাই।" মা বলিলেন, "যখন যাহাই খাও তাহাই মনে মনে দেবতাকে দিয়া খাইও।" তিনি রাজি হইলেন। ইহার ফলে ক্রমে ক্রমে তাঁহার খাওয়ার পরিবর্ত্তন হইয়া আসিল। পরে মার কৃপায় তাঁহার অতি সুন্দর পরিবর্ত্তন আসিল মা তাঁহাকে হরিনাম করিতে বলিয়াছিলেন, তিনি তাহাই করিতেন। বৃদ্ধ শেষে নিজেই মহা আনন্দের সহিত বলিতেন, "মার কৃপায় আমার 'নামে রুচি' হইয়াছে।" পরে তিনি খুব নাম শুনিতেন ও নাম করিতেন। মার আশ্রমে রোজ একবার আসিয়া মাকে

কলিকাতায় অবস্থান—রায়-বাহাদুরের জীবনে মার প্রভাব।

প্রণাম করিয়া যাইতেন। মার প্রতি তাঁর খুবই শ্রদ্ধা জাগিয়াছিল। ইঁহার জীবনের পরিবর্ত্তনও মার অসীম কৃপার পরিচয়।

কিছুদিন কলিকাতায় থাকিয়া মা আবার ঢাকায় ফিরিয়া গেলেন। কিছুদিন হইতেই মার একটা ভয়ানক শারীরিক অবস্থা হইত। পূর্ব্বেই লিখা হইয়াছে, মার শ্বাস ভয়ানক জোরে বহিতে থাকিত। হঠাৎ বসিয়া আছেন, কি শুইয়া আছেন, ঐ ভাবে শ্বাস আরম্ভ হইত—তাহাতেই কখনও শুইতেন, কখনও বসিতেন। এই অবস্থায় আমি অনেক সময় মেরুদণ্ড বা হাত-পা ঘষিয়া দিতাম, কিন্তু তখন আমার ঘষাতে কিছুই বুঝিতে পারিতেন না। ভোলানাথ প্রাণপণে ঘষিতেন। মা বলিতেন সামান্য একটু টের পান। সমস্ত শরীর যেন শক্ত। কলিকাতাতে সুরেন মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের বাসায় ও অন্যান্য স্থানেও এইরূপ হইয়াছে। জিতেন দাদা, নবতরু দাদা হাত-পা ঘষিতে ঘষিতে ক্লান্ত হইয়া পড়িতেন, কিন্তু মা বিশেষ কিছু বুঝিতেই পারিতেন না। বহুক্ষণ এই ভাব থাকিত। শেষে ধীরে ধীরে কমিয়া আসিত।

ঢাকায় প্রত্যাগমন—মার শারীরিক অবস্থার পরিবর্ত্তন।

একদিন মা আমাকে উত্তমা-কুটীরেই একান্তে বলিলেন, "দেখ, আমি কি করি কিছু ঠিক নাই, যদি আমি ঢাকা হইতে বাহির হইয়া যাই, যেদিন বাহির হইয়া যাইব সেইদিন হইতেই তুমি মৌনী থাকিবে, আমি ফিরিয়া না আসা পর্য্যন্ত

মার বাহির হইয়া যাওয়ার পূর্ব্বাভাষ।

কথা বলিও না।” আর ইহাও বলিয়া দিলেন, “একথা এখন কাহাকেও বলিও না।” আমি সর্ব্বদাই সশঙ্ক থাকিতাম, কখন মা বাহির হইয়া যান। এবার আমাদের সঙ্গে লইবেন না তাহাও বুঝিলাম। কিন্তু শেষে শুনিয়াছিলাম মা যে ভাবে বাহির হইতে চাহিতেছিলেন ভোলানাথ তাহাতে রাজি না হওয়ায় মা তখন বাহির হইতে পারেন নাই। অনেক পরে রমনার নূতন আশ্রমে আসিয়া চব্বিশ ঘণ্টা থাকিয়াই মা ভোলানাথকে ঢাকায় রাখিয়া পিতাকে লইয়া বাহির হইয়া যান।

একদিন উত্তমা-কুটীরে গিয়া দেখি মা পায়ের একটা স্থানে আগুন দিয়া জ্বালাইয়া এক ফোস্কা করিয়া ফেলিয়াছেন। ঘটনা

মার শরীরে অগ্নির ক্রিয়া—অগ্নির তাপ-শূন্যতা।

শুনিলাম, সেই দিনই কি তাহার পূর্ব্বদিন জ্যোতিষদাদা কথায় কথায় মাকে বলিয়াছিলেন, “আপনার শরীরে আগুন লাগিলেও কি টের পান না?” মাও আগুন লাগিলে টের পান কি না দেখিবার জন্য দুপুর বেলা রান্না-খাওয়া হইয়া গেলে একাই রান্নাঘরে গিয়া উনান হইতে একটা জ্বলন্ত কয়লা উঠাইয়া পায়ের উপর রাখেন। তখন লোমপোড়া গন্ধ পাইয়া একজন রান্নাঘরে গিয়া দেখেন—মা পায়ের উপর জ্বলন্ত কয়লা দিয়া বসিয়া আছেন। পায়ের লোম পুড়িয়া যাওয়ায় গন্ধ বাহির হইয়াছে। তাহাকে দেখিয়াই মা আগুন ফেলিয়া দিয়া উঠিয়া আসিলেন। মা আমাদের দেখিয়া হাসিয়া হাসিয়া এই গল্প করিলেন ও বলিলেন, “দেখিলাম কেমন লাগে, কিন্তু সত্যি

বলিতেছি একটু কিছু বুঝিলাম না।" আমরা বলিলাম, "কিছুই যদি উত্তাপ বোঝ নাই তবে ফোস্কা পড়িল কেন? ফোস্কা না পড়িলেই পারিত।" মা হাসিয়া বলিলেন, "ফোস্কা না পড়িলে আগুন যে রাখা হইয়াছিল তার প্রমাণ কি? আগুনের কাজ ত আগুনে করিতেছে।" পরে অন্যমনস্ক ভাবে এই ফোস্কাটী হাত দিয়া ঘসিয়া ঘসিয়া মস্ত বড় ঘা করিয়া ফেলিলেন। অনেকদিন পর ঘা শুকাইল। পায়ে এখনও চিহ্ন আছে। হাতের পিঠেও ইহার পূর্ব্বে একবার আগুন রাখিয়াছিলেন, এবং একবার ছুরি দিয়া নিজেই খানিকটা কাটিয়াছিলেন। ঐ দুই চিহ্নই হাতের পিঠে আছে।

উত্তমা-কুটীরে একবার দিদিমার খুব অসুখ হয়। একটী অল্পবয়স্ক ছেলে ডাক্তারি পাশ করিয়া বাহির হইয়াছে, তাহার নাম "রমণীমোহন"। মা তাহার নাম দিয়াছিলেন "কালিদাস"।

দিদিমার অসুখ।

কালিদাস মার খুব ভক্ত ছিল ও দিদিমার খুব সেবা করিত। দিদিমার অবস্থা যখন খুব খারাপ তখন মা হঠাৎ সেই ঘরে যাওয়া বন্ধ করিলেন। সেই কোঠার সম্মুখ দিয়া অন্যত্র বাহির হইয়া যাইতেন, কিন্তু ঘরে ঢুকিতেন না, প্রায় সাতদিন সেই ঘরে গেলেনই না। সকলে অনুরোধ করিত, কিন্তু মা কিছুই বলিতেন না। সেই সাতদিন অবস্থাও খুব খারাপ চলিল। আট দিনের দিন মা দিদিমার ঘরে গেলেন ও সেই বিছানার এক ধারে গিয়া শুইয়া রহিলেন। পরে ধীরে ধীরে দিদিমা ভাল হইয়া উঠিলেন।

এবার মেডিকেল স্কুলের আর একটী ছেলে মার কাছে আসিয়াছে। মা জিজ্ঞাসা করিলেন, "গাড়ীতে আসিয়াছ?" সে বলিল, "না, হাঁটিয়াই আসিয়াছি। আমি গাড়ীতে বড় উঠি না। ঘোড়াকে কষ্ট দেওয়াও ত পাপ।" মা বলিলেন, "দেখ, ইহাতে পাপ হয় না। কারণ তুমি যেমন কতকগুলি কর্ম্মের জন্য জন্মগ্রহণ করিয়াছ, তাহা না করিলে তোমার কর্ম্মক্ষয় হইবে না। কাজেই সেই কাজের যদি কেহ সুবিধা করিয়া দেয় তাহাতে তোমার উপকারই করা হয়, তেমনই এই ঘোড়াগুলির কর্ম্মক্ষয় করিবার জন্যই জন্ম লইতে হইয়াছে। ঘোড়া ত আর ডাক্তারী পড়িয়া কর্ম্মক্ষয় করিতে পারিবে না, এই ভাবে গাড়ী টানিয়া তাহার কর্ম্মক্ষয় করিতে হইবে। কাজেই সেই কাজের সুবিধা মানুষের দেওয়া দরকার। যার যে কাজ তাহা করিয়া যাওয়াই দরকার।"

গাড়ী টানাতে ঘোড়ার কর্ম্মক্ষয়।

উত্তমা-কুটীরে থাকিতেই হঠাৎ একদিন ১৩৩৫ সনের অগ্রহায়ণ কি পৌষ মাসে মা খাওয়া-দাওয়া করিয়া ভোলানাথকে লইয়া ঢাকেশ্বরীর বাড়ী গিয়া উপস্থিত। পরে বলিলেন, "একখানা গাড়ী আনাও, সিদ্ধেশ্বরী যাইব।" কি আনিতে ভোলানাথ উত্তমা-কুটীরে যাইবেন, কিন্তু মা আর উত্তমা-কুটীরে ঢুকিবেন না বলিলেন। তখনই তাঁহারা সিদ্ধেশ্বরী চলিয়া গেলেন। পরে আমরাও সিদ্ধেশ্বরী গিয়া দেখি তাঁহারা

উত্তমা-কুটীর ত্যাগ।

বসিয়া আছেন। মা আর উত্তমা-কুটীরে আসিবেন না বলায় বিছানা-পত্র সিদ্ধেশ্বরীতে লইয়া যাওয়া হইল। উত্তমা-কুটীরের বাসা তুলিয়া দিতে বলিলেন। দিদিমা, দাদামহাশয় বাড়ীতে চলিয়া গেলেন। উত্তমা-কুটীরে মা মাত্র ছয় সাত মাস ছিলেন। মাখন আমাদের টিকাটুলীর বাড়ীতে গেল। মটরী পিসিমা, মরণী, অমূল্য, কমলাকান্ত ও আর একটী বিধবা স্ত্রীলোক ছিলেন, তাঁহারা সিদ্ধেশ্বরীতেই ৺অশ্বিনীবাবুর বাসায় স্থান নিলেন। ৺অশ্বিনীবাবুর স্ত্রী ও ছেলেমেয়েরা মার কাছে সর্ব্বদাই থাকিতেন।

হঠাৎ এই ভাবে মা উত্তমা-কুটীরের বাসা ভাঙ্গিয়া দিলেন। কালীমূর্ত্তি একটী কাঠের আলমারীর মত করিয়া তার মধ্যে সিদ্ধেশ্বরীর আশ্রমেই রাখা হইল। ১৩৩৫ সনে কালী সিদ্ধেশ্বরী গেলেন। এই চতুর্থ বার কালী নাড়া হইল। যজ্ঞাগ্নিও সিদ্ধেশ্বরী কালীবাড়ীর সম্মুখের অশ্বত্থবৃক্ষের তলাতে কুণ্ড করিয়া রাখা হইল। রোজ কুলদা দাদা আসিয়া সেখানে যজ্ঞাদি করিতেন। শিবপূজা, চণ্ডীপাঠ সবই তিনি করিতেন। কখনও কখনও রাত্রি দুইটায় বা তিনটায় এই সব কাজ করিয়া বাড়ী ফিরিয়াছেন। কুলদা দাদারও মার প্রতি গভীর বিশ্বাস ছিল। মার উত্তমা-কুটীরে থাকা কালে কুলদা দাদার মধ্যম পুত্রটীর কলেরা হয় তিনি কোন ঔষধই ব্যবহার করাইলেন না। শুধু চরণামৃত খাওয়াইলেন। বলিলেন, “বাঁচিবার হইলে ইহাতেই বাঁচিবে।” কিন্তু ছেলেটী মারা গেল। তিনি ঔষধ ব্যবহার

করান নাই বলিয়া একটুও অনুতপ্ত হন নাই। তাঁর স্থির বিশ্বাস, বাঁচিবার হইলে উহাতেই বাঁচিত। তাঁর তিনটী মাত্র ছেলে—মধ্যমটী মারা গেল। ছেলের মৃত্যুর পর তিনি ও তাঁহার স্ত্রী মার কাছে আসিলেন; তিনি আসিয়া বাহিরে দাঁড়াইয়া আছেন, মা ঘরে বসিয়া আছেন। তাঁর স্ত্রী মার নিকটে ঘরে যাইতেই মা এমন ভাবে কাঁদিতে আরম্ভ করিলেন যে, পুত্র-শোকার্ত্তা জননী আর পুত্রের জন্য শোক করিতে পারিলেন না, মাকেই তিনি সান্ত্বনা দিতে লাগিলেন। এই ভাবে মা নিজে কাঁদিয়া তাঁহার বুকের ব্যথা হাল্‌কা করিয়া দিলেন। এই প্রকার কত খেলাই মা করিতেছেন।

ভোলানাথকে মা সিদ্ধেশ্বরীর কালী-মন্দিরের ছোট কোঠাটীতে বসিয়া নিজের কাজ করিতে বলিলেন। আর নিয়ম হইল মার কাছে দশ মিনিটের বেশী কেহ থাকিতে পারিবে না। কাজেই মাও প্রায় একাই সিদ্ধেশ্বরীর আশ্রমঘরটীতে বসিয়া থাকিতেন। কমলাকান্ত রান্না করিয়া দিত। শাহবাগে ও উত্তমা-কুটীরে রাত্রিতেও অনেক সময় মার কাছে আমিই থাকিতাম। এই সিদ্ধেশ্বরীতেও মা মধ্যে মধ্যে হঠাৎ আসিয়া দুই একদিন থাকিতেন। একবার আসিয়া সাতদিন ছিলেন, তখনও আমি প্রায় থাকিতাম, রান্না করিয়া দিতাম। এই আদেশ হওয়ায় আর মার কাছে আমার বেশী সময় থাকিবার উপায় ছিল না। ভোলানাথ অনেক সময়ই ঐ মন্দিরে বসিয়া নিজের কাজ করিতেন, পরে আশ্রমে আসিতেন।

একদিন সন্ধ্যাবেলায় গিয়া শুনিলাম—মা বলিলেন, "ভোলানাথ আগামী কল্যই ঢাকা ছাড়িয়া এক স্থানে যাইতেছেন, তোমরা সকলে কাল ষ্টেশনে গিয়া ভোলানাথকে তুলিয়া দিয়া আসিও।" তিনি কোথায় যাইতেছেন—প্রকাশ করিলেন না। ভোলানাথ আজ কয়েকদিন যাবৎ মৌনী, কাহারও সহিত কথা বলেন না। কলিকাতার মেলে তিনি রওনা হইবেন। যজ্ঞের আগুন নিয়া যোগেশদাদা পরে যাইবেন। মা সিদ্ধেশ্বরীতেই থাকিবেন। কখনও এ ভাবে বাহির হওয়া হয় নাই। সর্ব্বদাই তুইজনেই এক সঙ্গে যেখানে হয় গিয়াছেন। মার আদেশ মত পরদিন সকলে সিদ্ধেশ্বরী গিয়া ভোলানাথকে লইয়া ষ্টেশনে গেলেন, মাও সঙ্গে গেলেন। সকলের নিকট বিদায় লইয়া সকলের সঙ্গে কথা বলিয়া তিনি যোগেশদাদাকে লইয়া রওনা হইয়া গেলেন। সঙ্গে যজ্ঞের অগ্নিও দেওয়া হইল। মাকে লইয়া সিদ্ধেশ্বরী ফিরিয়া গেলাম, জ্যোতিষদাদাও সঙ্গেই ছিলেন। কথা হইল আরও সাতদিন পর্য্যন্ত ভোলানাথ থাকিতে যে দশ মিনিটের নিয়ম চলিয়াছে, দিনে তাহাই চলিবে। কমলাকান্ত ও একটী বিধবা স্ত্রীলোক ছিল, তাহারা মার কাছে থাকিবে। রাত্রিতে যে কেহ একজন আসিয়া আশ্রমে শুইবেন। বাবাই রাত্রিতে গিয়া শুইবেন স্থির হইল। তাহাই চলিতে লাগিল। সাতদিন এই ভাবেই কাটিল, আট দিনের দিন ভোরে উঠিয়াই মা সিদ্ধেশ্বরীর

ভোলানাথের একাকী ঢাকা ত্যাগ।
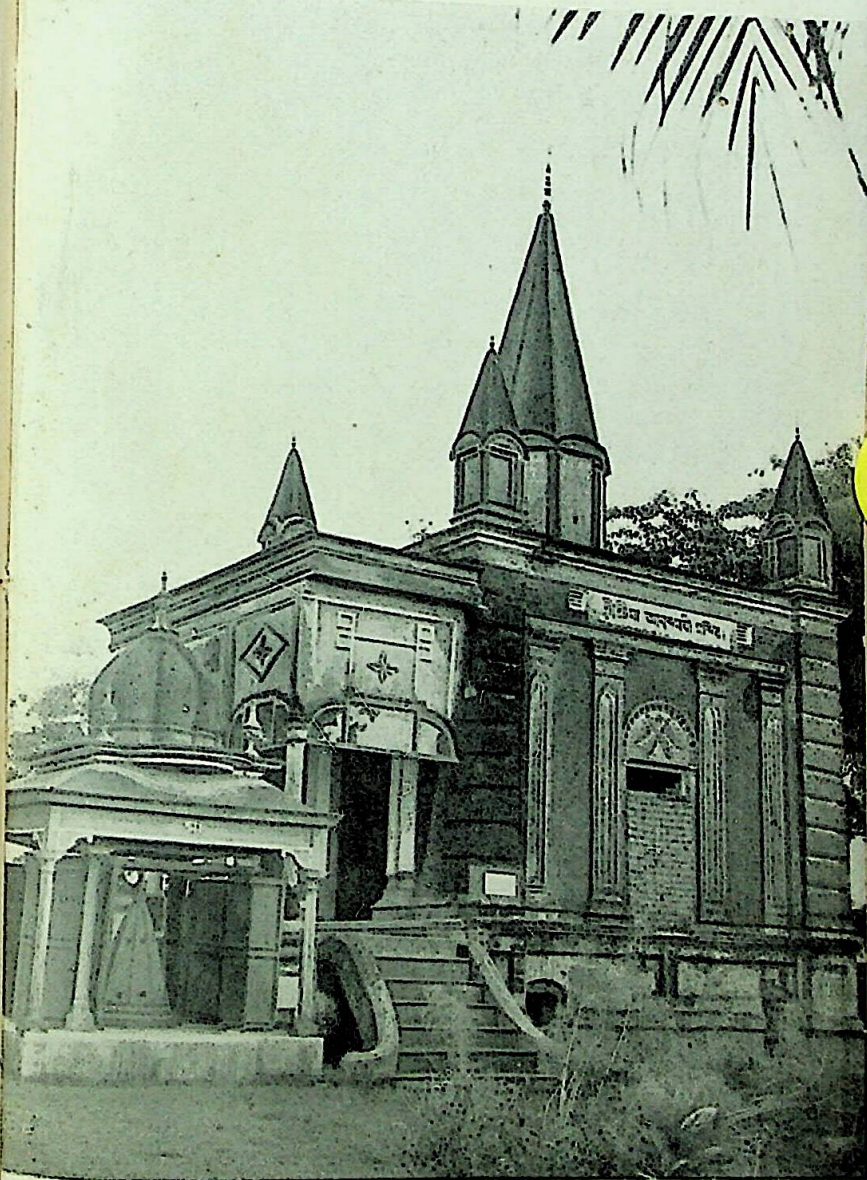
শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী আশ্রম, রমনা, ঢাকা

কালী-মন্দিরের পাশের সেই ছোট কুঠরীতে গিয়া স্থান নিলেন। বলিয়া গেলেন, "ঐ ঘরে যেন কেহ না যায়, যখন হয় আমিই বাহির হইব, তখন দেখা হইবে।" দশ মিনিটের নিয়ম গিয়া এই আবার এক নিয়ম হইল। যখন হয় বাহির হইয়া সামান্য কিছু খাইয়া ঘরে যাইতেন। যেদিন মা ঘরে গেলেন সেই দিনই বৈকালে বাহির হইয়া পুকুরের ধারে বসিয়াছেন, আমরা সেখানেই ছিলাম। মা আমাকে একান্তে বলিলেন, "তুমি কিছুদিন পর্যন্ত দিনের মধ্যে একবার আসিয়া আমার সঙ্গে দেখা করিয়াই চলিয়া যাইও। এখানে থাকিও না।" ইহাতে খুবই আঘাত পাইলাম। দিন-রাত্রির মধ্যে যত বেশী সময় পারি মার কাছেই থাকি, তার মধ্যে সাত-দিন ত ঐ নিয়ম গেল, আবার এই আদেশ। কিন্তু মা বলিয়াছেন, তাহাতেই রাজি হইলাম। সেদিন চলিয়া গেলাম। বাবা প্রভৃতি সকলেই রহিলেন।

——:*:——